মানবাত্মা

সোমনাথ ভট্টাচার্য

শাওনি

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :
পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর :
দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭ বি, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীসমরেশ বসু
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

গিরগিটি ও নীলমাছি / ঘরের অন্ধকার / অশ্বশক্তি / খরা /
ধানপোকা / নাচের পুতুল / মূকাভিনয় / সোনাঠোকরা /
জন্মভূমি / মানবাত্মা / সম্পর্ক।

গিরগিটি ও নীলমাছি

অনাদি বুলুকে দেখছিল। ঠিক বুলুকে নয়, আলমারির পাল্লাজোড়ার প্রকাণ্ড আয়নার মধ্যের বুলুকে দেখছিল।

বুলু মেঝের ওপর পা-ছড়িযে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে তার ওপর অনাদির মোটা একটা বাঁধানো ইংরেজি বই চাপিয়ে পাতা উল্টে-উল্টে ছবি দেখায় রত। অনাদি পাশবালিশ বুকে আঁকড়ে শুয়েছিল খাটের ওপর। শুয়ে-শুযে আয়নার মধ্যের বুলুকে মুগ্ধ, স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে দেখছিল। অনাদির চোখের তীর দুটো ছলছল করছিল। যেন যেকোনো মুহূর্তে অনাদির চোখের তীর ছাপিযে আবেগাশ্রু ঝবে পড়তে পারে!

অনাদি ভাবছিল, ওই যে বুলু বসে আছে— খালি গা, খোসা-ছড়ানো চিনাবাদামের মতো রঙ, ছোট্ট শরীর। কোমরে শুধুমাত্র একটা সাদা ধবধবে সিল্কের জাঙিয়া। একমাথা ববড কোঁকড়া চুল। বনলতা বোধহয় আজ বুলুর চুল শাম্পু করে একটা লাল ফিতে বেঁধে দিয়েছে। মাথার ঠিক মাঝখানে কালো দিঘির বুকে এক নিঃসঙ্গ লাল সাপ্‌লার মতো ফিতের একটা ফুল। কিছু অবাধ্য ঝুরো চুল ফিতের শাসন না মেনে ঘাড়-ঝোঁকানো বুলুর মাথা থেকে ঝুলে পড়ে ফ্যানের হাওয়ায় কাঁপছে। একটা সতেজ সবুজ শর-এর মত সামান্য বাঁক নিয়েছে মেরুদণ্ডটা। —সব মিলিয়ে একটা ছবি— এই ছবির মতো বুলুকে পরম করুণাময় ঈশ্বর আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন! আমায় ধন্য করেছেন! সার্থক করেছেন।

অনাদি মনে-মনে বলল, কী মিষ্টি, কী মিষ্টি মেয়ে তুই বুলু! তোর মতো মেয়ে জগতে আর কার আছে! তুই জগতের সেরা মেয়ে— সেরা সুন্দর মেয়ে বুলু!

বনলতা বাড়ি নেই। ওকে বেরুতে হয়েছে। বনলতা জানত না। ভাবতেও পারে নি অনাদি এমন হুট্ করে অফিস কামাই করবে। শুধু তাই নয়। এমন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে দুপুরটা বাড়িতেই কাটাবে। জানলে ওদের সমিতির সেক্রেটারির সঙ্গে এমন একটা জরুরি কাজ অন্তত আজকে হাতে রাখত না। কখনোই না, কিছুতেই না। বুলুকে মাঝখানে রেখে এমন একটা দুর্লভ দুপুর

—এমন একটা ভর-ভরন্ত দুপুর কাটাবার সুযোগ এত হেলায় নষ্ট করত না। বনলতার কথা ভেবেই অনাদির মন করুণার্দ্র হয়ে উঠল। আহা বেচারি, মন পড়ে রয়েছে এখন রাতদুপুরের মতো এই ভর-দুপুরের প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে আর কোথায় রোদ্দুরে টং-টং করতে করতে গিয়ে প্রৌঢ় সেক্রেটারির সঙ্গে বেচারি এখন সমিতির সমস্যা নিয়ে ঢোক গিলে গিলে আলোচনা করছে। মুণ্ডপাত করছে সেক্রেটারির। মুণ্ডু চিবোচ্ছে।

বনলতা বাড়ি থাকলে তারা কী করত এখন? অনাদি ভাবল। গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি করে শুয়ে বুলুর দিকে তাকিয়ে থাকত। দেখত, বুলুকে দেখত। বুলুকে ভাবত। বুলুর কথা ভাবত। বুলুকে ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারত না বলেই তারা দুজনে নিজেদের মধ্যে ডুবে যেত। ডুবুরির মতো তলিয়ে যেত। তলিয়ে গিয়ে তারা সেই সোনার কৌটোটার দুপাশে দুজনে দাঁড়াত। সোনার কৌটোয় রয়েছে রাজকুমারীর প্রাণ। রাজকুমারীর প্রাণ সেই সোনার কৌটোর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। সেই অতল তলে তলিয়ে সোনার কৌটো মাঝখানে রেখে তারা নিঃশব্দে কথা বলত।

বনলতা বলত: তুমি কত বড়ো। কত মহৎ! কত মহত্ত্ব থাকলে মহাপুরুষ হওয়া যায়, জানি না! কিন্তু তোমার মহত্ত্ব আমার কাছে তোমায় ঈশ্বর করেছে।

না লতা, তা নয়। আমি বুলুকে ভালোবাসি। মানুষ যেমন বাতাসকে ভালোবাসে। বুলুকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই লতা। কেননা, তুমি আমায় বুলুকে পাইয়ে দিয়েছ··· লতা, তুমি যে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ, তাতেই আমি খুশি। তাই আমার পরমানন্দ। এ আনন্দের মধ্যে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি নেই।··· মানুষ ভুল করে। আবার মানুষই ভুলকে বুঝতে পারে। না লতা, আমার মনে কোনো দ্বেষ, আক্ষেপ নেই। দুঃখ বা গ্লানি নেই। অবিশ্বাস নেই। কোনো অভিমান! না, তা-ও নেই। তুমি ফিরে এসেছ, তুমি বুলুকে এনে আমার সব হরণ করে নিয়েছ। লতা, অতীত অতীতই। তার বেশি আর কোনো মূল্য তার নেই। কী হবে অতীতের কথা ভেবে? আমরা ভাবব আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে। যার সবটুকু জুড়েই বুলু। শুধুমাত্র বুলু।

বুলুকে জড়িয়ে তাদের সমস্ত বর্তমান, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জলের ওপর রঙিন বুদবুদের মতো ভেসে উঠত। ভেসে বেড়াত।

—ম্যা গো ঃ—

বুলু হঠাৎ বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে অনাদিকে জড়িয়ে ধরল।

—কী হল মা-মণি ?

অনাদি পাশ ফিরে বুলুকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। বুলুর ছাড়ানো কমলা-লেবুর কোয়ার মতো ঠোঁটের কুঞ্চনে, দু-চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং ভয় লক্ষ করে অনাদি অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, কী হল মা-মণি ?

—ম্যা গো— কী বিচ্ছিরি দেখতে।

—কী ? কী বিচ্ছিরি দেখতে ? কাকে ?

—ওই ছবিটা। ছবির জন্তুটা।

বুলু আবার ঠোঁট কোঁচকোল। বুলুর এই ভঙ্গিটাকেও অনাদির মনে হল, একমেব। ঘৃণা ও ভয়ের অভিব্যক্তিও যে এমন সুন্দর হতে পারে, এ যেন অনাদি এর আগে কখনো দেখে নি। বুলুর সবই সুন্দর। অনাদির এই মুহূর্তে সেই কীর্তনের পদটা মনে পড়ল না সঠিক। যেটায় আছে— আমি চোখে কাজল দিয়েছি···। অনাদিও চোখে বাৎসল্যের কাজল দিয়েছে। সে কাজল-মাখা দৃষ্টিতে বুলুর সবই সুন্দর। সুন্দরতম।

অনাদির কৌতূহল হল। কী এমন ছবি, যা দেখে বুলু ভয় পায়। ঘৃণা হয় ! অনাদি বলল, যাও তো মা, বইটা নিয়ে এসো তো দেখি। ছবি দেখি।

—অ্যাঃ— আমি বইটা আর মোটেই ছোঁব না।

—আরে ওটা তো একটা বই ! বইকে কি ঘেন্না করতে আছে সোনা ? তাতে যে মা সরস্বতী রাগ করেন।

আচ্ছা, তার স্বরে কি ভর্ৎসনা ফুটে উঠল ? বুলুর কি চোখ ছলছল করল ? ঠোঁট কান্নার আবেগে কি থরথর করে কেঁপে উঠল ? তাড়াতাড়ি বুলুর গালে একটা চুমু খেল অনাদি, দেখি তো আমার বুলুসোনা কেমন কাজ শিখেছে। বইটা কেমন নিয়ে আসতে পারে।

বুলু ভাবল। তারপর বইটা নিয়ে এল।

—সা—ব্বাস্।

অনাদি বইটা নিয়ে বুলুকে আবার টেনে নিল। বুকের কাছে বসাল।

—দেখ ছবিটা তোমারও বিচ্ছিরি লাগবে। তোমারও ঘেন্না করবে।

অনাদিকে পাতা ওল্টাতে দেখে, চোখ নামিয়ে বইটার পাতা দেখতে দেখতে বুলু যেন স্থির নিশ্চয় হয়ে বলল।

—ওই যে, ওই ছবিটা। ম্যা গোঃ—

বুলু চোখ ঢাকল দু হাতে।

ছবিটার তুচ্ছতা, ছবির প্রাণীটার তুচ্ছতা বুঝে অনাদি হেসে উঠল, আরে, এটা তো একটা— একটা গিরগিটি। —গিরগিটি একটা।

রঙিন ছবিটার ভয়ংকরতা যদি কিছু থাকে, তা হল তার পাতা জোড়া অবয়ব। এছাড়া আর কী? বুলুর ভয় বা ঘৃণা জন্মানোর এর চেয়ে বড় কোনো কারণ ছবিটার মধ্যে অনাদি খুঁজে পেল না।

বুলু চোখ থেকে হাত নামাল, কী বিচ্ছিরি।

অনাদি ভাবল, তা সত্যি। বুলুর সুন্দর চোখে ওটা তো কুশ্রী লাগবেই।

—আচ্ছা বুলাই, তুমি কখনো গিরগিটি দেখেছ?

বুলু মাথা ঝাঁকাল, না। বাপি, ওরা কামড়ায়?

—দূর। ওরা আসলে খুব ছোটো। খুব নীচু জাতের প্রাণী। চোখেই পড়ে না।

—আচ্ছা, ওরা কোথায় থাকে?

—ওরা? অনাদি একটু সময় নিল, ওরা আমাদের চোখের আড়ালেই থাকে সাধারণত। ছোটোখাটো ঝোপের মধ্যে, গাছের কোটরে, মাটি বা দেয়ালের ফাঁক-ফোঁকরে এইসব জায়গায় থাকে। লুকিয়ে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই না সব সময়। আচ্ছা, তোমায় একদিন একটা জ্যান্ত গিরগিটি দেখাব।

—ম্যা গোঃ, আমি দেখতেও চাই না। আমার ভয় করবে। বুলু আপত্তি জানাল, আচ্ছা বাপি, ওরা কী খায়?

শিকার করেই খায় ওরা। এই ধর, কীট-পতঙ্গ। অনাদির মনে হল, কীট-পতঙ্গ শব্দটার অর্থ হয়ত বুলু ধরতে পারবে না। তাই বলল, মানে পোকা-মাকড়··

—মাকড় মানে মাকড়সা—।

যেন একটা জটিল বানান বলে ফেলতে পারল বুলু। এই রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—এই তো আমার সোনা মেয়ে। কেমন মনে রেখেছে। অনাদি বুলুকে জড়িয়ে নিল, হ্যাঁ কী বলছিলাম—। ওই সবই খায় ওরা। পোকা, মাকড়, মাছি— এইসব।

—তাই ওরা বিচ্ছিরি। —ওই সব খায় বলে।

অনাদি অন্যমনস্কের মতো হাসল। অনাদি ভাবছিল এই সূত্র ধরে প্রাণীতত্ত্বের

বিষয় কিছু গল্পচ্ছলে বুলুকে শেখালে কেমন হয়। খুব সাবধানে গল্প করে বলতে হবে। যাতে ও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ না করে। অথচ অস্পষ্ট হলেও একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। আর ধারণা গড়ে তোলার এই তো সময়! এই তো বয়েস।

অনাদি খুব সাবধানে এবং সন্তর্পণে আরম্ভ করল, দেখ বুলুসোনা, তুমি ওদের দেখে ভয় পেলে। আসলে ওদের ভয় পাবার কোনো কারণই নেই। ওরা এত ছোটো যে, ওরা আমাদের কিছুই করতে পারে না কখনো। ওরা থাকেও সেইজন্যে আমাদের চোখের আড়ালে। —তবে একদিন, সে অনেক অনেক বছর আগে ওদের চেহারা সত্যিই ভয় পাবার মতোই ছিল! —প্রকাণ্ড, তালগাছের চেয়ে উঁচু। —তখন পৃথিবীটা জুড়ে ওরাই রাজত্ব করত। অন্ধকার পৃথিবীতে ওরাই ছিল তখন। ওদের নামও ছিল সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড— ডায়নোসোরাস্, ব্রণ্টোসোরাস্— এইসব। সেসব তুমি বড়ো হয়ে জানবে। তারপর মানুষ সভ্য হয়েছে। মানে আমরা সভ্য হয়েছি। আগুন জ্বালতে শেখার দিন থেকে আমরা সভ্য হতে শুরু করেছি। সেই আগুনে ওদের আমরা পুড়িয়ে মেরেছি। ওরা এখন আমাদের ভয়ে লুকিয়ে বাঁচে না।

—বাপি সাপ্‌লুডো খেলবে?

অনাদির মনে হল, সেই-ই পারে নি! বুলুর কোনো দোষ নেই! যেমন করে বললে বুলুর সেই অনুভূতিকে স্পর্শ করা যেত, গল্প শোনার সেই স্পৃহাকে জাগানো যেত— সেইভাবে সেই-ই বলতে পারে নি। হঠাৎ অনাদির মনে একটা চিন্তার উদয় হল। এ প্রচেষ্টায় তো সে অসার্থক হল! কিন্তু এই যে একটা নগণ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ গিরগিটিকে বুলুর ভয়— এটা তো অহেতুক। উচিতও নয় ভয়টা থাকা। সুতরাং এই ভয়টাকে কাটানোর চেষ্টা করলে—খেলাচ্ছলে, খেলা করে এই ভয়টাকে, অহেতুক ও অনুচিত এই ভীতিটাকে কাটাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়! ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হলে স্থির মস্তিষ্কে ভেবে চিন্তে নতুন নতুন মতলব বার করে, ওদেরই প্রিয় সব জিনিসের সুষ্ঠু ব্যবহার দিয়ে ওদের বোঝাতে বা ভোলাতে হয়! —এই ভেবে অনাদি বেশ খানিকটা তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। তারপর নতুন করে এবং নবীন উৎসাহে আরম্ভ করল, মা-মণি, আমরা আজ একটা নতুন খেলা খেলব—! কেমন?

বুলু এক-কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল, কী খেলা বাপি?

—এ হচ্ছে গিরগিটি গিরগিটি মাছি মাছি খেলা—

বুলু অবাক হল। বাপি এ কী খেলা?

অনাদি তাড়াতাড়ি বলল, এ একটা নতুন ধরনের খেলা। আমি গিরগিটি হব। আর তুমি—

বুলু অনাদির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, না না—তুমি মোটেও ওমন কুচ্ছিত হতে পাবে না।

—আরে পাগলি ছাড় ছাড়—। বলতে বলতে অনাদি বুলুকে আরো আঁকড়ে ধরল, জড়িয়ে নিল।

হাত-পা ছুঁড়ল বুলু, না না, তুমি মোটেও ওমন কুচ্ছিত হতে পাবে না।

—আরে এটা তো একটা খেলা! আমি কি সত্যিই একটা গিরগিটি হয়ে যাব! —পাগলি মেয়ে আমার।

অনাদি গাল টিপে আদর করল বুলুকে। বুলু উঠে বসে বলল, আমি কিন্তু মাছি হব না। ওরা কী নোংরা! নদ্দমায় থাকে!

—আহা, তুই কি সত্যিই একটা মাছি হয়ে যাবি নাকি— অ্যাঁ। আর তাছাড়া, তুই তো···তুই তো···

অনাদি বেশ ভালো একটা কীট-পতঙ্গের নাম মনে করতে চেষ্টা করল। অন্তত নামের আগে একটা সুন্দর বিশেষণ আরোপ করে নামটাকে যাতে বুলুর কাছে স্পৃহনীয় করে তোলা যায় তার জন্য একটা শব্দ হাতড়াল, তুই তো নীলমাছি হবি। যে মাছি ফুলের মধ্যে থাকে। ফুলে ফুলে থাকে। তুই সেই নীল মাছি হবি—।

এমন মাছি আছে তো? হয় তো আবার এমন মাছি? অনাদির নিজের মনেই একবার সন্দেহটা উঁকি দিয়ে গেল। তারপর বলল, আচ্ছা তাহলে হল গিরগিটি গিরগিটি আর নীলমাছি নীলমাছি খেলা—।

ঘরটা সেকেলে। প্রকাণ্ড এবং উঁচু। মাথার ওপর মোটা মোটা চৌকো কড়ি। পাঁজরের মতো ঘন বরগা। লম্বা-চওড়া দরজা-জানালা ভারি ভারি। মেঝেটা চকচকে কালো এবং মসৃণ। মাঝে মাঝে চুলের মতো সরু সরু ফাটল। একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে প্লাস্টিক পেণ্ট করা ফিকে নীল রঙের চার-দেওয়াল। ঘরের আসবাবগুলোতেও পুরাতন কারুশিল্পের ছাপ। সিংহের চার থাবাওয়ালা উঁচু খাট। খাটের ঠিক সামনে একপাল্লা একটা আলমারি। আলমারির পাল্লার সমস্তটাই একটা প্রকাণ্ড আয়না। একটা ভারি টেবিল। একটা চওড়া চেয়ার। —অনাদির মনে হল এই খেলাটা খেলার জন্য বেশ একটা উপযুক্ত পরিবেশ যেন তৈরি হয়েই রয়েছে ঘরটায়। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ।

ঘরে যে আলোটুকু আসছে— সেটুকু ছাদের তলায় গোটাকয়েক কৃপণ বায়ুপথ দিয়ে। আলো এসে প্রতিভাত হচ্ছে আয়নার কাচে। কাচটা রুপোর পাতের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

ঘরটাকে এখন একটা গুহা বলে মনে করে নেওয়া যায়। ছায়া-ছায়া অন্ধকার। আর আয়নার কাচে আলোর প্রতিভাসটাকে গুহামুখ। প্রবেশ ও নির্গমনের একমাত্র পথ। ফ্যানের ব্লেডে বাতাস কাটার মৃদু আওয়াজটাকে বাইরে থেকে আসা বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ মনে করে নিতেও বিশেষ অসুবিধা বা ক্ষতি নেই।

কী দুর্দৈব! খেলাটাকে বেশ ভালো করে, সত্যির মতন করে খেলতে হলে অন্য দিকে খাটের তলায় বা আলমারির পাশে লুকাতে হয়। কেননা, আগেই বুলুর কাছে কবুল করা হয়ে গেছে গিরগিটিরা গর্তে, ফাঁকে-ফোকরে থাকে।

অনাদি হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকল।

ঘরের একেবারে ও-কোণ থেকে বুলু বলল, রেডি-ই।

—এক মিনিট মাঙ্গি—।

অনাদির খালি গা। হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় কোনো রকমে পাৎলুনের বাড়তি আল্‌গা দড়িটা কোমরে কষে নিল। তারপর বলল, রেডি।

অনাদি বুকে হেঁটে মাথা বার করল খাটের তলা থেকে। ঠিক মাটিতে বুক ঘষড়ে ঘষড়ে নয়, কনুই থেকে হাতটা ভেঙে হাতের আঙুলগুলো থাবার মতো মাটিতে ছড়িয়ে, হাতের ওপর ভর দিয়ে, কাঁধ থেকে গলা এবং মাথা উঁচিয়ে, শরীরের বাকি অংশটার ভার হাঁটুর ওপর দিয়ে, প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে বুক পর্যন্ত খাটের বাইরে বার করে এদিকে-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। গিরগিটি যেন শিকার খুঁজল। অনাদির নিজেরই মনে হল, ব্যাপারটাকে যৎপরোনাস্তি স্বাভাবিক করতে পেরেছে। আর তাইতো করতেও হবে। নইলে বুলুর ভয় ভাঙবে কেন!

এখনো যেন গিরগিটি শিকার দেখতে পায় নি। খুঁজছে এদিক-ওদিক। বুলু ওদিকের জানলার একটা উঁচু পৈঠে থেকে মেঝেতে নেমে বলল, এই গিরগিটি তোর জন্যে নেমেছি—।

—আরে না না। তা কেন, তা কেন? ও তো হল কুমির-কুমির খেলা! আর আমাদের হচ্ছে গিরগিটি-গিরগিটি আর নীলমাছি-নীলমাছি খেলা! গিরগিটি কি জলে থাকে নাকি—?

অনাদি ভুল সংশোধন করে দিল। আর এই ফাঁকে হাতের ভর ছেড়ে দিয়ে

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুযে একটু যেন বিশ্রামও করে নিল, তুমি তো নীলমাছি। মাছি কি এক জায়গায় বসে থাকে। ফুলে ফুলে. এ-ফুল ও-ফুলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর বন্, ব—ন্ পাখার আওয়াজ করে।

—ও, আচ্ছা আচ্ছা। আবার ফের থেকে। প্রথম থেকে। বুলু অতি সহজেই ভুলটা ধরে ফেলল।

অনাদি আবার খাটের তলায় ঢুকল।

—ব—ন্। ব—ন্।

নীলমাছি উড়ছে। চঞ্চল নীলমাছি উড়ছে। অনাদি খাটের তলা থেকে দেখল, নীলমাছির পা দুটো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের ওদিকটায। ছুটে ছুটে এ-কোণ থেকে ও-কোণে যাচ্ছে। টেবিলটার কাছে একটু থামল। সরে গেল জানলার কাছে। সেখানে থামল সামান্য সময়। আবার পা দুটো সরে গেল।

অনাদি খুশি হয়ে উঠল, গুড্ গার্ল— '

বুকে হেঁটে ঘাড় বার করল অনাদি। শিকারের সন্ধানে যেন গিরগিটি মাথা বার করল। অনাদি প্রথমেই বুলুর দিকে তাকাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিযে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক দেখল। বুলু হঠাৎ ভয় পেয়ে না যায়— তাই এই সতর্কতা, সাবধানতা।

অনাদি এবার নীলমাছিকে দেখতে পেল। তবু অনাদি নীলমাছিকে ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। লক্ষ করতে লাগল। ওই অবস্থায় থেকেই ঘাড়টা কয়েকবার উঁচু-নিচু করল। চোখগুলো পরম আলস্যে বন্ধ করল আর খুলল। মুখব্যাদান করল, ক্লপ্, ক্লপ্— ।

নীলমাছি উড়ছেই। খুশি, চঞ্চল, ছোট্ট নীলমাছি, ব—ন্, ব—ন্।

অনাদি যেন এই দিকেই ফিরে আকাশের দিকে মুখ করে, চোখ বুজিয়ে ধ্যান করল কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ। ঘাড়টা উঁচুনিচু করল দুবার। চোখ খুলে নীলমাছিকে দেখল। জিভ্ দিয়ে ঠোঁট চাটল, ল্যু-উপ্, ল্যু-উপ্।

তারপর খুব গড়িমসি করে বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটা ফাটল থেকে বার করল।

অনাদি ফাটলের বাইরে এসে যেন খানিকক্ষণ শুয়ে রইল। স্থির হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। ঘাড়টা উঁচু-নিচু করল কয়েকবার। চোখের পাতা খুলে অলস দৃষ্টিতে নীলমাছিকে দেখল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল।

নীলমাছি কি ভয় পেয়েছে ? গিরগিটিকে এগুতে দেখে ভয় পেয়েছে ? ওর ব—ন্ ব—ন্ শব্দ যেন মৃদু হয়ে এসেছে ? অনাদি থামল। নীলমাছিকে ভয়টুকু কাটিয়ে ওঠার সময় দিল।

অনাদি আবার এগুল— গিরগিটি অন্য দিকে মুখ করে এগোল। নীলমাছি যেখানে রয়েছে, তার বিপরীত দিকের কোণই যেন তার গন্তব্য। গিরগিটি যেন নীলমাছিকে লক্ষ্যই করছে না।

নীলমাছি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ভয়টুকু কাটিয়ে ফেলেছে। নীলমাছি ফুলে-ফুলে ঘুরে ঘুরে, ফুলে-ফুলে মধু খাচ্ছে। মধু খেয়ে মাতাল হয়ে ফুলে-ফুলে নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। — ছোট্ট নীল, সুখী নীলমাছি।

অনাদি অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। বুকে হেঁটে গিরগিটি অনেকখানি এগিয়ে এসেছে খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে। এবার খুব আস্তে, ধীরে বাঁক নিয়ে নীলমাছির দিকে ফিরল। গিরগিটির শরীরের সে-আলস্য যেন অনেক কেটে গেছে। শরীরটাকে সামান্য একটু এদিক-ওদিক মোচড় দিয়ে গিরগিটি শরীরটাকে ক্ষিপ্রগতির জন্য প্রস্তুত করল। মুখের পেশীগুলো শক্ত করল। চোখ কোঁচকাল। দৃষ্টিটাকে স্থচলো করল।

নীলমাছির দিকে তাকিয়ে পান খাওয়া লাল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল, ল্যূ—উপ্। ল্যূ—উপ্।

নীলমাছি গিরগিটিকে দেখতে পেয়ে গেছে। বন্‌বনানি থেমে গেছে।

—বাপি, তুমি অমন করছ কেন ?

বুলু ছুটে এসে অনাদির মাথা জড়িয়ে ধরল। পিঠের ওপর চড়ে ঘাড়ের পাশে মাথা গুঁজে দিল। অনাদি বুলুর চোখে মুখে ঠোঁটে ভয় এবং অভিমান দেখতে পেল।

—আরে, এটা তো একটা খেলা। খেলা ছাড়া কিছুই নয়। এতে ভয় পাবার কী আছে ? আমি তো আর সত্যিই গিরগিটি নই যে, তোমায় কামড়ে দেব। যাও তো সোনা— আবার নীলমাছি হও গে।— যাও তো ! গুড্ গার্ল।

নীলমাছি উঠল, ব— ন্।

অনাদি বুলু উৎসাহ পাবে, এই ভেবে স্থর করে বলল, মৌমাছি, মৌমাছি— না না। নীলমাছি, নীলমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াও না একবার ভাই—

ভয় কাটে নি নীলমাছির। দেওয়ালের দিকে দূরে দূরে সরে রয়েছে। ব—ন্। ব—ন্। উড়ছে।

অনাদি ভেঙে-যাওয়া খেলাটায় আবার নতুন করে উত্তেজনা জাগাতে চেষ্টা করল। গিরগিটি শরীরটাকে মুচড়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেল। একেবারে অনেকখানি এগিয়ে এল নীলমাছির কাছে।

—ম্যা গো— ও। নীলমাছি সরে গিয়ে হাসল, হি···হি···হি···হি। এই গিরগিটি— ধরতে পারলি না। দু-য়ো।

অনাদি উৎসাহিত হয়ে উঠল। নীলমাছির ভয় কেটেছে। কিন্তু অনাদি চোখে-মুখে অসহায় ভাব ফোটাল। যেন শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। অনড় হয়ে পড়ে রইল। চোখেব পাতা ওল্‌টাল। ঘাড় উঁচু-নিচু করল। চোয়াল নাড়ল।

ব—ন্‌। ব—ন্‌।

ক্লপ্‌। ক্লপ্‌।

অনাদি মুখব্যাদান করে আবার গুটিগুটি এগোল।

—দুয়ো— এই গিরগিটি দু—য়ো। ধরতে পারে না। নীলমাছি এই পালিয়ে গেল, ফুড়ুৎ—।

এগোচ্ছে অনাদি। আস্তে আস্তে। মাটিতে থাবা পেতে পেতে। চুপিসাড়ে। কুটিল অভিসন্ধি গিরগিটির স্থচলো দৃষ্টিতে। ক্লপ্‌—ক্লপ।

—বা—পিই, আমায় ভয় দেখিও না।

—দুর বোকা। —এই যাঃ।

আবার হাত ছাড়া হযে গেল নীলমাছি। পালাল, ব—ন্‌।

অনাদির প্রায় মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। গিয়ে বসল চেয়ারে।

—এই গিরগিটি। হি···হি···হি···। এই গিরগিটি ধরতে পারলি-ই না।

অনাদি আবার ফিরল। গিরগিটি আবার বুকে ভর দিয়ে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হল। নীললাছির দুর্ভাবনা নেই। চুপ করে বসে। ফুলের মধু পান করছে।

—দুয়ো গিরগিটি। —এখানে তো আর উঠতে পারবি না। কী জব্দ।

অনাদি চেয়ারের তলায় এসে হতাশ চোখে উপরের দিকে তাকাল। ক্লপ —ক্লপ্‌; মুখব্যাদন করল। চোখ বন্ধ করে আর খুলে ভাবল। মতলব ভাঁজল গিরগিটি। তারপর চেয়ারের পায়া আঁকড়ে উঠতে লাগল।

—ও বাবা—।

ব—ন্‌।

নীলমাছি চেয়ার থেকে টেবিলে উঠল। টেবিলের উপর উঠে বসল ; এখানে তো আর উঠতে পারবি না। কী মজা! দু—য়ো।

চালাক নীলমাছি এবার গিরগিটির গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রেখে ফুলের পাপড়ির গায়ে বসল।

—ও মা—। কী বজ্জাত তুই গিরগিটি। এখানেও উঠছিস্।

নীলমাঝি ঝুপ করে মাটিতে লাফিয়ে নামল।

অনাদি শিউরে উঠল, লাগল নাকি বুলুর ?

নাঃ লাগে নি। এইটুকু উঁচু থেকে লাফালে লাগে নাকি ?

বুলু খোঁড়াচ্ছে কেন! -- লেগেছে।

তা একটু লাগুক। না একটু লাগলে-টাগলে শরীর শক্ত হবে কেমন করে। হাড়ে জোর হবে কেন!

—ব—ন্। ধরতে পারলি না। আমাকে ধরতে পারলি না।

খানিক্ষণ চুপ করে টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ে থেকে পরে অনাদি যেন অবিকল অতিকায় একটা গিরগিটির মতোই বুক হাঁচড়ে টেবিল থেকে নেমে বুলুর দিকে এগিয়ে গেল।

অনাদি অবিকল একটা অতিকায় গিরগিটির মতোই জিভ্ দিয়ে ঠোঁট চাটল, ল্যা—উপ্। ল্যা—উপ্।

ঘরটা যেন সত্যি একটা গুহা। পৃথিবীর সেই সব দুর্গম অঞ্চলে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত অন্ধকার পার্বত্য গুহাগুলির একটির মতো— যেখানে আজও, এত সভ্য হওয়ার পরও মানুষের পা পড়ে নি।

এ-গুহায় আলো ঢুকতে সাহস পায় না। আকাশের খানিকটা টুকরো আরশির মতো বাইরে থেকে গুহা মুখে তুলে ধরে গভীরে আলো প্রতিফলনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বাতাস ঢুকতে ভয় পায়। গুহা মুখে থাবা পেতে বসে নিষ্ফল আক্রোশে ল্যাজ্ আছড়ায় পাথরে। চাপা স্বরে গর্জায়।

অনাদি ঘামছে। পিঠে ঘাড়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। কপালে, রগের পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

অনাদির মনে হল সে যে এতক্ষণ এই পরিশ্রম করছে— এই ধরনের একটা কঠিন শারীরিক কসরত করতে করতে সারাটা ঘর চরকির মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এতে এতক্ষণে তার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু সে মোটেই তা হয় নি। আদৌ পরিশ্রান্ত হয় নি।

—তুমি যেন সত্যি সত্যি একটা গিরগিটি হয়ে যেও না বাপি।

নীলমাছি ঘুরতে ঘুরতে উড়তে উড়তে ও-পাশে সরে গেল।

অনাদি ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে গেল। অনাদি অনুভব করল তার দেহের পেশীগুলো অনেক সাবলীল হয়ে এসেছে। ঠিক ততখানি শক্ত হয়েছে, যতখানি নাকি একটা গিরগিটির দরকার। গিরগিটির পক্ষে যা প্রয়োজন এবং উপযোগী।

—এই গিরগিটি— গিরগিটি—।

এবং অনাদি আরো অনুভব করল তার চোখের দৃষ্টি স্থির, লক্ষ্য বস্তুতে অবিচল। কখনোই সে-দৃষ্টি নীলমাছির ছোট্ট শরীরটা থেকে সরে যাচ্ছে না। অনাদি যুগপৎ দুঃখিত এবং আনন্দিত হল এই ভেবে যে, তার বোধশক্তি কমে আসছে ক্রমে। এখন নিজের দেহের উত্তেজনাময় উষ্ণ রক্ত তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তার নিঃশ্বাস ক্রমে আগুনের হল্কাব মতো হযে উঠছে।

নীলমাছি হাঁপিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

—বাপি, আর ভালো লাগছে না···অ্যাই রে···ধরে ফেলেছিল একখুনি।··· এই গিরগিটি। তুই গিরগিটি না।···ফেরগিটি।

অনাদি খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। আবার এগুলো। অতিকায় শরীরটা মেঝের ওপর দিয়ে টেনে টেনে হাতের থাবায় মাটি আঁকড়ে আরো ক্ষিপ্র, দ্রুত ও অনায়াস গতিতে।

নীলমাছি বসল চেয়ারে। নীলমাছি পরিশ্রান্ত। কাতর হয়ে পড়েছে।

—বাপি, আর খেলব না এ-খেলা। ভালো লাগছে না।

অনাদি ল্যু—উপ, ল্যু—উপ, ঠোঁট চাটল— স্থির অবিচল দৃষ্টি।

—বা—পিই···।

কালো মেঝের ওপর অনাদির শরীরর ঘামের লম্বা ছাপ পড়েছে। লম্বা— সর্পিল। ছাপটা অনাদি যেভাবে যাচ্ছে, সেইভাবেই চলছে। অনাদির সঙ্গে সঙ্গে। অনাদির পিছু পিছু।

—বা—পি, আর এ-খেলা খেলব না। তুমি শুনতে পাচ্ছো না—

অনাদি শুনতে পাচ্ছে না। কোনো স্বর, কোনো ধ্বনি, কিছুই না। অনাদি মাথার ভেতরে শুধুমাত্র একটি শব্দই শুনতে পাচ্ছে— একটা মাছির ওড়ার শব্দ। অনাদির চোখের মণিতে কেবলমাত্র একটি ক্লান্ত মাছির প্রতিচ্ছায়া।

নীলমাছি কাঁপছে।

—বাপি, তুমি সত্যি ছবিটার মতো হয়ে যাচ্ছো। আমায় ভয় দেখাচ্ছো কেন—

অনাদি চেয়ারের পায়াটা আঁকড়ে ধরল। ঘাড় উঁচু করল। ঠোঁট চাটল।

—আ···আ·· বাপি গো-ও। আমি বাইরে যাব।

প্রায় থাবার তলা থেকে নীলমাছি উড়ে গেল। অনাদি ক্ষিপ্রতর গতিতে মোড় নিল। —উঃ—মাগো!

নীলমাছি উড়ে যেতে গিয়ে অনাদির ঘামে ভেজা মেঝেতে পা পিছলে বসে পড়ল। অনাদি ওপাশ থেকে অবলীলাক্রমে একেবারে অনেকখানি রাস্তা শরীরটাকে পিছলে দিল।

—আমার পা–টা মচকে গেল। একটু হাত বুলিয়ে দেবে বাপি!

অনাদি বুক দিয়ে রাস্তা পার হল আরো অনেকখানি। বড়ো বড়ো থাবায় মেঝে আঁকড়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে গেল।

নীলমছি উঠে পড়েছে খাটের ওপর। খাটের মাঝখানে সরে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে।

—বাপি গো— তুমি সরে যাও। আমি বাইরে যাব। তুমি সত্যিকারের গিরগিটি হয়ে গেছ। আমায় খেয়ে ফেলবে।

অনাদি খাটের তলায় এসে থামল। শরীরটাকে শ্লথ করে দিল। যেন শিকার আর হাতছাড়া হবার ভয় নেই, এই ভেবে গিরগিটি শিকারের ওপর শেষবারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শরীরের টান-টান পেশীগুলোকে প্রস্তুত করে নিল।

—বা···পি···ই···ই।

প্রকাণ্ড আয়নাটায় এই সময় একটা প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল। সেটা কিম্ভূত-কিমাকার একটা সরীসৃপের। অবিকল একটা অতিকায় গিরগিটির। অনাদি প্রতিবিম্বটা দেখল।

নিজেকে দেখল। —ঠোঁট চাটল।

নীলমাছিকে দেখল।

অনাদি গিরগিটি হয়ে গেল।

নীলমাছি— বুলু!

গিরগিটি ভাবল, অ্যা বাপি? —কে তোর বাপি? শ্যামল দত্তর মেয়ে আমায় বাপি বলবি কেন রে? তোর জিভ্, আমি দাঁত দিয়ে টেনে

ছিঁড়ে নেব।

গিরগিটি খাটের সিংহের থাবাওয়ালা পায়াটা বুক দিয়ে আঁকড়ে উঠতে লাগল।

বুলু কাঁপছে। কাঁদছে। বুলুর সমস্ত শরীরটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে।

গিরগিটির শরীরটা— মাথা, ঘাড়, বুক খাটের ওপর উঠে এল। শরীরের বাকি অংশটা ঝুলে রইল। লেপ্টে রইল মেঝেতে।

গিরগিটি ভাবল বনলতা তুই তো একটা বেশ্যা। তোর কটা পুরুষ রে? একজনের বৌ স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দু বছর বাদে একটা বাচ্চাকে কোলে আঁকড়ে ফিরে এসে তাকে কী বলে? —বেশ্যা না? তুই একটা—। তুই একটা বেশ্যা— বেশ্যা— বেশ্যা।

—তুমি কি আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ বাপি!

আতকে নীল হয়ে যেতে যেতে বুলু বলল।

গিরগিটি প্রকাণ্ড থাবায় বুলুর পায়ের পাতা চেপে ধরল।

—তুই আমায় 'মহৎ, বড়ো, ঈশ্বরসদৃশ,' এইসব বলে ভোলাতে চাস। নকল শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসার থ্যাটার করে। শ্যামল দত্ত নিজের কাজ হাসিল করে তোকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে। আমায় ছাড়া তোর এখন গতি নেই, আশ্রয় নেই। —বনলতা একি আমি বুঝি না ভেবেছিস।

পায়ের পাতা ছেড়ে থাবাটা বুলুর পায়ের ডিম চেপে ধরল। থাবার মধ্যে বুলুর পায়ের ডিম চটকানো ময়দার লেচির মত ফুলে উঠল।

গিরগিটি ভাবল, বনলতা তুই ভেবেছিস সুন্দর একটা কচি মুখ দেখিয়ে আমায় দুর্বল করে দিবি। আমার মনকে স্নেহার্দ্র করে দিবি। তারপর পরের মেয়েকে আমার বলে চালিয়ে ড্যাং ড্যাং করে জীবন কাটিয়ে দিবি।

—আমায় ছেড়ে দাও বাপি। ওখানটা যে আমার মুচকে গেছিল— ওখানটায় যে ব্যথা। —আঃ, আমার যে লাগছে। ভয়ানক লাগছে। আঃ—

একটা শব্দ উঠে আসছিল!

গভীর থেকে।

শব্দটা পরিচিত। খুব চেনা। অনাদির কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, সে শব্দটাকে ঠিক ধরতে পারছে না।

তারপর অনাদি নিজেকে শুনিয়েই যেন ফিসফিস করে বলল, শব্দটা, আসলে কলিং বেলের। —কে কোথায় কাকে যেন ডাকছে!

কে ডাকছে ? কাকে ? কোথায় ?

অনাদি বুঝতে পারল কলিং বেলটা বাজছে নিচে এবং এই বাড়িতেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কথার টুকরো। বনলতার স্বর। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল হাট করে।

বনলতা ঘরে ঢুকল।

—বাপ মেয়েতে সারাটা দুপুরে খুব হুল্লোড় হচ্ছে বুঝি !

বুলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মা গো, বাপি আমায় খেয়ে ফেলছিল—

—ওমা, তাই নাকি ! তোমার বাপি কি বাঘ, না রাক্ষস—

—বাপি একটা গিরগিটি হয়ে গেছিল মা।

—ছি বুলু। তুমি ভারি অসভ্য হচ্ছ দিন-দিন।

বনলতা মেয়েকে ভর্ৎসনা করল। অনাদি তাকিয়েছিল বনলতার দিকে হাঁ করে। বনলতা লজ্জা পেল। অন্য দিকে তাকাল। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। আঁট-সাঁট পোশাকটাকে সহজ করে নিল। তারপর খাটের কাছে আসতে আসতে কী ভেবে বলল, জানালা-দরজাগুলো খুলে দিই কী বলো ? রোদের ঝাঁঝ পড়ে গেছে।

বনলতা জানালার দিকে এগিয়ে গেল। এইবার কেমন একটা ভয়, কেমন একটা আশঙ্কা— অনাদিকে উৎকণ্ঠিত ও চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলল।

এখুনি আলো ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘরে। টেবিলে চেয়ারে মেঝের দেওয়ালে এবং আয়নায়—।

এইবার আয়নায় যে প্রতিবিম্বটা ফুটে উঠবে সেটার দিকে তাকিয়ে অনাদি কি সোল্লাসে ঘোষণা করতে পারবে, এই তো আমি।

ঘরের অন্ধকার

রোদ ছিল ঝকঝকে। বাতাস মিঠে। দুলু মেঝেতে মাদুরে বসে দুলে-দুলে 'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার···'পদ্য মুখস্থ করছিল। ইতি কোলের ওপর স্লেটের তলা চেপে ধরে, জিভ প্রায় নাকের তলায় ঠেকিয়ে, ঘাড় কাত করে ক—খ লিখছিল সজোরে। তার ছোটোটা, দু হাতে একটা বেবীফুড-এর টিনের ঢাকনা মুখে ধরে মাড়ি দিয়ে কামড় খাচ্ছিল ; দু হাত কনুই বেয়ে লালা ঝরছিল টুপিয়ে। দোরগোড়ায় চৌকাঠটাকে মাথার বালিশ করে ঘুমোচ্ছিল পুষি। চারটে বাচ্চা ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে পেট টিপে টিপে দুধ খাচ্ছিল চুকচুক। কড়ি-কাঠে গুনগুনিয়ে ফিরছিল এক জোড়া ভোমরা। রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসনের, আঁচলের চাবির ব্যস্ত শব্দ আসছিল। তক্তাপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে এসব দেখতে দেখতে প্রশান্ত, পায়ের পাতার ওপর যার নরম রোদ, গরম ভাত আর পান-জর্দার রসের আলস্য যার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে, অনুচ্চস্বরে, 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে...' গাইতে গাইতে প্রথমে বাসে স্টেশান পর্যন্ত মাইল কয়েক, তারপর ন'টা সাঁইত্রিশের ট্রেন ধরে অফিস যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

প্রশান্তর পরনে আণ্ডারওয়ার, গেঞ্জি, পায়ের তলায় পা-ছাড়া স্ট্র্যাপ দেওয়া খড়ম। 'তোমরা যে বলো দিবস-রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা···' প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিস্টওয়াচ তুলে নিয়ে সময় দেখে, আর না, উঠতে হয় এবার, ভেবে উদ্‌যোগী হল। 'সখী ভালোবাসা কারে কয়' উঠে দাঁড়িয়ে আলনা থেকে ধুতি টেনে নিল। ছোটোটা একইভাবে ঢাকনা কামড়াতে কামড়াতে মুখের দিকে তাকাতে প্রশান্ত ধুতির গিঁট কষা শেষ করে ঠোঁট মুচড়ে চুমো দেবার ভঙ্গি করল। কোমর ভেঙে নুয়ে 'সে কি কেবলই যাতনাময়···' কোঁচা পালিশ করতে গিয়ে প্রশান্ত থমকাল, তার পর, চিৎকার করে উঠল, 'শুনে যাও, শিগগিরি শুনে যাও—'

দুলু পদ্য মুখস্থ করা থামিয়ে, ইতি বাহুর উল্টো পিঠ দিয়ে সামনের ঝুলে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে প্রশান্তর দিকে তাকাল। ছোটোটার মনোযোগ ব্যাহত হতে,

হাতের চাকনা ফেলে দিয়ে 'তা-তা' করতে করতে বেড়ালের ল্যাজ ধরার জন্য পাছা-হেঁচড়ে এগিয়ে যেতে থাকল। রমা অতি দ্রুত আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় শুয়ে থাকা পুষি হঠাৎ ভয়ে তড়াক করে পাক খেয়ে উঠে দাঁড়াল। বাচ্চা কটা ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিকে।

'কী হল!' রমা শঙ্কা নিয়ে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

প্রশান্ত মুঠোর মধ্যে ধরা ধুতির কোঁচা জাপানি হাতপাখার মতো ফরফর করে মেলে ধরল। চোখের সামনে প্রশান্তর একটা গোটা উরু, রোমশ পায়ের সবটা, হলুদ ছোপধরা আণ্ডারওযার। তারপর সামনে মেলে ধরা ধুতির কোঁচার অংশটার দিকে চোখ পড়তে 'ও কী।' প্রশান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে রমা বলল, 'কী করে হল?'

'আমি তো তাই-ই জিজ্ঞেস করছি।' প্রশান্তর স্বর তিক্ত।

রমা উত্তপ্ত হয়ে উঠল, 'আমি কী করে বলব? নতুন ধুতি সবে গোটা দুয়েক ধোপ্ পড়েছে— নিজেই কোথায় খোঁচা-টোচা লাগিয়ে এনেছ।'

'বাজে বকো না— এটা খোঁচা লেগে ছেঁড়ার মতো? প্রশান্ত ধুতির ছেঁড়া অংশটা হাতের চেটোর ওপর বিছিয়ে ভালো কবে দেখবার জন্যই যেন দু কদম এগিয়ে এল— 'চোখে চশমা লাগাও—'

'তা হলে বোধ হয় ধোপা—।'

'না, ধোপা নয়,' প্রশান্ত ধমকে উঠল। 'সোমবার থেকে পরছি, তা হলে আগেই নজরে পড়ত। একটা ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে পারলেই হল, না।'

নাটকীয ভঙ্গিতে বমা মুখের সামনে দুটো হাত নাড়ল— 'তা হলে আমিই দাঁতে করে…'

প্রশান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠতে যাচ্ছিল। তার আগেই রমা বলল 'ভাম।'

রমার চোখে চোখ রাখল প্রশান্ত, 'কী যা-তা বলছ?'

'ওই দেখ মা, বোন বেড়ালবাচ্চা ধরেছে।' ইতি সাবধান করার আগেই বেড়ালবাচ্ছাটা ফ্যাস্ করে হাতে থাবা কষিয়ে তক্তাপোশের তলায় গিয়ে সেঁধুল। মেয়েটা ডুকরে উঠল। রমা কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত হাতটা দেখে নিল নখের দাগ পড়েছে কিনা। 'চুপ্, চুপ্,' গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করতে করতে রমা প্রশান্তর দিকে মনোযোগ দিল আবার। 'কাল রাত্রে, রান্নাঘরে ওদের খেতে দিয়ে ভাবলাম, মেয়েটা একলা অন্ধকার ঘরে ঘুমাচ্ছে, দেখে আসি

একবার। ঘরে ঢুকতেই ভামটা জানলা গলে পালাল। ভাবলাম তক্তাপোশের তলায় বেড়ালবাচ্চাগুলো ঝুড়িচাপা রয়েছে, সেই লোভে ঘরে ঢুকেছে। তারপর আলনার কাছে গিয়ে দেখি, গোছানো জামাকাপড়গুলো তলায় ছত্রাকার হয়ে রয়েছে। তোমার ধুতিটাও ছিল। অন্ধকারে অতোশতো লক্ষ করি নি। তখনই বোধ হয় ভামটা—'

'ধ্যুত, ভাম ইঁদুরের মতো কাপড় কাটে নাকি?' প্রশান্তর কর্কশতা কমে এসেছিল। বরং রমার ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে না পেরে ধুতির ছেঁড়া অংশ ঘাড় নামিয়ে পরীক্ষায় রত হল।

রমাও লক্ষ করছিল, 'ইতু ধরতো বোনকে—।'

ইতি উঠে এসে 'বোন আয়' বলে হাত বাড়াল। মেয়েটা কলকল হেসে রমাকে আরও আঁকড়ে ধরল। পেটেপিঠে পা দাপাতে লাগল। ছাড়িয়ে ইতির কোলে দিতে কান্না ধরল। রমা এগিয়ে এসে প্রায় জোর করে প্রশান্তর হাত থেকে কোঁচাটা হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

ইতি বোনকে কাঁখে নিয়ে ভার সামলাতে বিপরীত দিকে শরীর হেলিয়ে টলমল করতে করতে দরজার দিকে এগুচ্ছিল, মার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুলু প্রশান্তর পেছন থেকে মা কী করছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল। রমা মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে কাপড়ের ছেঁড়া অংশের আশেপাশে নাক লাগিয়ে বেড়ালের মতো শুঁকছিল।

একটা দুম্বো লোক, একটা মেয়েমানুষ কোমরের নীচে মাথা ঝুকিয়ে কী করছে, এক দিকের উরু উদোম্, ছেলেমেয়েরা রয়েছে— দৃশ্যটির কথা চিন্তা করে প্রশান্ত জ্বলে উঠল, 'আঃ আরম্ভ করলে কি তুমি। ছাড়ো—' রমার হাত থেকে কাপড় টানতে গিয়ে প্রশান্তর ভ্রূ বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল।

প্রশান্তর পায়ের পাতার ওপর কোঁচা লুটিয়ে পড়ল।

'ভামের আর দোষ কী? এমন সুন্দর মাংসের গন্ধ।' কথা শেষ করেই রমা ফিরল। 'হারামজাদি মেয়ে বোনকে একটু চুপ করাতেও পারো না।' ইতির চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে রমা ছোটোটাকে কোলে তুলে নিল। 'আর-একবার গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে দেখ, দেব গলা টিপে শেষ করে।' ছোটোটা আরো ককিয়ে উঠল।

প্রশান্ত ভীত, বিমূঢ়, নিশ্চল।

ছোটোটাকে নিয়ে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দুলু কৌতূহল চেপে আর রাখতে না পেরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবার কাপড়টা ভামে

কেটেছে মা, অ্যা ?'

'হ্যা বাবা—' রমা খনখন করে উঠল। 'খরচ কুলোতে পারছে না বলে তোমার বাবা বাড়িতে সপ্তায় দুদিন মাছ-মাংসের বরাদ্দ দিয়ে নিজে লুকিয়ে পাঞ্জাবি হোটেলে মাংসের প্লেট সাবড়ে আসছেন। ছেলে মেয়েদের ঠকানো, এতো পাপ কখনো সহ্য হয়! ঈশ্বর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।' দু চোখে শিকারি টর্চের আলো জেলে রমা প্রশান্তর চোখে রাখল। রমা যেন শিকারি। অন্ধকাব থেকে দপ করে আলো ছুড়ে প্রশান্তকে অন্ধ করে দিয়েছে। প্রশান্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রমা শিকারের অবস্থা লক্ষ করে ধীরেসুস্থে নিশানা স্থির করে ট্রিগার টিপল। চিবিযে চিবিয়ে বলল. 'জিভে পোকা পড়বে।'

রমা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রশান্ত আহত জন্তু। অন্ধকারে ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কাতরাতে নিষ্ফল আক্রোশে মাড়ি উল্টে, চোয়ালে চোয়াল চাপা দাঁত দেখিয়ে গরগর করতে লাগল। ইতি পেছন ফিরে দেয়ালে শরীর লেপটে সর্দি টানতে টানতে কাঁদছে। প্রশান্তর দৃষ্টি দুলুব ওপর পড়ল। দুলু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে পড়তে বইযের ওপব ঝুঁকে পড়ে পদ্য মুখস্থ করতে লাগল, 'পার হয়ে যায় গরু পার হয গাড়ি ··।'

গেট-এর পাশেই লাইট-পোস্ট। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা কম্পাউণ্ডের ওধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালপালা এসে আবার আড়াল করে রেখেছে আলোটা। সেই নিস্তেজ আলোয় চোখের দৃষ্টি সরু করে প্রশান্ত দরোয়ানের হাত থেকে বাঁধন খাতা টেনে নিয়ে তারিখের ঘরে তারিখ, সময়ের ঘরে সময়, তারপর নিজের নাম লিখল। 'হুম টু সী'র ঘরে লিখল মিঃ এ মিটার। পরের ঘরটা উপস্থিত খালি রইল। বেরিয়ে যাবার সময় লিখে দিয়ে যেতে হবে। দরোয়ান খাতা ফেরত নিয়ে বিরাট লোহার গেটটা সামান্য একটু ঠেলে ফাঁক করে সরে দাঁড়াল। প্রশান্ত ফাঁকটুকু দিয়ে শরীরকে ভেতরে গলিয়ে দেবার সময় আড়চোখে একবার দরোয়ানের মুখের দিকে তাকাল। অচেনা লাগল। পুরোনো কেউ হলে তাকে গেট-এর পুরো একটা পাল্লা খুলে ধরার মর্যাদা না দিলেও 'মিত্তির সাহাবকা ভাই বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে ছোটো একটা সেলাম দেবার অন্তত ভঙ্গি করত।

চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। রাস্তার দু ধার দিয়ে হাঁটুর উঁচু কেয়ারি করা হেজ। সেখানে মানানসই ভিত্তিতে গোল লম্বা, ত্রিকোণ মরসুমি ফুলের বেড।

লাইট-পোস্টে ফ্লুরেসেণ্ট টিউব। টেনিস-কোর্টে জোড়ে খেলা চলছে। গঙ্গার দিক থেকে হাওয়া বইছে— সেইজন্যই সম্ভবত ব্যাডমিণ্টন্ কোর্টে আজ আলো জ্বলেনি। ওপারে, গঙ্গার ধারে জি. টি. রোডে হেড-লাইটের মিছিল। এতক্ষণে শব্দটা মৃদু ছিল, প্রশান্ত একটানা তিনতলা কোয়ার্টারগুলোকে পাশে ফেলে বাঁক নিতেই শব্দটা যেন বানের ঢেউয়েয় মতো হুড়মুড় করে তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। এদিকটার কম্পাউণ্ডে প্রায় গা লাগিয়েই স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট। ঝমঝম করে চলেছে চব্বিশ ঘণ্টাই। এই খোলামেলায় শব্দটা যতটা বিরক্তিকর মনে হয়, প্রশান্ত দরজা-জানালা বন্ধ কোয়ার্টারের মধ্যে বসে অনুভব করেছে, শব্দটা ঠিক ততখানি খারাপ লাগে না। বরং মন-মেজাজ ভালো থকেলে মাঝে মাঝে ভালোই লাগে— সোফায় গা ডুবিয়ে ফ্যানের তলায় বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে চোখ বন্ধ করে রাখলে জলপ্রপাতের শব্দের মতো লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে ঝক্‌ঝকে পালিশ করা প্রকাণ্ড দরজার সামনে বসে প্রশান্ত দাঁড়াল। দরজার ফ্রেমে কলিং-বেলের সাদা বোতাম। দরজার ওধার থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছে। রীতা নাচ প্র্যাক্‌টিস করছে। জামাকাপড়-গুলো সামান্য ঝেড়েঝুড়ে, রুমালে মুখ-গলা ঘষে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে প্রশান্ত কলিংবেলের বোতাম টিপল। তারপর দরজার ওধারে কলিংবেলের শব্দের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘুঙুরের শব্দ থামল, চুপচাপ, ঘুঙুর এগিয়ে আসছে।

'আরে কাকু—' দরজার ফাঁকে রীতার উদ্ভাসিত মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ,। 'উঃ, কত দিন পরে এলে বলত···' বলতে বলতে রীতা দরজার দুটো পাল্লাই প্রশান্তর সামনে হাট করে মেলে ধরল। বেরিয়ে এসে প্রশান্তর পাশ দিয়ে পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকাল, 'কাকিমা কই? ওরা?'

'কেউ আসে নি রে—' প্রশান্ত বাঁ হাত দিয়ে রীতাকে পাশে টেনে নিল।

'আনলে না কেন?'

পাশে পাশে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে, ঝুম্‌ঝুম্ ঝুম্‌ঝুম্। পাশাপাশি গোটা চারেক ঘর। বসবার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে প্রশান্ত চোরাচোখে একবার দালানের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছে অমিত। যতটুকু না করলে নেহাত অভদ্রতা হয়, সেইরকম তাকাল একবার এদিকে। চশমার পেছনে চোখ দেখতে পেল না প্রশান্ত। মনে হল, ঠোঁট দুটো যেন সামান্য একটু প্রসারিত হল। মনে মনে হয়ত ভাবছে, নাও, এখন আবার এক উট্‌কো আপদ্ এসে জুটল। প্রশান্ত দাঁতে দাঁত পিষল মনে মনে, রাস্কেল্। অথচ,

ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস, প্রশান্ত ভাবল, তাকে আজ মূলত ওর কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশান্ত বলল, 'আনব কী রে— ? আমি কি বাড়ি থেকে আসছি, সোজা অফিস্ থেকে··· ।'

মেঝেতে কার্পেট বিছানো। তার ওপর কোচ, সোফা, পাশে পাশে লো টেবিল, মাঝখানে সেণ্টার-টেবিলের ওপর বোনাটোনার বিদেশি পত্রিকা, স্টেটস্-ম্যান্, সিনেমা আর খেলাধূলোর ইংরেজি সাপ্তাহিক। বউদি দাদা রীতা অমিত তিনতলার তিনঘরযুক্ত কোয়ার্টার, জল-প্রপাতের শব্দ আবহসংগীত। আলমারির তাকে রবীন্দ্ররচনাবলী, কেষ্টনগরের পুতুল, মাটির ফলফুলুরি, আনাজ্। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বলল, দাদাকে দেখছি না যে— ?

রীতা যে সোফায়টায় প্রশান্ত বসেছিল, তার হাতলের ওপর বসে নিচু হয়ে ঘুঙুর খুলছিল। বলল, 'বাবার তো বি-শিফ্ট, তুমি আসার মিনিট দশেক আগেই তো চা খেয়ে বেরিয়ে গেল।'

'মাকে ডাকো।'

'মা-ও নেই, নাইট্ শোয়ে মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে ফিল্ম্ দেখতে গেছে।'

রীতা উঠে দাঁড়াল। সালোয়ারের ওড়ানাটা গুছিয়ে ঘুঙুর দুটো দু হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে বাজাতে বাজাতে 'দাঁড়াও, তোমার জন্য চা বলে আসি', বলে পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অন্যমনস্কের মতো টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিয়ে এলোমেলো পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে হঠাৎ একটা আশঙ্কায় প্রশান্তর বুক দুরদুর করে উঠল। দেয়ালের দিকে তাকাল, সামনের দেওয়ালে দাদার টেনিস্ র‍্যাকেট্ ঝুলছে, ওপাশের দেয়ালে এক জোড়া ব্যাট্‌মিণ্টন্ র‍্যাকেট, ভেতরে যাবার দরজার পর্দার দিকে দ্রুত একবার দৃষ্টি ঝুলিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। আহ, আছে ব্র্যাকেটের ওপর, ক্যাম্বিসের খোলে মোড়া··· যেমন থাকে, তেমনিই রয়েছে। প্রশান্ত গভীর প্রশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল।

কব্জি উল্টে সময় দেখে প্রশান্ত আর সময় নষ্ট করা সমীচীন হবে না মনে করল। সাড়ে আটটা বাজে, সাড়ে ন'টায় শেষ বাস। তারপর রীতা এসে পড়লে প্রশান্তর পক্ষে কথাবার্তা চালানো একটু শক্ত হয়ে পড়বে। প্রশান্ত গুটিগুটি দালানে শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল।

'কেমন হচ্ছে পড়াশুনো ?'

'ওই···' অমিত বই থেকে চোখ না তুলেই বলল।

প্রশান্ত মনে মনে জ্বলে উঠল, এই বয়সেই ডাঁট শিখে গেছে বেশ, চোখ-মুখে কথাবার্তায় সব সময় যেন মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে, আমি চট্‌কলের হাজারি মনসবদারের পোলা। —সে তোর বাবা, তুই কী রে? কোনো রকমে তো গড়িয়ে গড়িয়ে ক্লাসে উঠিস্। প্রশান্ত আগেও লক্ষ করেছে, যখন দাদা-বৌদি রীতা আর অমিতকে নিয়ে ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাড়িতে যায়, অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের বেশি থাকে না কখনোই— ইলেক্‌ট্রিক আলো নেই, ফ্যান্ নেই, রাস্তার কলে জল ধরতে হয়, পুকুরে স্নান সারতে হয়। তখন রীতা দুলু-ইতিদের নিয়ে সারা উঠোন-ময় হুড়োহুড়ি করে খেলা করে। অমিত কোমরে হাত দিয়ে পায়চারি করে। বসে না পর্যন্ত। রমা খাবার দিলে দু আঙুলে একটা যা-হয় তুলে নিয়ে আলগোছে মুখে ফেলে যেন কোনোরকমে গলাধঃকরণ করে। গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়াবার আগে জিজ্ঞেস করে, জল ফোটানো কিনা। ওরা উঠোনময় হুড়োহুড়ি করে বেড়ায়। তখন পায়চারি করতে করতে এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যেন পাঁচতলা বাড়ির জানালা থেকে বস্তির ছেলেদের হাইড্রানটের জলে স্নান করা দেখছে।

এখন, নিজের গরজ। প্রশান্ত গলার স্বর যথাসম্ভব ভারি করে বলল, 'কোন্ লাইনে যাবে ঠিক করেছ?'

অমিত এবার সরাসরি চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রশান্তর চোখের দিকে তাকাল, 'পরীক্ষাটাই তো আগে হোক্…।'

একদলা কাদা কেউ যেন প্রশান্তর মুখের ওপর ঘুঁটে দেবার মতো থাব্‌ড়ে বসিয়ে দিল। ঢোক গিলে প্রশান্ত উপেক্ষাটা হজম করল। প্রশান্তর ভেতরে দু দিক থেকে তাড়া আসছে, রীতার আসার আর দেরি নেই। শেষ বাস ধরতেই হবে।

প্রশান্ত টেবিলের ওধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। অমিত চোখ তুলে দেখে বইয়ে ঘাড় গুঁজল আবার। টেবিলের ওধার থেকে অমিতের ঘাড়ের দিকে চোখের দৃষ্টি সরু করে ফেলে প্রশান্ত চিন্তা করতে লাগল— কিভাবে এগুনো যায়, কেমন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়?

'তুমি তো এন সি সি নিয়েছ, না?'

'অমিত মাথা নাড়ল।'

'ওখানে কী শেখায় তোমাদের?'

'মার্চ, রাইফেল্ শুটিং… এইসব।'

'বাঃ বাঃ।' কথাটাকে প্রায় লুফে নিয়ে প্রশান্ত চোখেমুখে একটা প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলল, 'রাইফেল্ শুটিং-এ তোমার হাত নিশ্চয়ই বেশ খুলে গেছে এখন?'

অমিত খানিকটা বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল, 'কেন ?'

'বাঃ, তোমার মনে নেই—', প্রশান্ত টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল, 'সেবার, তুমি বাড়িতে তোমার এয়ার-রাইফেলটা নিয়ে গেছিলে ? আম গাছের মগডাল থেকে একটিমাত্র গুলিতে তুমি যেভাবে কাকটাকে নামিয়ে আনলে, খুব উঁচুদরের নিশানা জ্ঞান না থাকলে ও-রকম হয় না। তারপরের কাণ্ডটা মনে আছে তোমার, দেখতে দেখতে এক হাজার কাক জুটে গেল··· সাঁ-সাঁ করে বাড়িটাকে ঘিরে পাক খেতে লাগল, চিৎকার, বাড়িতে তিষ্ঠোনোই দায়··· ।

অমিত হাসল। চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে বসল। 'ওটা কিন্তু আন্দাজেই···'

'আরে না না, আন্দাজে হবে কেন ?' অমিতকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রশান্ত নিজের জিভে টেনে নিল, 'যাদের মধ্যে আসল জিনিস থাকে, হঠাৎ একদিন তা বেরিয়ে পড়ে।··· আমাদের সময় ম্যাট্রিকের সিলেবাসে ওই ধরনের একটা পিস্ ছিল। এক লেঠেল, হাতে লাঠি ধরলেই তার শরীরে কী যেন ভর করত।'

প্রশান্ত একটু সময় যেতে দিল। ক্ষেত্রটা কেমন প্রস্তুত হল, বোঝবার চেষ্টা করল। প্রসঙ্গটায় একেবারে সরাসরি না গিয়ে পড়ে প্রশান্ত আরো একটু ঘুর-পথে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করল। 'আচ্ছা, তোমার এয়ার-রাইফেল্‌টায় পাখিটাখি ছাড়া কুকুর-বেড়ালটেড়াল মরে ?'

'কুকুর মরে কিনা জানি না, আমি একবার একটা বেড়াল মেরেছিলাম।' অমিত একটা কাগজে আঁক কাটতে কাটতে বলল, 'ঠিক তক্ষুনি মরে নি, শট্‌স্‌টা গলায় লেগে ভেতরেই থেকে গিয়েছিল। তিন চার দিন বাদে দেখি, টেনিস্ কোর্টের বেঞ্চ্-এর তলায় মরে পড়ে রয়েছে। শট্‌স্‌গুলো তো লেড্-এর। লেড্-পয়েজনিং হয়ে গেছিল।'

ভেতরের ঘরে কাপ্-প্লেটের শব্দ হচ্ছে। রেফ্রিজারেটার খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। রীতা এখনই চা নিয়ে এসে পড়বে।

প্রশান্ত আর সময় নষ্ট করা ঠিক বলে মনে করল না।

'তোমার এয়ার-রাইফেল্‌টা আমায় একবার দিতে পারো ? এই দিন-দুয়েকের জন্যে ? —গুলিটুলি আছে তো ?'

'আছে বোধ হয় কিছু—।' অমিত রীতিমত কৌতূহলী, 'কী করবেন ?'

এরকম এক কথায় রাজি হয়ে যাওয়ায় প্রশান্ত অমিতের ওপর দারুণ প্রসন্ন

হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতেই তুমি থেকে তুই-তে এগিয়ে গেল। 'আর বলিস্ কেন?' বলতে গিয়ে প্রশান্ত থমকাল। এখন বলতে গেলে সবিস্তারে সব বলতে হয়। ড্রাম-টামের ব্যাপার শুনলে অমিত হয়ত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে থাকবে, এদিকে শেষ বাস ধরতেই হবে। এখন চা খেয়ে বন্দুকটা নিয়ে উঠতে পারলে হয়। ছেড়ে দেওয়া কথাটার খেই খুঁজে নিয়ে প্রশান্ত বলল 'এক ব্যাটা পাগলা কুকুর কদিন হল কোথা থেকে এসে বাগানে ডেরা করেছে। দিনরাত খ্যাচখ্যাচ করে লোকজন তাড়া করছে··· এবার বাপধনকে এমন শিক্ষা দেব—।'

একটা ট্রেতে করে রীতা খাবারের প্লেট আর চা নিয়ে এল।

'কাকু পুডিংটা খেয়ে বলো কেমন হয়েছে— আমি তৈরি করেছি।' রীতা ট্রে থেকে পুডিং আর কাজুবাদামের প্লেট দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

এত সহজে কার্যোদ্ধার হবার আনন্দে প্রশান্তর বুকের ভেতরটা হালকা হালকা লাগছিল। রীতার মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খুউব যে গিন্নি হয়েছিস—।'

'দেখি, শটস্ আছে কিনা? অমিত চেয়ার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে রবারের চটি বাজিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

চামচ করে পুডিং কেটে মুখে দিয়ে প্রশান্তর বাড়ির কথা মনে হল। বাড়ি গিয়ে হয়ত দেখবে, রমা তার যুদ্ধের বহু ব্যবহৃত অস্ত্রটাই নিয়েছে এবারও। অর্থাৎ আহার বন্ধ। ঘাড় তুলতে দেখল, রীতা মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রশান্ত সমস্ত চোখেমুখে রস টেনে আনল— 'দারুন!' তারপর হাঁক পেড়ে বলল, 'ওরে অমিত, গুলিটুলি একটু বেশি করে আনিস্। অমি তো আবার ইণ্ডিয়ার পয়লা নম্বর কাদার-পায়রা শুটার—।'

শেষ বাস পেল না। সাইকেল-রিকশা করতে হল। হাতে ক্যাম্বিসের খোলে মোড়া বন্দুক। রিকশার ঝাঁকুনিতে পকেটের ভেতর গোল পিচবোর্ডের বাক্সে সিসের গুলিগুলো সড়সড় করে উঠছে। সমস্ত শরীরে উত্তেজনা। প্রশান্ত রিকশা ভাড়ার বাড়তি খরচের আফসোসটুকুকে আমলই দিল না।

রমা দরজা খুলে দিল। সদর দরজার খিল ছিটকিনি ঠিকঠাক মতো লাগিয়ে প্রশান্ত দেখল, শোবার ঘরের দরজার গোড়ায় হ্যারিকেন্ নামিয়ে রাখা। ঘরে এসে দেখল, রমা মেঝেতে পাতা বিছানার মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নিজের অনুমানকে প্রশান্তর সত্য বলেই মনে হল। রমা সেই সকাল থেকে দাঁতে দাঁত

দিয়ে পড়ে আছে। ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে। তক্তাপোশের ওপর প্রশান্তর বিছানায় মশারি ফেলা।

প্রশান্ত বন্দুকটা ঠেসান দিয়ে রাখল দেয়ালে। কোমর ভেঙে নিচু হয়ে মশারির দড়ির তলা দিয়ে গলে টেবিলের কাছে গিয়ে একে একে পকেটের জিনিসগুলো বার করে রাখল। হ্যাঙারে পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে দিল। কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। প্রশান্ত জানে, মশারির ভেতর থেকে এক জোড়া চোখ সব লক্ষ করছে, সব কিছু দেখছে।

আওতার ভেতর গোছানো রয়েছে সব। রকের ওপর বালতিতে হাতমুখ ধোবার জল, কাপড় শুকতে দেবার দড়িতে গামছা, রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া রাত্রের খাবার, তক্তাপোশের তলায় ডাবরের ওপর সাজা পান, জর্দার কৌটো।

পান চিবোতো চিবোতে তক্তাপোশের কোলের দিকে মশারি সুদ্ধ বিছানাটা একটু উল্টে দিয়ে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে প্রশান্ত সিগারেট ধরাল। ঠোঁটে সিগারেট চেপে ক্যাম্বিসের খোলের মধ্য থেকে বন্দুকটা টেনে বার করল। হ্যারিকেনের আলোয় বন্দুকটা দেখাল আরো ঝকঝকে, আরো মসৃণ। প্রশান্ত বেশ অনুভব করল, বন্দুকটা হাতে নিতেই তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তেতে উঠেছে।

খোলা দরজা দিয়ে প্রশান্ত বাইরে তাকাল। আমগাছটার যে ডালটা বাড়ির ঘেরা পাঁচিলের ওপর এসে পড়েছে, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বন্দুকের ট্রিগার, নল, মাছি, গুলির চেম্বারের ওপর আলতো করে হাত বোলাল। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। টুকরোটা দু আঙুলের টোকায় বেশ খানিকটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশান্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে টেনে দরজা ভেজিয়ে দিল।

আকাশে ফিকে একটু চাঁদের আলো রয়েছে। হাল্কা কুয়াশা ঝরছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশান্ত এমন একটু জায়গা খুঁজল যে-জায়গাটা অন্ধকার ঘুপচি মতন, যেখান থেকে আমগাছের যে ডালটা পাঁচিলের ওপর এসে পড়েছে, সেই জায়গাটা পরিষ্কার লক্ষ্যের মধ্যে রাখা যায়। —ওইটাই আসা-যাওয়ার রাস্তা। অনেকদিন প্রশান্ত ঘরে বসে দেখেছে। বাড়ির আলো নিবলে ভামটা আমগাছের ডাল দুলিয়ে ঝুপ্ করে নামল পাঁচিলের ওপর। নেমে অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে পাঁচিলের ওপর কালমেঘ আর ডাকাতে পাতার ঝোপের মধ্য দিয়ে তরতর করে চলে এল একেবারে রক পর্যন্ত। লাফিয়ে নেমে

পড়ল বুকের ওপর। তারপর চষে বেড়ায় সারাটা বাড়ি। বাসন ধোবার জায়গায় গিয়ে টুকিয়ে টুকিয়ে এঁটোকাঁটা খায়। টালির ফাঁক দিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। বেড়াল বাচ্চাগুলো ভালো করে চাপা দেওয়া না থাকলে পরদিন দেখা যায় ঘাড় মটকে প.ড় রয়েছে—। শরীরে একবিন্দু রক্তও অবশিষ্ট নেই। রমা পাউরুটি বা দুধের বাটি জালের আলমারিতে তুলে রাখতে ভুলে গেলে আর কিছুই পাওয়া যায় না। রাত্রে অনেক সময় এমনও হয়েছে খুটখাট শব্দে প্রশান্তর ঘুম ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়েই তাড়া দিয়েছে— অন্ধকারে চকিতে একটা কালো ছায়া লাফ দিয়েছে জানালার বাইরে।

জায়গা খুঁজতে গিয়ে প্রশান্ত রান্নাঘরের পাশটাই পছন্দ করল। ওখান থেকে আমগাছের ডাল, পাঁচিলের সমস্তটাই নজর এবং নিশানার মধ্যে থাকে। লুঙ্গি গুটিয়ে বন্দুকটা সযত্নে পাশে রেখে প্রশান্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদ খুব মৃদু জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে শিরশিরে বাতাস গাছের ডালপালা নাড়িয়ে দিচ্ছে। চার দিক নিঃশব্দ ছিল। কাছেই একটা শেয়াল ডাকল। হুইহুই পড়ে গেল চতুর্দিকে।

প্রশান্ত সচেতন হল। খুব পরিচিত শব্দ। অনেকটা তেল-না-দেওয়া সাইকেলের চাকার কিচ্ কিচ্ শব্দের মত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়া আমগাছের ডালটার দিকে। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, ডালটা নড়ছে হাওয়ায়, না কোনো শরীরের ভারে। কিন্তু ভামটার উপস্থিতি এখন প্রশান্তর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। প্রশান্ত বন্দুকটা হাতের মুঠোয় তুলে নিল। অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রশান্ত বুঝল, তাকে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে না। একসময় দেখল, একটা শরীরী ছায়া আমগাছটার ডাল বেয়ে নিঃশব্দে পাঁচিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমগাছের ডাল ঝরঝর করে নড়ে উঠল। —ঝুপ করে ছায়াটা লাফিয়ে নামল পাঁচিলের ওপর। প্রশান্ত দ্রুত বন্দুকটা কাঁধে লাগিয়ে ডান চোখ বুজিয়ে পাঁচিলের দিকে নল স্থির করল। আমগাছের ছায়া পড়েছে পাঁচিলের ওই অংশটায়। দেখা যায় না, কিন্তু ছায়াটার উপস্থিতি নড়াচড়া অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ছায়াটা গুটিগুটি পাঁচিলের ওপর দিয়ে এগুচ্ছে। আলোয় বেরিয়ে এল। খুব সাবধান, সন্তর্পণ ভঙ্গি। প্রশান্ত পুরোপুরি সমস্ত শরীর নিয়ে এবার ভামটাকে দেখতে পেল। বন্দুকের ইউ-সেপ্ মাছি আর ভামটাকে একটা

সমান্তরাল রেখায় এনে অপেক্ষা করতে লাগল। সময় যেতে দিল। ভামটা এগুচ্ছে। প্রশান্তও চোখের দৃষ্টি, বন্দুকের ইউ-সেপ মাছি এবং লক্ষ্যবস্তু একটা কঠিন সমান্তরাল রেখায় বন্দি রেখে বন্দুকের নল ঘোরাচ্ছে। ভামটা রক্-এর ওপর লাফিয়ে নামার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল। প্রশান্ত বন্দুকের নলটা ভামটার ঠিক মাথায় সমান্তরালে এনে নিঃশ্বাস চেপে ট্রিগার টিপল।

ঠাস্ করে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভামটা পাঁচিলের ওপর স্প্রিং-এর মত হাতখানেক লাফিয়ে উঠে নিচে কচু গাছের ঝোপের মধ্যে পড়ল। প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে। দু চোখে হতভম্ব দৃষ্টি। নিজের লক্ষ্যভেদের অব্যর্থতায় বিমূঢ়। কচুগাছের ঝোপে তখন দারুণ আলোড়ন। অবস্থাটা দ্রুত কাটিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ঝোপ লক্ষ করে আরো কয়েকটা ঠাস্ ঠাস্ গুলি ছুঁড়ল। আওয়াজে বুঝল, গুলিগুলো সবই কচুপাতা ফুটো করল, না-হয় পাঁচিলের খানিকটা করে নোনা খসাল।

ঝোপটা স্থির। প্রশান্ত বন্দুকটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে ঘরের দরজা খুলে হ্যারিকেন বার করে ঝোপটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ফিরতে দেখল, ভামটা বার দুয়েকের চেষ্টায় লাফিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে আমগাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রশান্ত বন্দুকটার দিকে তাকাল। বুঝল, এখন আর চেষ্টা করা বৃথা।

হ্যারিকেন নিয়ে প্রশান্ত এগিয়ে গেল। ঝোপটা ছিঁড়েখুঁড়ে এলোমেলো। হ্যারিকেন আরো কাছে নিয়ে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করল— পাতার ওপর টাটকা রক্তের ছিটে, পাঁচিলের গায়ে রক্তের ফোঁটা আলোয় চোখের মতো চক্‌চক্ করে উঠল।

বিছানায় শুয়ে প্রশান্ত স্থির করবার চেষ্টা করল, গুলিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগতে পারে? মাথায়? নিশ্চয়ই নয়, তাহলে আর পালাতে পারত না। একটি-মাত্র গুলির আঘাত কি অত বড়ো জন্তুটাকে নিহত করতে পারবে! গুলিটা এখনো গিঁথে আছে তো? নাকি ভামটা তার সুঁচোল ঠোঁট ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁতে করে গুলিটাকে টেনে বার করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

পাশ ফিরতে গিয়ে প্রশান্ত দেখল, রমা মশারির ওধারে তক্তাপোশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানায় আসার জন্যে সাবধানে মশারি ওঠাচ্ছে। প্রশান্ত রমাকে জায়গা দিতে বিছানার পাশের দিকে সরে গেল। বালিশের এক দিকে মাথা সরিয়ে নিল, যাতে রমাও মাথা রাখতে পারে। প্রশান্ত চিত হয়ে শুয়ে

ছিল, রমা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে প্রশান্তর বুকের ওপর হাত তুলে দিল।

মশারির চালের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বলল, 'জান আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, গুলিটা ওর গায়ে লেগেছে।'

রমা প্রশান্তর বুকের রোমের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিল।

'শুধু লেগেছে নয়, গিঁথে রয়েছে।' প্রশান্ত বলল, 'দেখ গে, এতক্ষণে হয়ত লেড্-পয়েজনিং শুরু হয়ে গেছে।'

রমা প্রশান্তর ঘাড়ে মুখ গুঁজে দিল। কানের লতিতে নাক ঘষল।

'বুঝলে, কাল থেকে ক'দিন—' প্রশান্ত বলল, 'এদিক-ওদিক একটু খুঁজতে-টুজতে হবে। হয়ত একেবারে কালই মরবে না, আমাদের দু-একদিন একটু খাটতে হবে, বিষটাকে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাবার জন্যে খানিকটা সময় দিতে হবে বইকি!'

রমা আরো সরে এল, 'তা তো দিতেই হবে। আমি বরং দুলু-ইতিকে বলে দেব, কোথাও পচা গন্ধ পেলেই যেন আমায় বলে,— পাড়ার ছেলেদেরও বলে রাখব।'

প্রশান্ত এতক্ষণে যেন নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে রমার শরীরের উত্তাপ টের পেল। পাশ ফিরে মুখোমুখি হল। রমার ঠোঁটে আলতো করে আঙুল বোলাল, 'আজ থাক, সারা দিন তুমি কিছু খাওনি—'

রমা প্রশান্তর হাতের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে পিঠে চাপ দিল।

রমা নিজের বিছানায় ফিরে গেছে। প্রশান্তর দু চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। হঠাৎ একটা চকিত চিন্তায় প্রশান্তর মাথার শিরা-উপশিরায় ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। দু চোখ বিস্তারিত করে তাকাল প্রশান্ত। ভামটাকে হত্যার অভিলাষে রমা এত খুশি কেন? আজ সকালেই তো ভামটা তার একটা গোপন পাপের খবর রমার হাতে পৌঁছে দিয়েছে। আজই সকালে ভামটা রমার কাছে ঈশ্বর ছিল? তা হলে? প্রশান্ত কেঁপে উঠল, রমারও কী কোনো গোপন পাপ আছে!

ঘরের মধ্যে প্রবল অন্ধকার।

অন্ধকার ক্রমেই জমাট আর ভারি হয়ে বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে চাইছে।

অন্ধকারে প্রশান্ত নিজেকে খুব অসহায়, ভয়ংকর বিপন্ন বোধ করল।

অশ্বশক্তি

ডানদিকের ধলারঙের বলদটা বেশি ভিতু। হাইওয়ে দিয়ে লরি বাস গাঁ-গাঁ করে ছুটছে সব সময়। শব্দ শোনে কি ডানদিকের বুড়ো বলদটাকে ঠেলা দিয়ে রাস্তার ঢাল দিয়ে নীচের ধানক্ষেতে হুড়মুড়িয়ে নেমে যেতে চায়। ঘাড় থেকে জোয়াল নামিয়ে গাড়ি কাত করে ফেলে শিং-এ দড়িদড়া জড়িয়ে একাকার। সহায় গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গাড়ির মাথানি চেপে গাড়ির টাল ধরে সামাল দেয়।

বলদজোড়া মাঠে লাঙল দেয়। আর পাঁচটা স্বজাতের সঙ্গে পাক দিয়ে পায়ে পায়ে শস্য মাড়ে। মাঠ থেকে গাড়ি বোঝাই ধান এনে খামারে মজুত করে। বাড়িতে সিদ্ধ শুকনো করা ক'বস্তা ধান নিয়ে যায় ধর্মপুরের ধান ভাঙাই কলে ভাঙাতে কখনো কখনো, কি পাটের গাঁট নিয়ে যায় আড়তে! হাইওয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সেই বলদজোড়া গাড়িতে জুতে আঠারো মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে শহরে আসা। সেখানে ডিলারের ঘর থেকে ব্যাঙ্কের লোনে কেনা শিবুর পাঁচ-ঘোড়ার পাম্পসেট ডেলিভারি নিয়ে ফেরা গ্রাম কেয়াবনে।

পাশাপাশি বাড়ি। মাঝখানে নামমাত্র জিউলির বেড়া। এ-বাড়ির গাছের ঝুনো নারকেল বর্ষার জলে ভারি হয়ে ও-বাড়িতে পড়ে। ও-বাড়ির লাউলতা লতিয়ে এসে এ-বাড়িতে ফুল-ফল দেয়। নালতে দিয়ে পাঁকাল মাছ রান্নার গন্ধ বাতাস ধরে ও-বাড়ি চলে যায়। রাখোহরি ও-বাড়ির দাওয়ায় বসে হাঁক দেয়, 'ও সয়া— জবর বাস ছেড়েছে যে। একাই খাবা নাকি?'

রাখোহরির হাতে তৈরি খেজুরগুড়ের সুখ্যাতি অঞ্চল জুড়ে। যত না বয়েস, তার থেকে বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে। এখন আর নিজে গাছে উঠতে পারে না, আচপাট করতে পারে না গাছের। বাড়ির বাঁধি কিষাণ দিয়ে করায় এসব। কিন্তু বানের সামনে বসে রসের জাল-পাক নিজের হাতে। জিরেন দেওয়া গাছের নলেন গুড় পাঠিয়ে দেয় কেঁড়ে ভরে। বিল থেকে ফুলেকো ঘাসের বীজ এনে দেবার জন্যে সহায়কে নিয়ে পড়ে এবার সহায়ের পরিবার। বিলের কোমর জলে দাঁড়িয়ে বিঘতখানেক বড়ো বড়ো জোক তাড়াবার জন্যে নুন ছিটোতে

ছিটোতে সহায় বোঝা করে ফুলকো ঘাস কেটে আনে। খামারে মেলে রোদে শুকিয়ে ঘাস থেকে বীজ আলাদা করা। ঢেঁকিতে কুটে খোসা ছাড়ানো। খই ভাজা। তারপর সেই খইয়ের সঙ্গে গুড় মেখে মোয়া। দশ গণ্ডা হলে পাঁচ গণ্ডা রাখোহরির।

রাখোহরির ছেলে শিবু।

ধর্মপুর স্কুল থেকে এক চান্সে পাস। পাস করে রেলের কারখানায় ঢোকার জন্যে ধুম ঘুরলো দু-বছর। শিবুর মা-র বুড়ো বয়সে কোমর ভাঙলো পুকুর ঘাটে পিছলে পড়ে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় হুতোশ কান্না, 'ভগবান আমায় নেয় না কেন?' বাড়িতে আর বসৃতি মেয়ে নেই। সংসার অচল। তিন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে পাল্‌টাপাল্‌টি এসে বাপ-ভাইয়ের সংসার চালায়। কোলেকাঁখে ছ-সাতটি করে ষষ্ঠীঠাকরুণের ফোড়া। মেয়েরা আসে বাপ-ভাইকে দেখতে। জামাইরা আসে নিজের বউ, ছেলেমেয়েদের খবরাখবর নিতে। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি। ঘাড়ে পাউডার। হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। তিন দিন অন্তর এসে সাতদিন থেকে যায়। যাবার সময় হাতে থাকে থলে ভর্তি ঝুনো নারকেল, আম কাঁঠাল— নিদেন বাণ্ডিল বেঁধে সজনে কি ডেঙোর ডাটা। রোজই ভাপানো ধান শুকুচ্ছে উঠোনে। শিবু সাইকেলে ধানের বস্তা চাপিয়ে ধর্মপুরের কলে যায় ভাঙাতে। দেখেশুনে সহায়েরই চক্ষু স্থির। বলতে গেলে ভাদ্র মাস থেকে নতুন ধান না-ওঠা পর্যন্ত রাখোহরিই সহায়ের সংসারটা চালিয়ে নেয়। বস্তা কয়েক ধান ধার দেয়। নতুন ধান উঠলে— শোধ। প্রতিবছর ঘটতে ঘটতে প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। রাখোহরির এখন নিজের যা অবস্থা তাকেই না ধান ধার করতে বেরুতে হয়। ধান ওঠার আগে কটা মাসের কথা চিন্তা করতে গেলে মাথার মধ্যে ভীমরুল ওড়ার শব্দ হয়। রাত নিঘুর্ম। ভোররাতে শোনে সাঁওতাল পাড়ার লড়ুইয়ে মোরগ ডাকর দিচ্ছে, আকাশ ফর্সা হচ্ছে হে—এ—।

রাখোহরিই একদিন হাউমাউ করতে করতে এসে পড়ল সহায়ের কাছে, ও সয়া— আমি বুঝি মলাম। এই বয়েস মাগী নেত্য কত্তে গে পুকুর ঘাটে পড়ে মাজা ভাঙলো। অ্যাকোন মোর কোমরে পুলিসের দড়া। আজ ধানের গোলায় উঁকি দে দেখি— বারো আনাই শুন্যি। মোরে বাঁচা। পরিত্তেরানের বুদ্ধি দে।

দুজনে উবু হয়ে, মাথা ঠেকিয়ে বসে শলা-পরামর্শ।

পরের দিন থেকে পরনে কাচা জামা কাপড়, বগলে ছাতা, গম্ভীরমুখে বেরুতে লাগলো। দেড় মাসের মধ্যে সব পাকা। শিবুর বিয়ে।

মেয়ে বর্ধমান জেলার অবস্থাপন্ন ঘর। সব জমি ক্যানেলের সেচের

আওতায়। বছরে দুবার ধান ওঠে খামারে। চাষের আলু রাখে হিমঘরে, দর উঠলে বাজারে ছাড়ে। তিনজোড়া মোষ খেতে লাঙল টানে আগে-পিছে লাইন দিয়ে। উঠোনে বাঁধা ছোটো বড়োয় মিলিয়ে সাতটা হলস্টেন গরু। ছেলেরা মটরসাইকেলের পেছনে ইউরিয়ার বস্তা চাপিয়ে ফেলে আসে খেতের আলে। মটরসাইকেলের পেছনে ঝুড়ি ঝুলিয়ে ছানা যোগান দেয় কাছাকাছি শহরের মিষ্টির দোকানে। গোলাভরা গোটা খেসারি, শখ করে হয়ত বছরে দু-একবার ডাল ভেঙে রেঁধে খায় বাড়ির লোকে। নয়ত সাতটা হলস্টোন, ছটা মোষ আর বারোটা খাসি সারাদিনই কটর-মটর চিবোচ্ছে।

খাসি কটার দিকে চোখের ইশারা করে শিবুর হবু শ্বশুর বলল, তিনটেতে কুইন্টাল হাঁকবে। পুকুরে গোটা পঞ্চাশেক দশসেরি জিয়োনো আছে বাড়ির কাজকর্মের জন্যে। মোচ্ছবটা হযে যাবে— কী বলেন বে-মশাই?

শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে শিবু বলল, ঝাঁটা মারি চাকরির মুখে। চাষ-আবাদ করব। বৈজ্ঞানিক প্রথায়। একলপ্তে বারো বিঘে জমি আমার। বছরে তিনটে করে ফসল তুললে— ছত্রিশ বিঘের ফসল। আমারটাই খায় কে?

শিবুর চাষে মতি হয়েছে দেখে রাখোহরি খুব খুশি। একটাই ছেলে। মেয়েদের সময়মতো পার করে দিয়েছে। ভাবনা ছিল, শিবু চাকরি-চাকরি করে যেরকম হ্যাঁদাচ্ছে— কোনো রকমে একটা যোগাড় কার যদি শহরমুখো হয় শেষ বয়সে বুড়োবুড়িকে দেখবে কে? তার ওপর বাপ-মা যতদিন আছে। তারপর হয়ত বাপ-ঠাকুদ্দার জমি ক'বিঘে বেচে দালান দেবে শহরে। ছেলেকে জমির সঙ্গে আরো খানিকটা প্যাঁচ দিয়ে বাঁধার জন্যে শিবুর নামে দানপত্র করে দিল সম্পত্তি। মেয়েরা ভাগ চাইতে পারবে না। তাছাড়া, শিবুর নিজের জিনিশ হল। নষ্ট করতে হাত উঠবে না। খবর পেয়ে মেয়েরা বাপের বাড়ি আসা বন্ধ করলো। শিবুর শ্বশুর এল। দলিল পড়ে বলল, আর চিন্তা কিসের? জমির মাঝখানে শ্যালো টিউবওয়েল আমি বসিয়ে দিচ্ছি। খরচ-খরচা আমার। ব্যাঙ্কে জমি বন্ধক দিয়ে কিনে নাও পাঁচঘোড়ার ডিজেল পাম্পসেট। সেচ-সার-ওষুধ ছিটিয়ে লাগাও চাষ।

রাখোহরি এতটা ভাবেনি। তার সংসারে এসে শিবুর শ্বশুরের লাঠি-ঘোরানো ভালো লাগলো না।

জমিতে লাঙল দিচ্ছে সহায়। রাখোহরি নিজে নেহাত দরকার না পড়লে আর লাঙল ধরে না। বাঁধি কিষাণ দিয়ে লাঙল চষায়। জমির আলে ছাতা মাথায় বসে কাজ বুঝে নেয়। শিবু গেছে ধর্মপুরে। ব্যাঙ্কের লোনের

: তদারকিতে। জমির লাগোয়া সহায়ের জমি। রাখোহরি ডাকল, ও সয়া—, বিড়ি খাসে এট্টা।

গত কদিন ধরে সহায় সুযোগ খুঁজছিল, রাখোহরিকে একবার একলা পাওয়ার। দশটা টাকা দরকার। লাঙলটা ক্ষয়ে মুড়ো হয়ে গেছে। মাটি কাটতে চায় না। বেড়ার ধারের বাবলাগাছ কেটে ছুতোরবাড়ি দিয়ে এসেছে লাঙল বাঁধার জন্যে। টাকার জন্যে আনা হচ্ছে না। দশটা টাকা চাইবে। পাট উঠলে— শোধ।

বুইলি সয়া—, বিড়ি টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রাখোহরি উদাস ভাবে বলল, বড়ো ঠিকে ভুল হয়ে গ্যাচে, জমিগুলোন সাত-তাড়াতাড়ি নেকাপড়া না-করি দিলিই হোতো। অ্যাকোন শউর-শাউরিই সব। নিজের বাপ-মা কেউ নয়—।

সহায় দমে গেল। মনের যা অবস্থা রাখোহরির তাতে এখন আর টাকা ধার চাওয়া যায় না।

পেছনে গাড়ির শব্দ। সামনে রাস্তায় পড়া আলো জোরালো হচ্ছে ক্রমশ। ধলা বলদটা পেছনে কান ফিরিয়ে আছে। সহায় সতর্ক হল।

খুড়ো—, পেছন থেকে শিবুর অসহিষ্ণু গলা ভেসে এল। তাড়া দিল, নামো না। মাথানি ধরো।

যাবার সময় ছিল একরকম। ভোররাতে গাড়ি ছেড়েছিল। ধর্মপুর স্টেশন থেকে পাকারাস্তা হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে। গ্রাম কেয়াবন থেকে মাঠের মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ির লিঙ্ক ধরে সেই রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে ওঠা। মাঠের মধ্যে যখন তখন ভোররাতের প্রথম ট্রেন যাচ্ছে কোলকাতার দিকে। কুয়াশার মধ্যে ইলেকট্রিক তারে নীল আলোর ঝলক। গাড়ি প্রায় খালি। রাস্তায় বলদজোড়ার খোরাকি হিশাবে তরফা বাঁধা দশগণ্ডা খড়। জলখাবার জন্যে একটা বালতি। কেজি দেড়েক সরষের খোল। পাম্পসেট গাড়ির সঙ্গে বেঁধেছেঁদে আনার জন্যে দড়িদড়া। ডিজেল, মোবিল আনার খালি টিন। শিবু গাড়ির মাঝখানে খড়ের তরফা খুলে বসে। বগলে নতুন কেনা চেন-দেওয়া ব্যাগ। ব্যাগে পাম্পসেট ডেলিভারি নেওয়ার কাগজপত্র। ফাল্গুন মাস। শীত যাই যাই করেও রয়েছে এখনো। সকালের দিকটা রাস্তায গাড়ি-টাড়ি কম। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া।

বুঝলে খুড়ো আজ আর হবে না। পাম্পসেট ডেলিভারি নিয়ে বাড়ি আসতে

রাত্তির হয়ে যাবে। কাল ভোরেই শ্যালোতে পাম্প ফিট করে জল ছাড়বো। ড্রেন কেটে জল নিয়ে যাবো উত্তরের জমিতে।

গাড়ি চালাতে চালাতে শিবুকে উৎসাহ দেবার মতো করে সহায় বলেছিল, উত্তরের জমিতে— ? জমি ভিজিয়ে কী বোনবে ঠিক করেচো ?

জমিটায় পাট বুনবো এবার। ধরো এখন সেচ দিয়ে জমি ভিজোলে জো আসতে চার-পাঁচদিন ?

তা তো নাগবেই।

আচ্ছা খুড়ো, শিবু হঠাৎ অন্য স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, এতো আগাম করে পাট বুনলাম। তারপর ধরো আকাশে তাত হল। পাটে ফুল এসে যাবে না তো ?

শিবুকে খুশি করতে সহায় খুব হেসেছিল। পেছন ফিরে শিবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আকাশের তাত তো অ্যাকোন তোমার হাতের মুঠোর মধ্যি গো—। পাম্পে হ্যাণ্ডেল নেগিয়ে মোচোড় দিলিই জল। জমির আলে তাত ঘেষতি দিলি— তবে না গাছে ফুল ?

পাট কেটে আমন ধান। ধান কেটে গম। বছরে তিনটে ফসল।

চিন্তা-ভাবনা করে পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে সহায় বলেছিল, জলের য্যাকোন একটা পাকা বন্দোবস্তো করে ফেলেচো শেষতক—ত্যাকোন যা ইস্‌চে করবে তাই করতে পারবা।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। জল-জমি-আবাদ নিয়ে। সবকিছুর মাঝে শিবুর শ্যালো টিউবওয়েল, আর পাঁচ ঘোড়ার ডিজেল পাম্প সেট। শ্যালো অনেক আগেই বসানো হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন বার করে পাম্পসেট কিনতে দেরি হল। তা নইলে রবির আবাদটা মার খেত না।

হাইওয়ের দু পাশে মুকুন্দপুরের মাঠ। মুকুন্দপুর এম এল এ-র গ্রাম। এম এল এ-র জমিজমা সব এ মাঠে। খুব উন্নতি হয়েছে অঞ্চলটার। রাস্তার দু পাশে প্রায় পঞ্চাশটা শ্যালো টিউবওয়েলের গোল গোল পাকা ঘর। শালের খুঁটির ওপর দিয়ে ইলেকট্রিকের তার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে মাঠের ওপর দিয়ে। কটা শ্যালোর ঘরে সকালেও আলো জ্বলছে। এই ফাগুন মাসেও মাঠের চেহারা ঘোর বর্ষাকালের মতো। মাঠ থেকে চুঁইয়ে রাস্তার ধারের খাল-খুবলি জলে টলটল। হাঁসের পাল সাঁতার দিচ্ছে। পাড়ে বক বসে। বোরো ধানের গাছ কালচে-সবুজ মেঘের মতো জমাট হয়ে রয়েছে মাঠের গা লেপটে। বাঁ পাশের ডাঙা জমিতে গম, সরষে, ডাল, শস্য এখন পেকে ওঠার মুখে। হলুদ রঙ ধরছে।

শীতকালের সবজি করেছিল যারা, তাদের জমি এখন ফাঁকা। নতুন করে গ্রীষ্মকালের সবজি করার তোড়জোড় চলছে। শ্যালোর ঘর থেকে তোড়ে জল বেরিয়ে নালা দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষেতে। লাঙল চলছে ফালের দু পাশে মাটির ঢেউ তুলে।

দু জনেই চুপ করে গেছিল। কিরকম যেন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। নিজেদের গ্রামের মাঠটার কথা মনে পড়ছিল। আমন ধান কেটে নেবার পর সেই যে মাঠ উদোম হয়েছে, আবার বর্ষা না আসা পর্যন্ত আর পরনের আচ্ছাদন জুটবে না। মাঠের মাটি এখন ফেটেফুটে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। খড়কুটোর ঘূর্ণি তুলে হাওয়া খেলা করছে।

ওই শালা ফিল্ড অফিসার। ওর জন্যেই তো লোন স্যাংশান হতে দেরি হল। শিবু রেগে বলেছিল, ও দলিল দাও, ও জমিখানার পড়চা ঠিক নেই, হাল সনের দাখিলা দাও— শালা। আমাদের গ্রামে এম এল এ-র বাড়ি না-হলেও আবাদ করতে আমরাও জানি।

রাস্তার দু পাশ দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে একটা করকরানি টের পাচ্ছিল সহায়। শিবুর কথায় জলে উঠল, ওদের কাজইতো ওই। জমি বন্দোক রেখে আইনে সবদিক বেঁধেছেঁদে তবে না ট্যাকা ধার দিচ্চিস। ডানদিকের বলদটাকে রাস্তাস তুলে বলল, সম্মুন্দির পাত্দেব যেন নিজির টাকা। দিতি গেলি হাত শুলোয়।

তবে এও আমি বলে রাখছি খুড়ো— আমার ওই বাবো বিঘে জমিতে বছরে তিনটে ফসল আমি তুলবাই। ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে মোটরসাইকেল আমায় কিনতেই হবে।

শিবুর এই গোপন ইচ্ছেটা জানে সহায়। শালাদের গাঁ-গাঁ করে চারিদিক কাঁপিয়ে মোটরসাইকেল চড়াটা মনে গেঁথে গেছে। ভাইদের সঙ্গে মোটর-সাইকেলের পেছনে চেপে সিনেমা দেখতে যেত শিবুর বউ, এসব গল্প করেছে সহায়ের মেয়েদের কাছে। শিবু কি আর সে সব শোনেনি? শালাদের সঙ্গে টক্কর এখন। বউয়ের কাছে মান থাকে না। কিন্তু সহায়ের কাছে ব্যাপারটা অন্যরকম। আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিবু যখন এই জায়গায় আসে, সহায় সতর্ক হয়। নইলে এই ক'মাস শিবুর পেছনে পেছনে ঘোরা, নিজের কাজ ফেলে বেগার দেওয়া, তোয়াজ করা— সবই বৃথা। বেশ গম্ভীরভাবে বলল, নোয়ার পাইপ য্যাতোখোন মাটির তলায় পাতাল-গঙ্গার জলের মধ্যে সেঁদিয়ে দিতি পেরেচো, পাম্প য্যাতোখোন কেনা হয়েই গ্যাচে— ত্যাতোখোন সবই বলতে

গেলি তোমার হাতের মধ্যে। বছরকে তিনটে ফসল তুলতে আর আয়োজনের ত্রুটি কি! মোটরসাইকেল মনে করো— একরকম কেনা সারা।

তবে খুড়ো, শিবু বলেছিল, দক্ষিণের ওই পাঁচ বিঘের বন্দোখানার বছরে দুটো ফসলই করা যাবে। আষাঢ় থেকে অগ্রাণ— আমন ধান। জমি খালি হলে— বোরো।

ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। একেবারে বুকের ওপর গাড়ির চাকা। চিৎ হয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছে সহায়। চেষ্টা করে নিজেকে সামলালো। গলায় তোয়াজ ঢেলে বলল, তোমার ভাবনা-চিন্তার মধ্যি তো ফাঁক দেখিনা শিবু। হবে না? গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মতোন তো তুমি নও। এক ঘায়ে পাস করে কেমন বেইরে গেলে।

শিবু চুপ করে আছে।

সহায় দোমনা। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে আজ প্রায় প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছে, শিবুর মুখ থেকে পাকা কথা বার করে নেবে। অনেক তোয়াজ, কথার মার-প্যাঁচ খেলেও একটা সঠিক জবাব বার করে নিতে পারে নি শিবুর মুখ থেকে আজ পর্যন্ত। চালাক ছেলে। দিব্যি জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। 'হচ্ছে, হবে। দেখি কি হয়। পাম্পসেট আগে হাতে পাই—।' এসব বলে পিছলে যায়। শিবুকে দোষ দেওয়া যায় না। শিবু শ্যালো টিউবওয়েল বসাবে, পাঁচঘোড়ার পাম্প কিনবে— কথাটা শোনা পর্যন্ত সহায় নিজে থেকে এঁটুলির মতো লেগে রয়েছে। শিবু ব্যাঙ্কে লোনের তদারকিতে গেলে, সহায় বাইরে ব্যাঙ্কের রকে বসে বিড়ি ফুকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শিবু শহরে শ্যালোর পাইপ কিনতে যাবে— সহায় ভোরে শিবুর বাড়ি হাজির। ঠিকাদার শ্যালোর পাইপ বসাবে। মাচার খাঁচা করতে শক্ত বাঁশ দরকার। সহায় নিজের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে কাঁধে করে পৌঁছে দিয়েছে।

বোরোধানের জন্যিই যেন জমি ক-বিঘে, সহায় খুব সাবধানে এগুলো, পাম্প চেলিয়ে একবার ক্ষেত জলে ভরে দিতি পারলে সাতদিন আর জমির আলে যাতি হবে না। শুধু সময় মতো সার দাও, নিড়েন-কড়োন করো, ওষুধ ছেটাও। বিঘেতে পঁচিশ মণ চোখ বুজিয়ে, সহায় পেছন ফিরে শিবুর মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করলো। শিবু কি-জানি সহায়ের আসল কথার আঁচ পেয়েছে কিনা! রাস্তার পাশে ক্ষেতের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে। সহায় আর থাকতে পারলো না। ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিল, আর তোমার হলি আমারও হবে তিন বিঘে। —কি বলো শিবু?

সহায় শিবুর জবাবের জন্যে কান খাড়া রেখেছে। কানে এলো, রাস্তার ধারে বাবলাগাছের পাতায় হাওয়া কেটে বেরিয়ে যাবার সাঁ-সাঁ শব্দ। সহায় দমে গেল। ভাবলো, উঃ কি ছেলে! সময় মতো কেমন কালা-বোবা হয়ে যায়। এমন তো ছিল না শিবু! —বড়দের মান্যগণ্য করতো। খুড়ো বলে ডেকে সহবৎ করে কথাবার্তা বলতো। দিন দিন যেন বদলে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব ভেবে রাগ-গোঁসা করে এখন আর পিছিয়ে আসা যায় না। দায় যখন তার। ঝেড়েঝুড়ে ফের শুরু করলো সহায়, ধরতে গেলি খুড়োর জমি তোমারই জমি। মাঝখানে শুধু আলের নিশানা। এক-কোদাল মাটি কেটে জল যাবার রাস্তা করে দেওয়া শুধু। সামনে লরি আসছে দেখে রাস্তার ওপর থেকে গাড়ি নামালো। পরপর চারটে লরি-বাস পাস হল, অবিশ্যি, পাম্প চেলিয়ে জলের যা দাম ধরবে তুমি তা নিখুঁত হিসেবে মিটে দেবো আমি। তবে, আমার এট্টা আবদার তোমায় রেখতেই হবে শিবু—। জলের দাম তোমায় ফসল উঠলি নিতে হবে। এটুক খুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে সহ্যি করে নিতে হবে তোমায—।

শিবু চুপ করে আছে। সহায়ের যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো। মনে হল, যা হোক একটা জবাব দিক শিবু। চুপ করে থাকা আর সহ্য হয় না। সহায়ের মনের এই অবস্থা আর ছেলে দেখ ঘাড় ঘুরিয়ে কেমন একটা পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া মোটরসাইকেল দেখছে।

সহায় গলার স্বর গাঢ় করলো, দুটো সোমত্থ মেয়ে গলায় এট্‌কে। জানি না, ভগবানের কি ইস্‌ছে— সহায় শিবুকে শুনিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, বড়ো ছেলেটা, নিজের রোজগণ্ডা, কামাই নে একেই ভিটেয়ে থেকে পেথকান্ন। সময়-সময় আমাকেই চেলিয়ে নিতে হয়। পরের ছেলেটা— হারান। ভারি বন্ধু ছেলো তোমার! বড়ো ন্যাওটা ছেলো আমার। মুরগির ছা'র মতো পেছপেছ— অষ্টোক্ষণ। বোশেখ মাস। দিনের পর দিন আকাশের দিকে তেকিয়ে জম্মিতে লাঙল দিচ্ছি। সকাল থেকে মেঘ। দুপুর না-হতি অন্ধকার। মনে মনে ভাবছি, দেবতার বুঝি মন নরম হল এতোদিনে। মনে মনে আকাশকে বলচি, আর একটুখানি সবুর কর বাপ্‌। দুটো আঁচোড় লাঙল ঘুরিয়ে চাষটা শেষ করতে দে। আজ বৃষ্টির জলে ছ্যান সেরে ভাতের সামনে বসবো। দক্ষিণের ফালিতে ত্যাকোন হারান ঝুড়ি ভরে ধানের শুকনো নাড়া তোলচে। ধান ভাবানোর জ্বালানী হবে। কি যে হলো, বুইলাম না। —ছিট্‌কে পড়লাম চষা মাটির মধ্যি মুখ থুবড়ে। বলদজোড়া লাঙল কাঁধে জ্ঞানশুন্যি হয়ে দৌড় ধরেচে। গোঁ-গোঁ করতি করতি ঘাড় তুলে দেখি হারান মাঠের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে। ধানের

নাড়া ভরা ঝুড়ি দাউদাউ জ্বলচে। —বাজ পড়েচে বেম্মতালুতে। সারা শরীরে তাপ বেরোচ্ছে। সোজা করি শোয়াতে দেখি ত্যাকানো ঠোঁট নড়চে। —জল চাইচে। বোশেখ মাস মাঠের মধ্যি জল্ কোথা পাবো? দৌড়ে আন্‌তি-আন্‌তি—শেষ। —হারান আমার হেইরেই গেলো, সহায় থামলো। বড়ো করে নিঃশ্বাস ফেললো, যাতে শিবু শুনতে পায়। কাঁধের গামছায় চোখ মুছলো এমন করে, যাতে শিবুর চোখে পড়ে, তুমি তো সবই জানো— লতুন করে আর কি শোন্‌বে?

পাম্প কিনতে অনেক টাকা ধার হয়ে গেল খুড়ো। বছরে দু-বার কিস্তির টাকা। —সুদ!

শিবু বে-লাইন ধরছে। সহায মনে মনে বললো, অতোই যদি ভাবনা—মোটরসাইকেল কেনার চিন্তা মাথায় আসে কোথা থেকে? যেই খুড়ো একটা কথা বলেছে, ওমনি জ্ঞাননাড়ি টঙ্কো দিয়ে উঠলো। কিন্তু কথা যখন লাইন ধরেছে—ঘুবতে দিলে চলবে না। সহায গলায় জোর আনলো, ধার নেই কার বলো দিনি শিবু? অমোন যে গরমেন্ট— সেও শুনি ধারে চলচে।

সহায থেমে বাঁদিকের গরুটার ল্যাজে মোচোড় দিল, কতা হচ্ছে, ট্যাকাটা নিযে তুমি কি করচো? ট্যাকা খেটিয়ে এট্টার জায়গায় তিনটে ফসল তুলচো একই জমি থেকে। —ধার শোধ হতি কতোক্ষণ?

সামনে চৌমাথা। বাঁয়ে মোড় নিয়ে আবো মাইল তিনেক গেলে রথতলার কাছে ডিলাবের দোকান। মোড়ের মাথায পেট্রল পাম্প! এবার একেবারে গোটা শরীর ঘুরিযে পেছন ফিরে শিবুর মুখের দিকে তাকাল সহায়, তুমি সাগরে লৌকো ভাস্যেচো। —আমি তো ডুবেই গেচি। তোমার লৌকোর দড়ি ধরে যদি ভেসে ভেসে ডাঙায উঠতে পারি।

খুড়ো, ডিজেল-মোবিল কি এখনই নিয়ে নেব, না ফেরার পথে নেব?

সহায় হতাশ। ভাবলো, কি ধড়িবাজ ছেলে? ঠিক সময় মতো কথার লাইন ঘুরিয়ে দিল। তারপর ভাবল, এখন থাক। বিগড়ে যেতে দিলে চলবে না। ফেরার সময় আবার তুলবে কথাটা। যতক্ষণ না একটা পাকা কথা মুখ থেকে বার করে নিতে পাচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

পাম্পসেট ডেলিভারি নিয়ে ফেরার পথে সে কথা বলার মতো আর সুযোগই আসবে না তখন কি আর ভাবতে পেরেছিল সহায়! —ফেরার পথে গাড়ির সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা শিবুর সবুজ রঙের নতুন পাঁচঘোড়ার পাম্পসেট। পঁচিশ

ফুট সাকশন পাইপ পাক দিয়ে বাঁধা। ডেলিভারি পাইপ গুটিয়ে রাখা একপাশে। পাঁচটা পলিথিনের ড্রামে একশো লিটার ডিজেল। দশ লিটার মোবিল। ভার এমন কিছু নয়। মুশকিল শিবুকে নিয়ে। গাড়ি একটু কাত হয়, কি সামনে ঝোঁকে— হাঁ—হাঁ করে বুক দিয়ে পাম্প আঁকড়ে ধরে, খুড়ো নামো নামো। মাথানী ধরো। টাল ধরো—।

পরনের টেরিলিনের জামা খুলে ফেলেছে। সঙ্গে গামছা থাকলে বোধহয় প্যাণ্টটাও খুলে ফেলত। পাম্পসেট আঁকড়ে ধরে। আবার গাড়ি সিধে হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্যাণ্টে তেলকালি লাগলো কিনা। মুখে গজর গজর, তোমার বলদজোড়া এমন জানলে নিতাইয়ের গাড়ি নিয়ে আসতাম। আমায় কত খোসামোদ করলো। শ্যালোর জন্যে পাইপ, ফিল্টার নিয়ে গেলাম— কোনো অসুবিধে নেই।

সহায় এদিকে গাড়ি সামলাচ্ছে। পেছন থেকে শিবুর টিকির-টিকির শুনতে শুনতে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল, আনলেই পারতে নিতাইকে। সে তো আর খুড়োর মতো মাগনায় গাড়ি দিত না। পাংপ আনার সময় নগদ তিরিশ টাকা গুনে গুনে নিয়েছিল। —সারাদিনে দু-ভাঁড় চা আর আটখানা কচুড়ি ছাড়া তো কিছুই ঠেকালে না। 'খুড়ো তুমি একটু বসো। আমি একটা কাজ সেরে আসি', বলে নিজে হোটেলে ভাত খেয়ে এলে। মুখে ভাতের গন্ধ কি আমি টের পাইনি! মাগনায় গাড়ি দিচ্ছে লোকটা— তখন তো একবার মনেও পড়েনি?

চোট্ পড়ল বলদ দুটোর ওপর, সমুন্ধির পুত, এ-শালার হয়েছে তেমনি!— খালি বাঁয়ে মারে, খালি বাঁয়ে মারে।

পাঁচনের বাড়ি পড়ল ধলা বলদটার পিটে। কম বয়সের বলদ— দৌড়লো। ডানদিকের বলদটা শান্ত, বয়েস বেশি। তাল রাখতে না-পেরে ডাইনে ঘুরে একটা বাবলা গাছের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয় আর কি! সেই সময় আবার পেছনে একটা বাস ছুটে আসছে।

খুড়ো…ও…ও, শিবু বুক দিয়ে পাম্প আঁকড়ে প্রায় ডুকরে উঠল, পাম্পখানা গোটা বোধহয় আর বাড়ি গিয়ে পৌঁছোলো না।

তুমি এট্টু থির হয়ে বোসো দিনি। পোঙার কাছ থেকে অমোন টিকির-টিকির করলে কি গাড়ি হাঁকানো যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথানী ঠেলে গাড়ি সামাল দিতে দিতে বলল সহায়। কালো বলদটার খুরের তলায় পড়ে পায়ের কড়ে আঙুলটা মনে হল খসে গেল পা থেকে।

তারপর যে তিন মাইল রাস্তা খারাপ, কোনো ঝুঁকি না নিয়ে সহায় গাড়ি ধরে পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। কেবলই মনে হচ্ছিল, শিবুকে ওই-ভাবে কথাকটা বলা বোধহয় ঠিক হলো না। —রেগে যায়নি তো? অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে।

কাঁচারাস্তায় পড়ার মোড়ে ক'টা দোকান। চায়ের দোকানও রয়েছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল সহায়, শিবু, এট্টু চা খেলি হোতো না—?

খাও—।

গলার স্বর ভালো লাগল না সহায়ের। —বাতাসে যেন কেমন এড়ো ভাব।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পকেটে একটা টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। গাড়ি থেকে নামতে সময় নিল। শিবু কি চায়ের দামটা দেবে? প্রায় বাড়ির দোড়-গোড়ায় এসে গোটা টাকাটা ভাঙাতে মন উঠছিল না। শিবু বসেই আছে। সহায় শেষপর্যন্ত নিজেই গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আলোর কোটাল যাচ্ছে। তিনদিন পরেই পূর্ণিমা।

চায়ের দোকানে কয়েকজন বসে। সহায় যখন চা তৈরির জন্যে অপেক্ষা করছে জিজ্ঞেস করলো, পাম্পসেট কেনা হলো কিনা? কত দাম পড়ল? যাবে কোন্ গ্রামে? সহায় জবাব দিতে দিতে দোকানিকে বলল, দুটো নিমকি বিস্কুট দ্যাও খাস্তা দেখে। পেছন ফিরে দেখলো, তেঁতুল গাছের ছায়ার অন্ধকারে শিবু গাড়ির ওপর পাম্পসেট্ আগলে বসে। কালোরঙের বলদটা চোনাচ্ছে।

নিঃশব্দে হাত থেকে চায়ের গ্লাস নিল শিবু। পায়ের কড়ে আঙুলটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছে। রাস্তার উপর উবু হয়ে বসে চায়ের গেলাসের সেঁক দিতে লাগল সহায়। শিবুর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সহায় বলল, ধম্মোপুর ঘুরে যাবা, না মাঠামাঠি? —যে রাস্তা দিয়ে এয়েলাম?

যা ভালো বোঝো—।

বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। কি উদাসীন গলা! শিবু কি সত্যিই রেগে গেছে? উঃ, কি করতে বলতে গেল? এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? এখন উপায়—? সহায় ঠিক করল, কথাবার্তা চালিয়ে মনের এই এড়ো ভাবটা কাটিয়ে মাঠটুকু পেরিয়ে বাড়ি ঢোকার আগেই কথাটা কাঁড়িয়ে নিতে হবে। —কাল সকালে শিবু খ্যালোয় পাম্প ফিট করে পাম্প চালিয়ে জল ছাড়বে। নালা দিয়ে তরতর করে জল গিয়ে মাটি ভেজাবে। সহায়ের তিন বিঘে জমি আলজিভ পর্যন্ত তেষ্টা নিয়ে কি দেখবে তাকিয়ে?

হাল্‌কা বাতাস বইছে। সারাদিন স্নান নেই। গা সিরসির করে। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে আকাশ থেকে। কুয়াশার মধ্যে জরির চুমকির মতো জোনাকি জ্বলছে। দু-পাশে নেড়া মাঠ, দূরে গ্রাম কেয়াবনের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপসা, চেনা রাস্তায় পড়ে বলদজোড়া ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছে লিক ধরে। গলা পর্যন্ত অশান্তি নিয়ে গাড়ির সামনে বসে সহায়। —সময় যাচ্ছে। রাস্তা কমে আসছে ক্রমশ। মনে মনে বলছে, শিবু বাপ আমার, বুড়ো মানুষের কথায় রাগ করে না বাপ। তোমার জন্মো হতে দেখেছি। কত কোলেপিটে চোড়েচো। আমার হারাণ বেঁচে থাকলে সেই আজ গাড়ি হাঁকাতো। দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে পাম্প ডেলিভারি আনতে। তোমার বউয়ের ছেলেপুলে হবার সময় তোমার খুড়ি ধাইমা হয়ে নির্বিঘ্নে প্রসব করাবে। রাগ করে থাকে না বাপ। আমার দিকে একবার তাকা। একবার মুখ ফুটে বল, খুড়ো ভেবো না। আমার বারো বিঘে জমি যদি জল পায়,— তোমার তিন বিঘে কি আর শুকিয়ে থাকবে? —অন্তরটা শান্ত হোক!

সহায় পেছন ফিরে তাকাল। যেন দড়িদড়া বাঁধা পাম্পসেটটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল একবার। আসলে, শিবুর মুখের ভাব পড়বার চেষ্টা করলো। শিবু গম্ভীর মুখে বসে। রাস্তায় আর ঝামেলা নেই দেখে জামা গায়ে দিয়ে নিয়েছে।

আস্‌ছা শিবু—, সহায় কথা চালনোর মতো করে বলল, এট্টা কতা তোমায় কদিন ধরেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছি—।

—বলো—।

ওই ঘোড়ার ব্যাপারটা।

ঘোড়ার ব্যাপার, শিবু বেশ কৌতূহলী।

শ্যালো বসানো ইস্তক তোমার পেছপেছ ঘুরে কতো কিচুই তো শেখলাম। কেমন করে নোয়ার পাইপ পাক মেরে মেরে মাটির মধ্যি সেঁদিয়ে পাতালগঙ্গার জলের নাগাল ধরতি হয়। কেমন করে পাম্প মেসিনি হ্যাণ্ডেল নেগিয়ে এসটাট করতি হয়— কত কিছু। কিন্তু এট্টা কতা তোমরা বলাবলি করো— কিছুতেই ধরতে পারি না।

কোন কথাটা?

একটু ইতস্তত করল সহায়, ধরো ওই ঘোড়ার কতাটা? তোমরা বলাবলি করো পাঁচঘোড়ার পাম্প, সহায় থামল, পাম্প তো দেখি সবই নোয়ার— নোয়ার চাকা, নোয়ার বাক্সো, নোয়ার হ্যাণ্ডেল— এর মধ্যি ঘোড়া আসে

কোত্থে ?

শব্দ করে হাসল শিবু। সহায় যেন বুকে বল পেল। এর পরেই কথাটা পাড়বে। লজ্জা পাবার মতো করে বলল, ধরতে পারি না তাই জিজ্ঞেস করা—।

পাঁচঘোড়া কথাটা আসলে একটা মাপ।

কথাটা ধরতে পারছে না সহায়। মুখে শব্দ করে দড়ি টেনে ধরে আস্তে করে একটা আল টপকালো।

আমরা কথায় বলি না— শিবু বোঝাবাব মতো করে বলল, মানুষটার শরীরে যেন দশটা হাতির বল। —এও তেমনি। পাঁচটা ঘোড়ার শক্তি এক করে যত শক্তি হয়, পাম্পটাব সঙ্গে যে ইঞ্জিন ফিট্ করা রয়েছে, তার শক্তিও ততটা।

সহায় সব ভুলে পেছন ফিরে তাকাল। গাড়ির মাঝখানে শিবুর নতুন কেনা পাঁচঘোড়ার পাম্পসেট। পাম্পসেটের ওপর দুটো জোনাকি বসে চকমকি ঠুকে আলো জ্বালছে। তার আড়ালে শিবু। শিবুকে পুরো দেখা যাচ্ছে না।

অবিশ্বাস ভরা লায সহায় বলল, এ্যাতো ক্ষ্যামতা ওইটুকুর মধ্যি—?

গ্রামকেয়াবনেব গাছপালা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। সহায় ভাবল, আর দেরি নয়। বলে ফেলাই ভালো। শিবুর জমির গা-ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে। পেছন ফিরে বলতে গিয়ে দেখল, শিবু জমির মধ্যে শ্যালো টিউবওয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে।

শিবু ভাবছিল, শেষপর্যন্ত পাম্পসেট কেনা হল। কাল সকালেই শ্যালোয় পাম্প ফিট করে চালিয়ে জল ছাড়বে। নালা দিয়ে জল নিয়ে যাবে উত্তরের জমিতে। জমি ভিজিয়ে পাট বুনবে। পাট কেটে ধান। ধান উঠলে গম। —বছরে তিনটে ফসল।—খুড়ো কি শেষপর্যন্ত জমি ক'বিঘে রাখতে পারবে? মেয়েদের বিয়ে দিতে বিক্রি করা ছাড়া তো উপায় দেখতে পাচ্ছে না। ততদিনে কি আর পাঁচঘোড়ার পাম্প চালিয়ে বারো বিঘে জমিতে ফসল ফলিয়ে জমি ক'বিঘে কিনে নেওয়ার টাকা জমিয়ে ফেলতে পারবে না সে। এখন কথা হচ্ছে, আগে মোটর-সাইকেল না জমি?

সহায় হতাশ। আজ আর হল না। হাত পাঁচেক দূরে তার জমি। ফেটেফুটে হাঁ হয়ে রয়েছে। জমির ঠিক মাঝখানে একরাশ জোনাকি একজোট হয়ে পাক খাচ্ছে। পিটপিট জ্বলছে। সহায় হঠাৎ দেখল, জোনাকির মধ্যে হারান দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নায় জোনাকি দিয়ে মূর্তি গড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট নড়ছে। সহায়কে দেখে যেন বলছে, তেষ্টা, বড় তেষ্টা।

শিবু—উ—উ, হা—হা করা স্বরে ডুকরে উঠলো সহায়।

টর্চের ফোকাস এসে পড়লো হারানের গায়ে। জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেল হারান।

খুড়ো—, শিবু বলল, বাড়ির লোকজন দেরি দেখে বোধহয় খুঁজতে বেরিয়েছে আমাদের।

সহায় বোকার মতো সামনে তাকালো। টর্চের আলো পড়ছে মাঠের মধ্যে।

দেশলাই জ্বেলে এক আঁটি খড় ধরিয়ে শিবু মাথার ওপর মশালের মতো নাড়িয়ে জানান দিল, তারা এসে গেছে।

পাঁচঘোড়ার পাম্পসেট ঢুকছে গ্রামকেয়াবনে।

শিবুর বউ শাঁখ বাজিয়ে, তেল-সিঁদুরের ফোটা দিয়ে ঘরে তুলবে

খরা

মাথার ওপর খরার আকাশ। সূর্য চলতে শুরু করেছে। তেরচা হতে শুরু করেছে। কিন্তু মাঠের দিকে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে। চোখের পাতা নেমে এসে দৃষ্টি সরু করে আপনা থেকে। পায়ের তলায় মাঠের পায়ের-পাতা-ডোবা ধুলো গুমরেজ্বলা তুষের ছাই। হাওয়া নেই। গুমোট। গত আশ্বিনে শেষ বৃষ্টি হয়েছে। —খরা চলছে।

মাঠ পার হতে সুবালা মনে মনে হিসাব জুড়ছে আর ভাঙছে। পাঁচটা পয়সার হদিশ নেই। পঁচিশগ্রাম তেল, পঁয়ত্রিশ পয়সা। আলু চল্লিশ পয়সার। দশ পয়সার সরষে। কাপড়কাচা সোডা, পান··· মোট এক টাকা কুড়ি পয়সা। পাঁচ পয়সা সাইজের আঁটি বেঁধে কচি নিমপাতায় ঝুড়ি সাজিয়ে আজ নিয়ে গেছিল কারখানার বাজারে। বেচেটেচে যা হয়েছে, তার থেকে বাজার খরচ বাদ দিয়ে আঁচলে রয়েছে যা তাতে পাঁচটা পয়সার হিসাব গরমিল!

গামছা মাথার ওপর পাকিয়ে বিড়ে করে বসানো। তার ওপর কোনাচে করে ঝুড়ি। ঝুড়িতে সংসারের সওদা।

গোটা মাঠে একটা মানুষ নজরে পড়ে না। ভ্রূ কুঁচকে চোখ সরু করে পথ হাঁটছে সুবালা। পাঁচটা পয়সার হিসেব কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ছে না।

সদররাস্তা অনেক ঘুরপথ। স্টেশন থেকে গ্রামে আসার রাস্তা মাঠের ওপর দিয়ে এখন। সদররাস্তা দিয়ে সাইকেল চলে। গোরুর গাড়ি যায়। লরি কখনো-কখনো। সু-বৎসর হলে আষাঢ় পড়েতেই বৃষ্টির জল মাঠের আল ডুবিয়ে স্রোত তুলে নেমে যায় বিলে। বিল উপছে ইছামতী। ধান কাটা সারা হলে পা-চলা পথ পড়তে শুরু করে একেবেঁকে। বর্ষায় মাঠডুবি না-হওয়া পর্যন্ত ওই রাস্তা ধরেই চলাচল।

দূরে খানিক সবুজের ছোপ। খরায় পোড়া মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দৃষ্টি টেনে নেয়। পাম্প চলার ফটর-ফটর শব্দ কানে আসে। —সূর্যদের খেত। জমির মাঝখানে শ্যালো বসিয়েছে। শ্যালোর পাম্প জুড়ে মাটির তলার জল তুলে আবাদ। খেতের মাঝখানে শ্যালোর ঘর। গমের খড় দিয়ে ছাউনি। পাট-

কাটির বেড়ার চার দেয়াল। দু'ধারের বেড়ায় দুটো গর্ত। একটা দিয়ে বেরোয় মেসিন চলার পোড়া ধোঁয়া। আর-একটা দিয়ে তোড়ে জল বেরিয়ে নালা দিয়ে মাঠে ছড়িয়ে ক্ষেতের তেষ্টা মিটোয়। কাজ বুঝে বাড়ি থেকে গোরুর গাড়িতে পাম্প চাপিয়ে মাঠে এনে সূর্য শ্যালোয় জুড়ে দেয়। পাম্প চালায়। খেতে কাজকর্ম করে আর পাঁচজনের সঙ্গে। শ্যালোর ঘরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পাম্প পাহারা দেয় রাত্রে। দাওয়ায় বসে কুপির আলোয় শাড়ি কি কাঁথায় সূচের ফোড তুলতে তুলতে ঘাড় তুলে সুবালা দেখে, টর্চের আলো অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে শ্যালোর ঘরের দিকে। বোঝে, বাড়িতে খাওয়া সেরে সূর্য পাম্প পাহারা দিতে আসছে। কান দুটো হঠাৎ ভারি সজাগ হয়ে ওঠে। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ট্রানজিস্টারের গান, কথা ভেসে আসে। কখনো সূর্য নিজেই গলা ছেড়ে গান ধরে, 'ও-তোর খেতের আলে ইঁদুর নেগে—চে-এ/ও-তুই ইদুর ধরার কল নে-আয়/ ধরতে ইদুর ফাঁদ নে-আয়/গুরুর ঠেঙে চে-এ-এ—।' শ্যালো থেকে জল তুলে ধান, পাট বুনেছে। পাটের চারা এখন গোড়ায় জল পেয়ে লকলকিয়ে বেড়ে বাতাসে মাথা তুলেছে। বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি খেলা করে। বিদে চালিয়ে মাটি আঁচড়াবার কাজ শেষ। ঘাস খড় বেছে খেত পরিষ্কার করতে নিড়েন পড়ছে কাল থেকে।

পাঁচটা পয়সার হিসাব হঠাৎই মিলে গেল।

পথ চলতে—চলতে সুবালার মনে পড়ল, পাঁচ পয়সার রসুন কেনা হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ছোট মেয়েকে বলে বেরিয়েছিলো, সূর্যদের পাটখেত নিড়ানো হচ্ছে। পাটশাক নিয়ে আসতে। বাজার থেকে রসুন আনবে। জিবে-রসুন ফোড়ন দিয়ে পাটশাক ভাজা হবে আজ।

বাড়ি ফিরে রান্নার ব্যবস্থা। গ্রামের সরকাররা বৃষ্টির আশায় বসে থেকে থেকে এখন পাম্প ভাড়া করে এনে পুকুরের জল তুলে জমি ভেজাচ্ছে। খেতে জো-এলে বোনাবুনি করবে। উপরো-উপরি কদিন জালটেনে যা জাতমাছ ছিল ধরে নিয়েছে। এখন রয়েছে পাঁকে লুকানো আ-মাছা। পাঁকহাঁটকে ধরা এসব। বড়ো মেয়েকে বলা আছে, সরকারদের পুকুরে মাছ ধরতে যেতে।

ভিটের সদর— সদররাস্তার দিকে। উঠোনের পর বেড়ার নিচে নয়ানজুলি। তারপর রাস্তা। দু খানা খেজুর গাছ ফেলা পাশাপাশি। রাস্তায় ওঠার সাঁকো। বর্ষায় নয়ানজুলিতে স্রোত নামে। মাটির শক্ত বাঁধ দিয়ে স্রোত সরু করে চিক্ পাতলে মাঠভাসা মাছ ধরা পড়ে। খাওয়া, বিক্রি, শুঁটকি করে রাখা যায়। এখন নয়ানজুলি শুকিয়ে, ফেটে আলজিভ পর্যন্ত বার করে রোদে শুয়ে হাঁপায়

সারাদিন। মাঠের দিকে বেড়া হাতখানেক ফাঁকা। খিড়কি দরজা মতোন।

মাঠচরা একটা গরু বেড়ার ধারে কলাগাছের ছায়ায় শরীর গুটিয়ে দাঁড়িয়ে চোখবন্ধ করে জাবর কাটছে। খোঁড়া মুরগিটা উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এসে মাঠ ঠোকরাচ্ছে— দেখতে পেল সুবালা। হাততালি বাজিয়ে তাড়া দিল, হুস্, হু-উ-স।

মুবগীটা খোঁড়াপায়ের জোর ডানায় দিয়ে ডানা ঝাপটে কক্ ·· কক্ করতে করতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঠোনে গিয়ে ঢুকলো।

মাথার ওপর আস্ত একটা আগুনের গোলা, পোড়া তুষের আগুনে দু খানা ঝলসানো পা নিয়ে সুবালা যখন বাড়ি ঢোকে, তখন যেন বেশ খানিকক্ষণ জ্ঞান-হারা হয়ে থাকে। একটু-কিছু উল্টোপাল্টা নজরে এলে কি-যে করে বসবে নিজেই জানে না। দুই মেয়ে মাযের স্বভাব জানে। হাতের নাগালের বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করে।

দাওয়ায় ঝুড়ি নামিয়ে নিজে বসলো সুবালা। কাপড় সরিয়ে পটপট করে জামার বোতাম খুলে দাওয়ায় গড়িয়ে দিল নিজেকে।

ছোটো মেযে আমড়া গাছের ছায়ায় খেলনাপাতি নিয়ে নিজের সংসার সাজিযে খেলছিলো। উঠে অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিতে জল গড়িয়ে পা-টিপেটিপে এসে দাওয়ায় নামিয়ে পলকে নাগালের বাইরে সরে গেল। শুয়ে শুয়েই সুবালা দেখল ছোটো মেয়েকে বলার মতো কিছু নেই। উঠোন ঝাড় দিয়েছে। উনুনের ছাই তুলে রান্নার জায়গা পরিষ্কার লেপে রেখেছে। পাটশাক বেছে ধুয়ে ঝুড়ি ভরে রেখেছে রান্নার জায়গায়। উঠে বসে পুরো এক ঘটি জল গলায় ঢেলে দিল সুবালা।

বড়ো মেয়ে লাউমাচার ছায়ায় উবু হয়ে বসে একটা ভাঙা শিলের ওপর গুগলি রেখে রেলের খোয়া দিয়ে ঠুকে খোল ভাঙছে। পাশে কলাইয়ের বাটি। মাংসের গা-থেকে খোলার টুকরো বেছে রাখছে বাটিতে। পরনে ইজেরের ওপর সুবালার একটা ব্লাউজ উল্টোদিক করে পরা। ব্লাউজে বোতাম নেই। একদিকের জামা কাঁধ থেকে খসে কনুইয়ের কাছে জড়ো হয়েছে। চারপাশ ঘিরে পাঁচটা মুরগি। খোঁড়া মুরগিটা উঠোনে ঢুকে দলে ভিড়েছে। একটু-আধটু গুগলির মাংস ছিটকে গেলে পাঁচটায় ঝটাপটি করে একটা ঠোঁটে তুলে নিচ্ছে। খয়েরি রঙের মুরগিটা দিন দশেক হল আটটা ছানা নিয়ে তাওয়া ছেড়ে বেরিয়েছে। বাচ্চাগুলো হুটোপাটির মধ্যে কখনো মার পেটের মধ্যে ঢুকছে, কখনো চড়ে বসছে পিঠে। একটা সাদা রঙের বাচ্চা বড়ো মেয়ের ইজের-ফেঁসে বেরোনো একটা সুতো ঠোঁটে

নিয়ে খেলায় মেতেছে। মোরগটা কাছেপিঠে নেই। সুবালা দেখল, তিনি আম গাছের ডালে উঠে বসেছেন। পাতার ছায়ায় পেটের মধ্যে পা-ডুবিয়ে বসে একতলার কাণ্ডকারখানা দেখছেন আমুদে দৃষ্টি দিয়ে।

সুবালার ভ্রূ কুঁচকে উঠল, মাচ ধরতে যাসনি ?

গিয়েলাম তো, বড়ো মেয়ের গলার স্বরে শঙ্কা। দৃষ্টিতে ভয়।

গিয়েলি তো মাচ কোতায় ?

বড়ো মেয়ে বড়ো বড়ো চোখে দেখছে মাকে। সমস্ত শরীর টানটান। মাকে উঠতে দেখলেই দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে উঠবে, পুকুরে নামতে দেলেনাতো মাচ্ ধরবো কোত্থে ?

মেয়েকে অবিশ্বাস করতে পারল না সুবালা। সরকারদের জানে। তবু গলার স্বরে সন্দেহ ছুঁইয়ে বলল, সব্বাই পুকুরে নামলো— তোকেই শুদু খেদিয়ে দেলে ?

কাকে নামতে দেলে, বড়ো মেয়ে গলায় জোর পেল, জিগিয়ে দেকোনা। দুলে পাড়ার, কোবোত্তো পাড়ার সব্বাই তো গেয়েলো ! বুড়ো সরকার বললে, পাম্প ভাড়া করে পুকুর ছেচা হয়েচে তাকি তোদের মাচ খায়ানোর জন্যি ?— বাউনপুকুরের গুগলি তুলে খাগা !

মেয়ের কথা শুনে খুব চাপা ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সুবালার। আজ দুটো চুনোচানা খাবার স্বাদ জেগেছিল জিভে। সেই হিসেবে সওদা। আবার কবে নয়ানজুলিতে স্রোত ব'বে— কে জানে।

দাওয়ায় চুপ করে বসে সুবালা। চারধার ঘিরে সুবালার সংসার। সদর-রাস্তার ধারে নয়ানজুলির ওপর আটশতক ভিটে জমি। সীমানা দিয়ে জিউলির খুঁটির সঙ্গে বাঁশের বেতি দিয়ে বাঁধা বাংচিতার বেড়া। পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে পুবদুয়ারি এক কুঠুরির ভিটে। মাটির দেয়াল, উলুখড়ের ছাউনি। সামনে দাওয়া। দাওয়ার তলায় মুরগির খোপ। ধাড়িছাগী আর কালী রাত্রে বাঁধা থাকে দাওয়ার ওপর শুকনো কাট কাটবার বোঝার পাশ। ভয় পেলে ব্যা-ব্যা করে পরিত্রাহি ডাকে। ধাড়িছাগী একসঙ্গে তিনটে করে বাচ্চা দেয়। নিয়ম করে দুটো মরে, বাঁচে একটা। এবারেরটা পাঁঠা। মিশকালো রঙ। গায়ে একটা সাদা লোম পর্যন্ত নেই। একটু চরিয়ে খাইয়ে বড়ো করতে পারলে কালী-পূজায় মানতের পাঁটা হিসেবে দাম উঠবে। নাম ধরে ডাকলে কান লটপট করতে করতে এসে পিঠে ঢুঁ মারে। একটা মোরোগ, পাঁচটা মুরগি, আটটা ছানা। বেড়ার ধারে তিন ঝাড় কলা। ঘরের গা-ঘেঁষে একটা আমড়া গাছ।

ডালপালা ছড়িযে অর্ধেকটা উঠোনে ছাযা নামায। সদব রাস্তার বেড়ার ধারে শখ কবে লাগানো একটা আম গাছ। এ-বছব ফলের আশা নেই। মুকুল ছাডার বদলে ডালে ডালে রংবাহাব চিকণ পাতা ছেডেছে রাশিরাশি। উনুনেব ছাই, উঠোন-ঝাঁটানো ও চলাফেলাব ঢিবিতে দুটো মানকচু। পাতাব বাড দেখলে মনে হয এক কাঠা জমি ঢাকবে। বাঁ-পাশে লাউ, পুঁইযেব মাচা। নিকানো উঠোন। ছোটো মেযে নিজেব সংসাব সাজিযে বসেছে আমডা তলায। বডো মেযে গুগলিব খোল ভাঙছে।

সদবে একটা সাইকেলেব চাকা এসে থামলো। আস্তে আস্তে গোটা সাইকেল সঙ্গের মানুষ। দাওযায বসে সুবালা দেখল সূর্য। সাইকেলে তিন বডেব খাঁচায সিটে, কেবিযাবে তিন বস্তা ধান। হ্যাণ্ডেলে ঝুলছে দুটো ঢাউস পলিথিনেব জাবকিন। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এনেছে। বাস্তাব ওপব বেঁকে দাঁডিযে সাইকেলেব টাল ধবে ঘাবেব দিকে তাকাবাব জন্যে ঘাড ঘোবাবাব চেষ্টা কবছে সাবধানে। শক্ত মুঠোয হ্যাণ্ডেল চেপে ধবা।

সুবালা ওঠাব জন্যে তাডাহুডো করে কাপড-চোপড সামলাচ্ছে। টিংটিং সাইকেলেব ঘণ্টি। সূর্য বলল ধান এনেচি।

খেজুব গাছেব সাঁকোব জন্যে উঠোন পর্যন্ত সাইকেল আসে না। সুবালা বাস্তায বেবিযে এল। সূর্য ততক্ষণে কেবিযাবেব ওপব চাপানো একটা ধানেব বস্তা ঠেলে বাস্তায গডিযে ফেলে সাইকেলেব টাল সহজ কবেছে। সুবালাব সঙ্গে হাত লাগিযে বাকি দুটো বস্তা নামিযে ফেললো বাস্তাব ধাবে। কোমবেব গামছা খুলে ঘাড গলা মুছতে মুছতে বলল তিন বস্তা ব-সো।

ঠোঁটেব ওপব ঠোঁট চেপে সুবালা তখন বাস্তাব মাঝখানেব বস্তা ধাবেব দিকে টেনে আনছে। থুতনিব তলায ঘামেব ফোটা। জিজ্ঞেস কবলো, তাডাতাডি আচে নাকি?

বিডিব ধোঁযা ছেডে সূর্য বলল এক বস্তা আগে দিলিই হবে। ঘবে চাল নেই। বোন আসবে— খপোব কবেচে জামাই।

কোন বোন?

ছোটটা।

থাকবে বুজি কদিন?

ছেলেপুলে হবে।

ও মা, তাই নিকি।

সূর্য সাইকেলে উঠছে। খালি জাকিন শব্দ কবে উঠল।

এই রোদ্দুরে তুমি আবার কনে চললে ?

ডিজেল আনতি। খেতে জল দিতি হবে। তাত ধরেচে। মিহি ধুলোর ওপর টায়ারের গভীর ছাপ ফেলে চলে গেল সূর্য।

একটু আগেই রান্নাবান্না, সংসারের থৈথৈ কাজের কথা মনে করে দাওয়া ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তিন বস্তা ধান এসে পড়ায় হঠাৎ ভারি তৎপরতার ছোঁয়া লাগল মনে। তিন বস্তা ধান কড়ায় ভাপিয়ে উঠোনে মেলে শুকিয়ে দিতে পারলে ছ'টাকা হিসেবে আঠারোটা টাকা আসবে ঘরে। উঠোনের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, ইদিকে আয়। ঘরে ধান তোল্‌তে হবে।

সুবালার এখন আর কারখানার বাজারে যাওয়া হয়ে ওঠে না রোজ। গ্রামের ছোটোখাট পুকুর-ডোবা কবে শুকিয়েছে। বাউনপুকুরের জল তলায় এসে ঠেকেছে। স্নান করার সময় জলে নাড়া পড়লে পাঁকের আঁশটে গন্ধ বেরোয়। কলমিশাক, শাপলা কি কচুর লতি মেলানোও শক্ত। মাটঘাট, বনবাদাড় ঘুরে কিছু দিয়েই ঝুড়ি সাজানো যায় না। গ্রামের তাবৎ ন্যাংটা ছেলেমেয়ে ঝুড়ি, খোন্তা নিয়ে চষে ফেলছে আদাড়-পাদাড়।

মাঝখানে আরো ক'বস্তা ধান এলো গ্রামের একজনের বাড়ি থেকে। মজুরিব টাকা শেষ হতে হাত খালি।

আকাশ আগুন ঢালছে। একটু বেলা চড়লো তো মাঠচরা গোরু, মোষ গায়ের চামড়া বাঁচাতে ছায়ার সন্ধানে ঘোরে। অবসন্ন মানুষের হাত হেলিয়ে দেওয়ার মতো তাল, নারকেল গাছে নিজের শরীরের সঙ্গে পাতা এলিয়ে দেয়। বড়ো বড়ো গাছ ছোটো হতে হতে নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলে।

মাঝে মাঝে চোখে ভ্রম হয়। মনে হয়, আকাশে মেঘ জমেছে। ধুলোর মেঘ। রাত্রে ঘামাচির মতো আকাশ ভরা তারা। কদিন আগে সন্ধ্যার দিকে আকাশে চাপা গুড় গুড় আওয়াজ। বিদ্যুতের আলোও যেন ঝলসে উঠল দুবার। রাত্রে ঘরে শুয়ে সুবালা শুনল, চালের ওপর টুপটাপ শব্দ। ঘুমের মধ্যে দেখল, নয়ানজুলিতে ঘূর্ণি তুলে ঘোলা জলের স্রোত। স্রোতের মুখে পাতা চিকের গায়ে আটকে ছটফট করছে মৌরলা, পুটি, উল্কো, কৈ। পাড়ে লম্বা সবুজ ঘাসের মধ্যে লুকানো গর্ত থেকে আধখানা শরীর বার করে চিকের ধারে মুখ রেখেছে কালো ছোপে, হলুদ রঙের ঢোঁড়া সাপ। মাঝে মাঝে ছোঁ-মেরে একটা মাছ মুখে তুলে সেঁদিয়ে যাচ্ছে গর্তের মধ্যে। ভোররাতে ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি দরজা

খুলে বাইরে এসে দেখে, উঠোনে ধুলোয় ক'ফোঁটা জলের দাগ। জলবসন্তের ক্ষতের মতো।

কদিন আর সূর্যদের শ্যালোর ঘর থেকে পাম্প চলার শব্দ আসছে না। আলো জ্বলে না শ্যালোর ঘরে। রেডিওর গান বাজে না।

রোদ পড়লে সুবালা কালীর গলার দড়ি ধরে চরাতে গেল খেতের দিকে। দূর থেকে বোঝা যায় না। কাছে এসে খেতের দিকে তাকিয়ে সুবলা পাথর। পাটখেতের পাটের চারা রৌদ্রে ঝলসে অর্ধেক। খয়েরি রঙ ধান খেতে। ধানের পাতা গুটিয়ে সূঁচ হয়ে শজারুর মতো কাঁটা উঁচিয়ে রেখেছে আকাশের দিকে। পরিষ্কার নিড়ানো খেত থেকে যেন জ্বলন্ত উনুনের আঁচ উঠে আসছে এই সন্ধ্যাবেলাতেও।

শ্যালোর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো সূর্য পাশ ফিরে খাটিয়ায় শুয়ে। একটা হাত কনুই ভেঙে চোখের ওপর।

ও সুজ্জি, চোখের সামনে এমন কাণ্ড দেখে সুবালা যেন আর স্থির থাকতে পারলো না, দমকল চালাবা না? —চারা কটা যে খাক হয়ে গেলো।

তিন চারবার ডাকার পর ভাঙা গলায় সূর্য বললো, মাটির তলার জলে টান ধরেচে। পাম্প আর জলের নাগাল ধরতি পাচ্ছে না।

সুবালার সমস্ত শরীর যেন হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠলো। মনে হল, মাঠের ফুটোফাটা দিয়ে মাটির তলার আগুন সাপের মতো জিভ বার করে এখুনি পরনের কাপড় কামড়ে ধরবে। আকাশের দিকে তাকাল। সারা গায়ে ছাই মেখে ছিলিম চড়িয়ে ভোম হয়ে বসে। সমস্ত ক্ষেতের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে আবার সূর্যের দিকে তাকালো সুবালা। হাল ছেড়ে যেন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। যেদিকে যাবার যাক। নিজে চোখে হাতচাপা দিয়ে শুয়ে। কেউ যেন চোখ দেখতে না-পায়।

সাইকেল চেপে সূর্য রাস্তা দিয়ে যায়। উস্কোখুস্কো চেহারা। মাথায় তেল-চিরুনি নেই। গায়ে খড়ি। যেন অসময়ে এবার গাজনের সন্ন্যাসের পালুনি নিয়েছে। সাইকেলে সূর্যকে দেখলে একজনের কথা মনে পড়ে সুবালার।... কোঁকড়া, ছোটো চুল। গুলি গুলি চেহারা। হাত-পা নাড়তে শরীরের চামড়ার তলার গুলিগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। বুকে যেন দু খানা কাছিমের খোল আটা দিয়ে সেঁটে লাগানো। আশেপাশে দশটা গ্রামের তাল আর নারকেল গাছে বুক ছেঁচড়ে ওঠানামা করতে কড়া পড়েছিল দুই বুকে। উরুর ওপর তুলে পরা খাটো ধুতি। খালি গা। কাধে গোল করে পাকানো কাদদড়ি। গাছে উঠে ডাব,

ডালের কাঁদিতে দড়ি বেঁধে সরসর করে নামিয়ে দেবার জন্য। কোমরে জড়ানো পাছদড়ি। গাছে ওঠার সময় গাছ আর কোমরের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে জড়ানোর শক্ত মোটা কাছি। নিজের হাতে সরু করে বাখারি তুলে বোনা ঝাঁপি। ঝাঁপিতে চকচকে গাছকাটা দা।

পান্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ত সকালে। সাইকেলে ডাবের কাঁদি বয়ে ফিরতো যখন, তখন মাঝ-দুপুর। ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে সাইকেলে ডাবের পাহাড় ঠেলতে-ঠেলতে তিন মাইল দূরে ডাবের আড়ৎ। বাড়ি ঢোকার আগে ফিরেছে জানান দিতে সাইকেলের ঘন্টি বাজাত। সুবালা তখন উঠোন ঝাড় দিত। ঘরের দেয়াল লেপে লতাপাতা, পাখি আঁকতো। ভাত রাঁধতো। ব্যঞ্জন রাঁধতো। পা-ছড়িয়ে বসে পানের খিলি সেজে এগিয়ে দিত। গর্ভে তখন ছোটো মেয়ে। হাত পা ছোঁড়ে মাঝেমধ্যে। ভারী শরীরে দাওয়ায় শুয়ে—। ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেও দুটি কান সাইকেলের টিংটিং ঘন্টি শোনার জন্য সজাগ। মাঝে মাঝে আচ্ছন্নতা ভেঙে দাওয়ায় উঠে বসেছে। সোজা রাস্তা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছে। রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায়। সাইকেলের ঘন্টি বাজে না। এক সময় দেখল, গ্রামের রাস্তায় দূরে একদল জমাট লোক। একসঙ্গে এগিয়ে আসছে। আরো একটু কাছে আনতে দেখলো, চারজনের কাঁধে বাঁশের চালি। সুবালা বুঝলো কেউ বোধহয় মায়ার বাঁধন কাটিয়ে নিজের বাড়ি ফিরছে। গ্রামের ক'জন বুড়োবুড়ি, রুগী, আতুরের মুখ মনে এলো পরপর। অবাক হল, এ-কেমন যাওয়া? সঙ্কীর্তন নেই! হরিধ্বনি নেই! গেটের কাছে গিয়ে সুবালা ঘোমটা টেনে দাঁড়াল। শেষযাত্রার মানুষ দেখা আহা, বড়ো পুণ্য।

সুবালাকে অবাক করে তার বাড়ির সামনে থামলো সবাই। কাঁধের মাচা নামালো রাস্তার ওপর। কেউ কথা বলছে না। একটা শব্দ নেই অতগুলো মানুষের মুখে। খুব অবাক হয়ে সুবালা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে শোয়ানো মানুষটার মুখের দিকে তাকাল। ঠিক সেই সময় ছোটো মেয়ে পেটের মধ্যে পা-ছুঁড়ছে। নীল হয়ে যাচ্ছে সুবালা।

কে যেন বললো, নন্দিডাঙার চাটুজ্জেদের দিঘির ধারে গাছে ডাব কাঁড়াতে উটেলো। পাছ্‌দড়ির ফাঁস খুলে পড়েছে বেনাঘাসের জঙ্গলের মধ্যি। —টের পায়নি কেউ! দিঘির ধারে সাইকেল দাঁড় করানো। দুলেদের ছোটোছেলে ডাকপাখি ধরার জন্যি ফাঁদ পাততে গে টের পায়। মাথাটা পড়েলো ভাঙা-ঘাটলার শানের ওপরি। পাঁচ নিটার রক্ত বেইরেচে নাক দে— ?

নাহে না, —আর একজন বললো, অমোন পাকা গেছুড়ে। দিন অন্তত পঞ্চাশটা গাছে ওঠে নামে। তার কি এমন ভ্রম হয়? আসলি নিদেন, আগেই পাখিরছা খেতে গাছে চড়ে বসেলো। যেমন দায়ের ঘা পড়েছে চক্কোর ধরেছে শিরে। ছোবোল বাঁচাতে যেই পেছন পানে ঝোঁক মেরেছে সেই—।

রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে গ্রামের বুড়োমানুষ ধুলোয় খড়ের আঁক কাটতে-কাটতে বললো, আসলি তা-লয়—! কাজ কর্তে যিনি পৃথিবীতে পাট্টেলেন লাল খেরোখাতা খুলে দেকলেন, আরে মানুষটার ভোগ তো শেষ! আগের জন্মে মেলাই সৎ কাজ। —নেকা থাকে তো সব খাতাখানায়। —হাত বাইডে নিজির কাচে টেনে নেলেন। একোন ভাবনা কচি বউটাব জন্যি, পেটের সন্তানটার জন্যি।

সবাইযের ওপর দাম হেঁকে সাইকেল কিনে নিল সূর্য। শ্রাদ্ধ-শান্তিতে খুব খাটলো। এখন সেই সাইকেল চেপে সূর্য বাস্তা দিযে যায় আসে।

ঘরে মেযেরা ঘুমোয। সুবালা দাওয়ার খুঁটিতে পিট রেখে বসে। অমাবস্যার জমাট-অন্ধকার চারপাশে। পূর্ণিমায় সারা মাঠ জ্যোৎস্নায় ভাসে। বর্ষায় চারিদিকে শুধু জলেব শব্দ। তখন গলাব নলি ছিঁড়ে গোঙানির মতো একটা শব্দ উঠে আসতে চায়। আচ্ছন্নতাব মধ্যে সুবালা মাথার মধ্যে শোনে—টিংটিং, টিংটিং। বাতাসের মধ্যে দিযে সাইকেল মাঠ ভাঙছে কোণাকুণি।

গ্রামের লোক মিছিল করে গিয়ে বি ডি ও অফিস ঘেরাও করে রেখেছিল সারাদিন। সূর্য সন্ধ্যার সময় মিছিল থেকে ফেরাব সময বডো মেযেকে বলে গেল, জি আর দেবে। গম আব টাকা। কাল যাস্—।

অনেক বাড়ির কুয়োর জল শুকিয়ে এসেছে। দশ বালতি জল তোলার পরই পাঁক ওঠে। চাপা-কলের জলে মিহি বালি।

দু-চার দিন অন্তর আকাশে মেঘ জমে। হাওয়া বন্ধ। গুমোট্। চাপা স্বরে আকা। ডাকে। মেঘ ঝুলে আসে। কোথা থেকে হুস্ করে একটু হাওয়া আসে। মেঘ সরে বিনবিন তারা ফোটে আকাশে। চাঁদের আলোর বান ডাকে চরাচর জুড়ে।

একদিন আকাশ নেমে এল।

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে মেঘ অবসন্ন মাঠের ওপর নেমে এসে চাপা স্বরে গরগর করে ডাকলো মাটিকে।

সুবালা ঘরে শুয়ে আকাশের ডাক শুনলো। পিঠের তলার মাটির শিউরে ওঠা টের পেল। দু-পাশে দুই মেয়ে ঘুমে অচেতন।

হাওয়া ছুটে এল। কলাগাছের পাতায় হাওয়ার ঝাপটা লাগল প্রথম! শুকনোপাতা খসে পড়ার শব্দ হল। হু হু করে চালের ওপর দিয়ে পিছলে গেল বাতাস। আকাশ ঝলসালো। বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো ঢুকে চমকে দিল ঘরের অন্ধকার। ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে অপলক সুবালা। বাতাস ঝড় হয়ে উঠছে। মাঠ দাপিয়ে রণ-পা পায়ে আ···বা···বা··· হাঁকতে হাঁকতে ছুটে আসছে। আমড়া গাছের ডাল নুয়ে পড়ে ঝাপটা দিল চালে। চালের ঝুটি মুঠোয় চেপে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল ঝড়। চাল থেকে উইয়ের বাসার মাটি ঝরে পড়ল সুবালার সর্বাঙ্গে। ঘুনে কাটা বাঁশের মিহি গুড়ো ঘরের বাতাসে। দারুণ শব্দে বাজ পড়লো। কেঁপে উঠলো সুবালা। দুই মেয়ে দু-পাশ থেকে ভয় পেয়ে হাউমাউ করে জাড়িয়ে ধরলো।

ঘুমো, ঘুমো—, সুবালা ডানার মতো দুটো হাত বিছিয়ে দিল মেয়েদের শরীরে।

অন্ধকারে নিষ্পলক সুবালা। চালের ওপর শব্দ হল, টুপ্। টাপ্। টুপ্-টাপ্! ঝড়ের বেগ কমে আসছে। আবার আকাশ ঝলসে উঠলো। ঘরে শুয়ে সুবালা মাঠের মাটির শুকনো ঠোঁটে বৃষ্টির ফোঁটা শুষে নেবার শব্দ পেলো। চালের ওপর শব্দ বাড়ছে। গুড়গুড় করে বড়ো সুখের ডাক বাজলো আকাশের গলায়।

ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে। ঘরের কোণ থেকে কট্‌কট্ করে ডেকে উঠলো কুনি ব্যাঙ। অঝোরে বৃষ্টি। কলাপাতার ওপর বৃষ্টির শব্দ। চাল থেকে উঠোনে জল ঝরছে ঝরঝর। বৃষ্টির ছেদহীন শব্দ চারিদিক ঘিরে। ঠিক তখনই বৃষ্টির মধ্যে টিংটিং, টিংটিং—। সাইকেলের ঘন্টি অন্ধকারে মাঠ-ভাঙছে কোণাকুণি। আচ্ছন্নের মতো উঠে বসল সুবালা। অন্ধকার হাতড়ে সম্মোহিতের মতো দরজার আগল খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

বৃষ্টির অন্ধকার সামনে। বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে নিঃশব্দে। মাঠের সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে যেন। হাওয়া বৃষ্টির ছাট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিউরে উঠলো সমস্ত শরীর।

দাওয়ার নিচে মুরগির খোপ থেকে হালকা শব্দ উঠলো— বক্।

একধারে শুকনো কাট-কাটরা, পাটকাটির বোঝার আড়ালে ধাড়ি আর কালী বসে।

অন্যদিকে ছায়ার মতো কী যেন নড়ে উঠলো।

কে—, গলা দিয়ে ভয় মেশানো শব্দ বেরিয়ে এলো সুবালার।

আমি। আমি সুজ্জি—।

সুজ্জি!

বিদ্যুতের আলোয় সুবালা দেখলো, ছাট্ থেকে শরীর বাঁচাতে দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে বসে সূর্য। গায়ে জড়ানো ভিজে গামছা। মাথা থেকে জল গড়িয়ে নামছে কাঁধে, পিঠে।

বেড়ার ফাঁক দে বৃষ্টি ঢুকে একহাঁটু জল দেইড়ে গেলো শ্যালোর ঘরে। বাসাতে যেন মাতার ওপর চালখানা খাম্‌চে নে যাবে। হ-ড়া-ম্, হ-ড়া-ম্, —আকাশের কি তজ্জোন, সূর্য আস্তে আস্তে বললো— মাটের মধ্যি একা। হাঁকাড় দিলিও কেউ শোনতে পাবে না। কেমন তরাস লাগলো। বাদলার মধ্যি দৌড়ে দাওয়ায় এসে ওঠলাম।

টিংটিং। টিংটিং—, সাইকেলের ঘন্টি বাজছে।

সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এসে সূর্যের পাশে হাঁটুভেঙে বসলো সুবালা। দুটো হাত ছোঁযালো সূর্যের মাথায়। গলার কাছে গোঙানি উঠে আসছে, গামচাটা দাও। মাতাটা মুইচে দি—।

শুকনো উঠোন ভাসিয়ে ঘোলা জলের স্রোত নেমে যাচ্ছে নয়ানজুলিতে। বাতাসে মাটির ভেজা গন্ধ। জলের শব্দ চরাচর জুড়ে।

সুজ্জি—, আমার মধ্যিও যে অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকে। জোছনার বানভাসি হয়। কিন্তু আমার যে খরা কাটে না। আমি কি-করি সুজ্জি—, বলতে চাইল সুবালা। গলার স্বর আটকে গেলো। ফিস ফিস করে বললো, একোন আর একা নাগচে না তো?

বৃষ্টির জোর কমে এসেছিল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝাঁপিয়ে এলো আবার। কোথায় বুঝি বাজ ফেলার আয়োজন করছে আকাশ। অনেক ওপরে চাপা গুড়গুড় শব্দ। বিদ্যুতের আলোর ঝলক ছুড়ে নিশানা ঠিক করছে।

ধানপোকা

জমাটভাব খানিকটা পাতলা হতে শুরু করলেও চারিদিক তখনো কুয়াশায় মোড়া। আগুন ঘিরে চারজনে যেখানে বসে তার পেছনেই গ্রামের সদর রাস্তা। আজ হাটবার! রাস্তায় লোকজনের চলাচল ভোররাত থেকে। কথাবার্তা, গো-গাড়ি হাঁকানোর ধ্বনি শোনা যায়। আ-চমক কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে একেকজন, একটা গো-গাড়ি। মাথার ঝুড়িতে, গাড়িতে সাজানো শীতেব কাঁচা ফসল, পাটের গাঁট, খড়ের তরফা। আবার হাটের পথে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়েও যায়। পথচল কথাবার্তাব শব্দ ক্ষীণ হয়ে কুয়াশায় ডুবে যায়।

চারজনের মাঝখানে খড়কুটোর আগুন নিবে এসেছিল। ধোঁয়া উগরোচ্ছে গলগল করে। মাঝে মাঝে নীল শিখা ধোঁয়ার সঙ্গে লতিয়ে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে। দীনবন্ধু তাব মধ্যেই হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে সেঁকছে ভূট্টা পোড়ানোর মতো ঘুরিয়ে-ফিবিয়ে। নির্বিকার মুখ। আড়চোখে কয়েকবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর থাকতে পারল না পবন। তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল সটান, কি করবে ঠিক করো। কাজ ধরতে হলে ধরো— নয় কাটান দাও। উবু দে বসে আগুন পোয়ালি বেলা এটুকে থাকবে না। বাড়ি গে একবোঝা ঘাস কাটলিও গরু-ছাগলে খাতি পাবে দুটো।

বিষ্টু পবনের মতো তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল না। শীত-কাতর জড়োসড়ো ভাব ভেঙে বলল, মজুরি না-বোইলি আমারও উলুখুড় কাটতি যাওয়ার দরকার। এ-বচোর ঘরের চাল জুৎ না-কোরলিই নয়—, দীনবন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ও মোড়োল, কি ঠিক করলে? — বেলা যায়!

দীনবন্ধু খিঁচিয়ে উঠল, হাতে যখন এতোই কাজ তখন মজুরি খোঁজতে বেরুনো কেন? আমি কি পায়ে দড়ি বেঁধে থুইচি? —নিজির মনমতো হাঁটা ধরলিই পারো—।

মাঝে পড়ে ভূজেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপোস করার মতো করে বলল, আ— হা মোড়ল কি আর স্বইসচেতে বসে আচে? কাজ তো আর সে একা করবে না! তোমরা মতামত করো— আট টাকা কাহন ফুরোনে ধান ঝাড়তে লাগবা

কিনা। শোনলে তো গেরস্ত কি জবাব করেচে— আট টাকার ওপর একটা নয়াও নয়। জনাপ্রতি দশটা বিড়ি আর কোয়াটার পাউরুটি জলখাবার হিসেবে— এখন একটা জবাব করো তোমরা—। মোড়োলের ওপর রাগঝাল দেকালি হবে কেন ?

বল দিনি ভজা—, ভূজেনকে সাক্ষী মানল দীনবন্ধু, কাজ মারাচ্চেন সব, গলার স্বর তেতো করে বলল, কতো সব কাজের মানুষ একেক জন !

শেষ রাতের আকাশভরা তারা মাথার ওপর নিয়ে চাদর গামছায় শরীর মুড়ে কাজের ধান্দায় বেরিয়েছিল চারজনে। পোষ মাসের শেষ। শেষ রাতের শীত মজ্জাব মধ্যে ঢুকে হাড কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। যখন মাঠের মধ্যে অর্ধেক রাস্তায়— চাপ চাপ কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলল চতুর্দিক। অন্দোজে দিক নিশানা করে অন্ধের মতো পথ হাঁটা। মাঠে কাটা ধানগাছের নাড়ায় রাতের শিশির নলের মধ্যে জমে থাকা জলের মতো জমে। পায়ে পায়ে ছিটকে উঠে হাঁটু পর্যন্ত ভিজিযে দিয়েছে। —তিন মাইল মাঠ ভেঙে এই গ্রামে।

গ্রামের মধ্যে সদর রাস্তা ধরে হাঁটছে। চারজনের চোখের দৃষ্টি রাস্তার ধারে, গৃহস্থের খামারে। মাঠ থেকে সকলের ফসলই খামারে এসে উঠেছে। যাদের জমি কম, ঘরে খোবাকিব টানাটানি তারা ঝেড়েঝুড়ে ধান ঘরজাত করেছে। বর্ধিষ্ণু গৃহস্থেরা ধানসুদ্ধ খড় পরিষ্কার গাদা দিয়ে রেখেছে খামারে। জনমজুরের টানাটানি কমলে, মজুরির দর পড়লে ধান ঝাড়ার কাজে হাত দেবে। চারজনের কান সজাগ। কোথা থেকে ডাক আসে, কি গো—, কাজ করার ইচ্ছে আছে নাকি ? —ধান ঝাড়ার কাজ।

কিন্তু তেমন ডাক কানে এসে পৌঁছোয়নি।

সামনে, রাস্তার বাঁকে পাকাবাড়ি। একতলা। বারান্দায় টিনের ছাউনি। সামনে খামার। খামারে পরপর তিনটে না-ঝাড়া খড়ের গাদা। —রোদ থাকলে আলো ঠিকরে চোখ ধাঁধাতো। এখন, কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মতো জবুথবু।

সবার আগে হাঁটছিল দীনবন্ধু। বাড়িটা চোখের আড়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। আগেপিছে তিনজন কাছে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা জড়ানো স্বরে বলেছিল, গে জিজ্ঞেস করবো, কাজ আচে কি না ?

সকলেই বুঝেছিল, কি বলতে চাইছে দীনবন্ধু। বলতে চাইছে, অনেক তো ঘোরা হল। এখনো গ্রাহক জুটল না। কুয়াশায় টের না-পেলেও নিজের নিয়মে বেলা ঠিকই গড়িয়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই কুয়াশা কাটিয়ে চড়বড় করে

রোদ ফুটবে! এ অবস্থায় কি করা—? দিনটা বেকার যাবে না তো শেষ পর্যন্ত?

নিজি উবচে যাবা—, বিষ্টু বেশ ংশয় নিয়ে বলেছিল, ভাববে হাতে কাজ নেই— মজুরি মাগতে এয়েচে!

দীনবন্ধুর এক দোষ, নিজের কথায় সায় না পেলে ধাঁ-করে মাথায় রক্ত চড়িয়ে বসে। শান্তস্বরে বলেছিল, তালে চলো— বাড়ি যাই! ভোরবেলা বেশ বেড়ানো হলো। এবার বাড়ি গে পেটে কিল মেরে রোদ্দুরে পাটি পেতে শুইগা—।

তিনজনেই চুপ। এখন কথা বলা মানে জ্বলন্ত উনুনে আরো দুআঁটি শুকনো পাটকাটি গুঁজে দেওয়া!

ভূজেনও সম্মতি জানিয়েছিল, তাই যাও মোড়োল। শীতের বেলা ফস করে গইড়ে যেতে কতোক্ষোন! বেলায় গাহোক জুটে কাজ পেলি শেষ করবো কখোন?

পব্‌না—, দীনবন্ধু ভ্রূ-কুচকে মুখের দিকে তাকিয়েছিল, রা কাড়িস না যে। জাড়ে বোবায় ধরলো নাকি তোরে?

আমি আলাদা করে কি বলবো—, পবনেরও তেড়িয়া জবাব, সকলের মতামত হলি আমারও তাই। দিন দিন লতুন হচ্চো নিকি?

দীনবন্ধু যাবার উদ্যোগ করেছে, ভূজেন সাবধান করার মতো করে বলেছিল, লোক কিন্তু খো-ও-ব ঠ্যাটা পোকিতির—। হরিদার দলের সঙ্গে কাজ কর্তে এসে টের পেয়েলাম এক বচোর! মজুরিগণ্ডা নে খোব্‌ ভোগান ভুগগেলো।—গরজ ধরি গেলে দরে কষুনি মারবে।

চাষ-আবাদের সব কাজ একা মানুষের দুটো হাতে হয় না। যেমন, এই ধান ঝাড়ার কাজ।—দল বাঁধতে হয়। ভূজেন ছিল হরির দলে। বনিবনা না হওয়ায় দীনবন্ধুর দলে এসে ভিড়েছে। দীনবন্ধু, ভূজেন, বিষ্টু আর পবন এই নিয়ে গত ক'বছর দল হচ্ছে ধান-কাটা, ধান-ঝাড়ার মরসুমে। দলের মোড়োল দীনবন্ধু। পবন, বিষ্টুর কারোরই এক ছটাক জমি নেই। ভিটের জমিটুকু পর্যন্ত রাস্তার ধারে সরকারি জমির ওপর। পার্টির হয়ে কয়েকবার মিছিলের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে, বি-ডি-ও অফিস ঘেরাও করে পঞ্চায়েৎ থেকে খাজনায় ঘর তোলার স্বত্ব পেয়েছে। ভিটের জমি পাঁচকাঠা দীনবন্ধুর নিজের। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বাপ ঠাকুর্দার আমলে নাকি দু-পাঁচ বিঘে মাঠানজমি ছিল। বাপ মারা যাবার আগেই সেসব ঘুচে গিয়ে ভিটেটুকুতে ঠেকেছে। ভূজেনের

মাথার ওপর চালই নেই তো চুলোর ব্যবস্থা! বউ মরে যেতে বাউণ্ডুলে হয়েছে। সঙ্কীর্তনের দলের সঙ্গে শ্রীখোল বগলে দেশ-দশ ঘুরে বেড়ায়। ধান কাটা, ধান ঝাড়ার মরসুমে গ্রামে এসে থাকে। এর বাড়ি ওর বাড়ি গান শুনিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। দলের সঙ্গে মাঠের কাজ করে হাতে কিছু পয়সা জমিয়ে পৌষ সংক্রান্তির পিঠেপুলি খেয়ে সঙ্কীর্তনের দলে ঝাঁকের কৈ হয়ে মেশে আবার।

দীনবন্ধুর ফিরতে দেরি হচ্ছিল।

অসহিষ্ণু হয়ে পবন বলেছিল, ধুত্তুরি—! শীতের মধ্যি কতোক্ষোন ডাইড়ে থাকা যায়!

এদিক-ওদিক হাঁটকে কিছু পচা পাট-কাটি, খরকুটো, শুকনো খেজুর পাতা যোগাড় করে আগুন জ্বালতে বসেছিল। সারা রাতের হিমে নরম খরকুটো ধরতে চায় না। গলগল ধোঁয়া উগরোয়। ফুঁ-দিয়ে ধরিয়ে ফেলল পবন। ধোঁয়ায় দু-চোখ লাল। আগুন জ্বলে উঠতে তিনজনে আগুন ঘিরে উবু হয়ে বসে হাত এগিয়ে দিয়েছিল।

গাছের মাথা থেকে কুয়াশা সরে যেতে শুরু করেছিল। ডালাপালার ফাঁক দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ে দখল কায়েম করছিল আস্তে আস্তে। মাথার ওপর কাঠ বাদাম গাছের ডাল থেকে একটা বক ডানার শিশির ঝেড়ে উড়ে গেল। নাড়া পেয়ে বৃষ্টির ধারার মতো গাছের পাতার জল ঝড়ে পড়েছিল তিনজনের মাথায়।

দীনবন্ধু এসে বসেছিল পাশে। ভ্রু, গোঁফ, চুল কুয়াশায় সাদা। মুখ কালো। বোঝা যায়, খবর ভালো নয়।

কি বললে—, উসখুস করে ভূজেন জিজ্ঞেস করেছিল, ধান ঝাড়াবে না এখন?

তিনজনে তাকিয়ে আছে দীনবন্ধুর মুখের দিকে। আগুনে হাত সেঁকছিল দীনবন্ধু, ওই না ঝাড়ানোর মতোই এক রকম।

কি বললে পষ্টো করে বলবে তো—, পবন ঝেঁঝে উঠেছিল, অদ্দেক কতা পেটের মধ্যি সেঁদিয়ে রাকলি আমাদের বোঝা হবে?

সোজা দৃষ্টি পবনের মুখের ওপর ফেলে দীনবন্ধু বলেছিল, আট টাকা কাহন দর হলি ধান ঝাড়াতে পারে।—লাগবা কাজে?

পবন মুখ খারাপ করেছিল দর শুনে।

আমি তখনই বললাম— লোক খোব ঠ্যাটা পোকিতির— গরজ ধরে গেলি দরে কয়ুনি মারবে।

চুপচাপ সকলে। আগুন নিবে এসেছিল। শেষ উত্তাপটুকু শরীরে শুষে নেবার জন্যে সকলেই হাতের তালু ছড়িয়ে দিয়েছিল আগুনের ওপর।

নীরবতা ভেঙে ভুজেন কথা বলেছিল, তুমি কিচু জবাব করেলে নাকি?

আসলে জানতে চাইছিল, দীনবন্ধু গৃহস্থের বলা দর শুনেই চলে এসেছে না দরদাম বাড়ানো নিযে বলেছে কিছু।

বললে শোনচে কে—, দীনবন্ধু বলেছিল, বললে, ধানের জন্মো কোথায় এ-বচোর! পেরায় সকলেরই ধান ঝাড়া শেষ। ক্ষেতমজুর হাত-কোলে ঘরে বসে। রোয়াব সময় জোট বেঁধে মজুরি বাইড়েলো খেতমজুর। তখন একটা কতা বলিনি। যা-চেয়চে তাই হাতে ধরে দিইচি। একোন দর আমার হাতে। দর পচোন্দ হলে কাজ ধর্তে পার। —আট টাকার ওপর একটা নয়াও নয।

বর্ষায় ধান রোযাব সময় আর ধান কাটা, ধান ঝাড়ার মরসুমে ফুরোনে কাজ মাঠে। দিনমজুরিব বাঁধা দামের মধ্যে আটকে পড়তে চায় না খেতমজুররা। মাঠে এসময় কাজেব তুলনায় কাজের মানুষের অকুলান; জমিব মালিকরা চায় সকলের আগে নিজেব জমিব ধান রোয়া শেষ করে পায়ের কাদা ধুয়ে ঘরে উঠতে। শীতে, ফসল পাকলে কেটে বেঁধে খামারজাত করে নিশ্চিন্ত হতে। বছরের এই দুটো সময ফুরোনে কাজ মাঠে। —বর্ষায়, ধান রোয়ার সময়, সারাদিন জলকাদায দাঁড়িয়ে খেতের ঘোলাজলে বৃষ্টির টিউপ-টিউপ শব্দ, আদুড় পিঠে বৃষ্টির ফোঁটার হুল-বেঁধানো, কাদার মধ্যে একটি একটি করে ধানচারা বসিয়ে তিনজনের মজুরি তোলে একজন খেতমজুর। আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে সাদা হাজা। জলে ভেসে অগোচবে গায়ে জোঁক উঠে চেপে বসে। খিদে মিটিয়ে জলে খসে যায়। হঠাৎ নজর পড়লে দেখতে পায়, সরু সুতোর মতো রক্তের রেখা ভেসে যাচ্ছে ঘোলা জলের স্রোতে। জলচর বিষাক্ত পোকার কামড়ের দাগড়া দাগ সমস্ত শরীরে। বীজতলা থেকে ধানচারা তুলে বাঁকে সাজিয়ে খেতে বয়ে নিয়ে যেতে কাঁধের চামড়ায় কড়ার পুরু, কালো ছোপ। উদয়াস্ত কোমর ভেঙে নুয়ে কখনো রোদ-ঠিকরানো, কখনো মেঘে কালো জলের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় মাথার শিরায় মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা। —ধান কাটা, ধান ঝাড়ার মরসুমে লড়াই উত্তুরে হাওয়া, শীতের সঙ্গে। শুকনো ধানগাছের পাতায় ক্ষুরের মতো ধার। হাতপায়ের লোমের গোড়ায় রোজই নতুন করে ক্ষুরের পোচ পড়ে। উত্তুরে হাওয়া নিলোম শরীরে চাবুকের পর চাবুক চালায়। কেটে রক্ত বেরোয়। শুকিয়ে কালো হয়ে আঠার মতো লেগে থাকে। একটা করে খড়ের আঁটি বাঁধতে হাতের নখ কাগজের মতো পাতলা। গরম ভাত, নুন

লঙ্কার স্পর্শ লাগলে মনে হয় থালা ছেড়ে উঠে পচা-ডোবার পাঁকের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বসে। …তবু খেতমজুরের কাছে বড়ো সুখের, বড়ো নির্ভরতার কাল বছরের এই দুটি সময়! থালার পাশে দু-একটা শখের পদ, কিছু কেনাকাটা, সুদসমেত ঋণ মিটিয়ে নতুন করে দেনা করার পথ পরিষ্কার করে নিশ্চিন্ত হওয়ার সময়।

মোড়োল, তুমি কি এক্কেরে না-করে এয়োচো, —ভূজেন জিজ্ঞেস করেছিল।

তিনজোড়া চোখের উদগ্রীব দৃষ্টি দীনবন্ধুর মুখের দিকে। পবন পর্যন্ত ঘাড় শক্ত করে আড়চোখে তাকিয়ে।

বললাম আমি তো একা নই—। দলের সকলের মতামত করে আসি।

খুব চাপাভাবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল।

আঁটি হাতে নে দেকেলে নাকি—, ভূজেন জিজ্ঞেস করেছিল, গাছ কতো নাম্বা?

এসব জানার ওপরই ধান-ঝাড়ার ফুরোন কাজে মজুরির পড়তার নির্ভর। ধানগাছ লম্বা হলে শিষ থেকে ধান ঝরাতে বেশি বার আছড়াতে হয়। আঁটি মোটা করে বাঁধা হলে একটার বেশি আঁটি দু-হাতের মুঠোয ধরে পেটানো যায না। কাজ কম হয়। পড়তার হিসেবে মজুরিও।

দীনবন্ধু মাটির ওপর হাত তুলে একটা কাল্পনিক উচ্চতা দেখিয়েছিল।

তালে তো বেশ নাম্বাই বলতে হয়, —ভূজেন বলেছিল।

ফস করে পবন বলেছিল, বললে না কেন ওই কেলাশের ধান ষোলো টাকা দরে ঝাড়াবার জন্যে নোকে সাধাসাধি করেলো সিজিন টাইমে—।

খুব রেগে গেলে দীনবন্ধু যেমন শান্তস্বরে কথা বলে তেমনি করে বলেছিল, আমি তো পারলাম না। আপুনি যাও—। গে দরদাম করে এইসো।

আমি বাড়ি চললাম—পবন ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যাবি তো চ। —ঝাঁটা মারি ওমন ধান ঝাড়ার মুয়ে।

হ্যা-হ্যা যা, দীনবন্ধু ক্ষেপে উঠেছিল, বাড়িতে গরম ভাত আর মাচের ব্যঞ্জন রেঁধে থালা সাজ্জে বসে আচে মাগ। —পিঁড়ি পেতে বসগা যা।

দীনবন্ধুর মেজাজ দেখে বিষ্টু আর উঠতে সাহস পায় নি। পবন দাঁড়িয়েছিল। যেন বিষ্টুর জন্যে যেতে পারছে না। নইলে কখন হাঁটা দিত।

কি ডাইড়ে রইচিস যে। —গেলিনি?

পবন চুপ। রাস্তার ধুলোয় পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আঁক কাটছে।

পবনকে শুনিয়ে দীনবন্ধু বলেছিল, বাজার থে চাল কিনে গেলি যাদের হাঁড়ি

চড়ে— তাদের পোঙা দে ওমন শব্দ দে বাসাত বেরোয় কি করে বল দিনি ভজা!

তুমিও দেখি তেমনি হোলে মোড়োল— ভূজেন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ছেলে-ছোকরার কতা বাদ দাও দিনি। কাজ ধরতি হলে চলো। এতো বেলায় আর কাজ খোঁজবেই বা কোথায়? যা হয় ঠিক করো একটা!

তকতকে নিকানো খামার। গতকালই বোধহয় ঝাঁট পড়েছে, গোবরগোলা দেওয়া হয়েছে। শিশিরে এখনো খামারের মাটি ভিজে। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে আলপনা কেটেছে খামারে। রোদ লেগেছে খড়ের গাদার চূড়ায়। ফিনফিনে বাষ্প উঠছে। মাটির গন্ধ, খড়ের গন্ধ, বাতাস ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। একটা টগর ফুলের গাছ একধারে। কিছু সাদা ফুল বিছিয়ে রয়েছে গাছের তলায়, খামারের ওপর। —দীনবন্ধু আগেই দেখে গিয়েছিল। মায়া ঘনালো বাকি তিনজনের চোখে।

খামারে পা-দেবার আগে দীনবন্ধু হেঁট হয়ে খামারের মাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে কপালে ছোঁয়াল, জিভের ডগায় ঠেকিয়ে দাঁতে জিভ লাগিয়ে শব্দ করল মুখে। মনে মনে বলল, তোমার সাঁই মেড়িয়ে যেতে হচ্ছে। —রাগ কোরোনি জননী।

বাবুবাড়িতে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। সাড়া দিয়ে দীনবন্ধু বাড়ির ভেতরে ঢুকছে কাজ শুরু করার কথা বলতে। ভূজেন খড়ের গাদার কাছে গিয়ে আঁটি টেনে দেখছে। বিষ্টু একধারে বসে বিড়ি ধরিয়েছে একটা। পবন দুটো টগরফুল তুলে কানে গুঁজে ঘুরে ঘুরে দেখছে এদিক-ওদিক।

গায়ের গামছা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে বাঁধতে দীনবন্ধু ফিরে এল। দলপতির মতো নির্দেশ দিল, পবনা, বিষ্টু বারান্দা থেকে বাঁশের মাচা নে এসে বাঁ-ধারের গাদার ধারে নাগাও তোমরা—। আমি আর ভজা জালি দেতে নাগচি।

বিষ্টুর বিড়ি তখনও শেষ হয়নি। তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে বসে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। দীনবন্ধু তাড়া লাগাল, ওটো, ওটো। আর গাবেড়োনি দিওনি। বিড়ির পোঙা টিপে ধোমা বার করার অনেক সময় পাবা।

খড়ের গাদা থেকে আঁটি বার করছে দীনবন্ধু! ভূজেন একসঙ্গে অনেকগুলো বারকরা আঁটি পাঁজাকোলা করে তুলে সাজিয়ে রাখছে ধানঝাড়া মাচার ধারে। —খড়ের জালি দিচ্ছে। শিষ একদিকে, মাচার দিকে গোড়া। মাচা আর জালির মাঝখানে মাপ মতো ফাঁক। যাতে মাঝখানে দাঁড়ানো যায়। দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে দুহাতের মুঠোয় খড়ের আঁটি তুলে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে সজোরে

আছাড় মারা যায় সামনের বাখারি দিয়ে বোনা মাচার ওপর। প্রথমে দুবার আছড়ানো সজোরে। পরের চারবার আস্তে। শেষ ক'বার আবার জোরে। হাতের মুঠোয় ধানের আঁটি ঘুরে যায়—। সবদিকে সমান আঘাত পায়। শিষ থেকে ধান ঝড়ে পড়ে। ধানশূন্য খড়ের আঁটি তখন ছুঁড়ে দেওয়া হয় সামনে খামারের খালি জায়গায়। হাত খালি হলে আবার পাশ ফিরে জালি থেকে আ-ঝাড়া খড়ের আঁটি তুলে নেওয়া—। ক্রমে, পেছনের জালির উচ্চতা কমতে থাকে। ধান জমতে থাকে মাচার নিচে খামারের মাটিতে। সামনে স্তূপ হয়ে ওঠে খড়।

খুঁটির ওপর মাচা চাপিয়ে প্রয়োজনীয় বাঁধাছাদা করে পবন বলল, কই বিড়ি দে গেল না তো ?

দেচ্চে, দেচ্চে— দীনবন্ধু গলায় ঝাঁঝ ফোটাল, নেশায় দাঁড়াতে না-পারলি নিজের কোটো থেকে নে খাও।

কেন— ? নিজিরটা খাবো কেন ? যার কাজে এয়েচি তার দেয়ার নেয়ম।

নেয়ম তোমার এর মধ্যি দে মাটিতে চেপে বসে থাকোগা যাও —।

গজর গজর করতে করতে পবন বিড়ি ধরালো।

পবনাটাকে নে কাজে বেরুনো এক ফেরা—।

বয়েস হালকা তো— ভূজেন অবস্থা সামলাতে বলল, কিন্তু একবার কাজে নেগে গেলি একাই দশজনা—।

পেছনে খড়ের জালি। মাটি থেকে প্রায় মানুষ সমান উঁচু করে সাজান। সামনে মাচা। জালি আর মাচার মাঝখানের ফাঁকের মধ্যে চারজনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতের মুঠোয় দুটো করে খড়ের আঁটি। অপেক্ষা করছে মাচার ওপর আছাড় মারবার জন্যে। দলের মোড়লের হাতের আঁটি মাচার ওপর আছড়ে পড়বে প্রথম।

দীনবন্ধুর দুচোখ বোজা। ঠোঁট নড়ছে! ধানগাছের গায়ে আঘাত দেবার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। মনে মনে সেই মন্ত্রটা বলছে। বলছে, রাগ কোরোনি জননী! এস্তনের বোঁটায় সন্তানের দাঁতের দাগ পড়লি মা কি রাগ করে ? গেরস্তোর গোলা ভরে দাও মা নোক্‌খি।

ঘা দাও, ঘা দাও মোড়োল—, পবন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। হাতের মুঠোয় আঁটি পড়তে তর সইছে না।

বাতাস কেটে শিসের শব্দ করে মাচার ওপর আছড়ে পড়ল ধানের আঁটি। মেঝের ওপর আঁচলসুদ্ধ চাবির গোছা পড়ার মতো শব্দ বাজল। ঝুরঝুর ধান

ঝড়ে পড়ল মাচার ওপর। বাখারির ফাঁক গলে বিছিয়ে গেল খামারে। কিছু ছিটকে গেল আশেপাশে। চারজনের হাতেধরা আঁটি উপর্যুপরি সজোরে আছড়ে পড়ছে মাচায়। হলুদ সরে মাচার নিচে খামারের মাটি ঢাকছে। বাতাসে সাঁতার কেটে ধানশূন্য খড়ের আঁটি খামারের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ছে টুপ-টাপ। একটার ওপর একটা। —পবনের হাতে ছোঁড়া আঁটিগুলোই পড়ছে সবচেয়ে দূরে। একজোড়া আঁটি পাশের আমগাছের ডালে আটকে ঝুলতে লাগল।

আসতে টান মারো—, ধমকে উঠল দীনবন্ধু।

এ্যাই ছ্যাকো— দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সাদা দাঁতের সারি দেখিয়ে হাসল পবন, বাসাতে উইড়ে নে গেলো— আমি কি করবো?

দীনবন্ধু জানে, এসব আসলে তার পেছনে লাগার ফন্দি। বিষ্টু, পবন দুজনেই প্রায় সমবয়সী। বিষ্টু নিজে কিছু করে না। ভালোমানুষের মতো থাকে। পবনের মাথায় ফন্দি যোগায়। তাকে রাগিয়ে গালমন্দ শুনতে চায়। বলল, আর কারো নাগচে না— তোমারটাতেই যতো বাতাস এসে ধরচে— না?

খামার জুড়ে বিরামহীন ধান আছড়াবার শব্দ। বাতাসে ভাসছে খড়ের কুচি। কুয়াশা কেটে চড়া রোদ ফুটেছে। চারজনের পোশাক ঘামে ভিজে উঠেছে। সকলের মাথা গামছা দিয়ে ঢাকা। গামছার একটা প্রান্ত পিঠের ওপর মেলে দেওয়া। খড়ের কুচি, ধানের শুঁয়ো থেকে শরীরের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা যথাসম্ভব। ধানের শুঁয়ো রোমকূপের মধ্যে বিঁধে থাকে। ঘামের নুন লেগে চুলকোয়।

পেছনে, খড়ের জালির উচ্চতা কমে মাটির ওপর মাত্র একটি পরতে এসে ঠেকেছে। সামনে, ধানঝাড়া খড়ের আঁটির স্তূপ। শেষ দুটো আঁটি পড়ল বিষ্টুর ভাগে। আঁটি দুটো ঝাড়া শেষ করে জামাকাপড়ে আটকে থাকা ধান, খড়কুটো খামারে ঝেড়ে ফেলে এসে দাঁড়াল সকলের সঙ্গে। নাক, গলা পরিষ্কার করল শব্দ করে। ধুলো মেশান ময়লা কফ্ উঠে এল জিভে। এখন একটু বিশ্রামের সময়। ধীরে সুস্থে আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি শেষ হতে যে-সময়টুকু লাগে।

দীনবন্ধু কাজের ধরন বদলাবার নির্দেশ দিল, এবার আমি আর ভজা জালি দেচ্চি। —তোরা দুজন পোয়াল টান।

মাচার তলায় ঝাড়া ধান চূড়ার মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। সঙ্গে মিশে রয়েছে খড়ের ছেঁড়া টুকরো, আঁটি থেকে খুলে পড়া ধানের শিষ। এসব এখন থেকে পরিষ্কার না করলে আবার নতুন করে ঝাড়া ধানের তলায় চাপা পড়বে। কুলোর

বাতাস দিয়ে হাতের নড়া ছিঁড়ে ফেললেও ধান পরিষ্কার হয় না ঠিক মতো।

পবনের পছন্দ হল না, ও বুড়ো-হাবড়ার কুঁড়ের কাজ আমরা কর্তে পারবোনি। আমরা গাদা ভেঙে জালি সাজাচ্চি— তোমরা পোয়াল টানো।

দীনবন্ধুর দিকে তাকিয়ে পবন তো হাসছেই। বিষ্টুও দাঁত বার করে রয়েছে। ভুজেন চোখে চোখ পড়তে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোবার চেষ্টা করছে। দীনবন্ধু জানে, এসব আসলে তাকে খুঁচিয়ে রাগিয়ে গালমন্দ, খিস্তি শোনার অছিলা। একঘেঁয়ে কাজের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা করে মনের বিশ্রাম। উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় গামছা বাঁধতে বাঁধতে বলল, হ্যা— হ্যা— কে কতো জোয়ান-মদ্দো ঘরের মাগের কাচে জিজ্ঞেস করলি বেইরে পড়বে।

জালি পাঁচেক ধান শেষ করতেই রোদ যেন গায়ে বিঁধতে লাগল। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ছে। সামনে ধানঝাড়া খড়ের স্তূপের উচ্চতা, পরিধি বেড়েছে অনেকখানি। বিড়িতে ধীরেসুস্থে টান দিতে দিতে দীনবন্ধু আন্দাজ নেবার চেষ্টা করেছিল, ক'কাহন ধান ঝাড়া হতে পারে।

ভুজেন বলল, মোড়োল জল খাবার নে এসো। —পেটে মোচড় ধরচে।

দীনবন্ধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখল। তারপর উঠে জলখাবার আনতে গেল ভেতর বাড়ি থেকে। ফিরে এলো পাতলা কাগজের প্যাকেট মোড়া চারটে পাউরুটি হাতে করে। পেছন পেছন একটা হলদে রঙের কুকুরও এসেছে বাড়ির ভেতর থেকে। দৃষ্টি হাতের পাউরুটির দিকে। সকলের দিকে একটা করে পাউরুটি এগিয়ে দিয়ে পবনের সামনে দাঁড়িয়ে দীনবন্ধু বলল, নে ধর।

আমি খাবো না।

কেন, হল কি তোর— দীনবন্ধু ধমক দিল, সকলের মুখে বোচচে— তোমার অতো কচালি কিসের জন্যি? —ধর।

ভুজেন, বিষ্টু কাগজের ঠোঙার ভেতর থেকে একটু করে পাউরুটি ছিঁড়ে চোয়াল নেড়ে চিবোচ্ছে। এদিকে তাকিয়ে কথাবার্তা শুনছে। কুকুরটা কয়েক হাত দূরে মাটিতে থাবা গেড়ে বসে বিষ্টু ভুজেনের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

নে ধর—, গলার স্বর নরম করে দীনবন্ধু বলল, সেই ভোররাতে দুটো খেয়ে বেইরেচিস—পিত্তি পড়বে। একটু থেমে বলল, কার ওপর রাগ করচিস তুই!

এ-বুড়ো কানের কাচে আচ্ছা ঠিকির-ঠিকির নাগালে তো, পবন ঝাঁঝিয়ে উঠে হাত বাড়াল, দাও—।

দীনবন্ধু পাউরুটি পবনের হাতে দিতেই পবন ছুঁড়ে দিল কুকুরটার দিকে। কুকুরটা অবাক হয়ে দেখল পাউরুটিটা। তারপর মুখে করে দৌড়ে পালাল।

থমথমে মুখে দীনবন্ধু নিজের হাতের পাউরুটি ছিঁড়ে মুখে দিতে লাগল।

রাস্তার ধারে টিউবওয়েলে জল খেয়ে এসে একটু বিশ্রাম। বিড়ি ধরিয়ে আস্তে আস্তে টান দিচ্ছে সকলে। গৃহস্থ এসে ঘুরে গেল এক-চক্কোর। বলল, ধানঝাড়া হল কৈ ? সেই সকাল থেকে মাস্তোর এই কাজ হল ? সাবধান করে গেল, খড়ে যেন ধান থেকে না যায়। সব গৃহস্থই বলে। ফুবোনে কাজ। যতো তাড়াতাড়ি হাতের আঁটি হাত থেকে ফেলে দেওয়া যায় ততই কাজের পড়তা। খড়ে ধান থেকে গেলে লোকসান গৃহস্থের।

গৃহস্থ চলে গেলে ভূজেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কবল, মোড়োল এখন কি ধান গোছানো হবে— ?

এতক্ষণ একটা কথা বলে নি দীনবন্ধু। এবার ফেটে পড়ল, তোমার কি— ? খোলে চাটি দে পরের বাড়ি চোব্য-চোষ্য করে এককাঁসী ভাত মারবা—। দিন গেলে আমার বাড়ি দু-কিলো চাল, এক-কিলো আটা নাগে। —যা ধান ঝাড়া হয়েচে তার মজুরিতে হবে এসব ?

মিনমিন করে ভূজেন বলল, না বলচিলাম এত গুলান ধান বাতাস দে পোস্কার কর্তে রয়েচে। ঘরে ধান তোলতে রযেচে। বিচুলির তড়পা বাঁধা। গুনে নাট দেওয়া। —আন্তির হয়ে যাবে না ?

হয় হোক। আন্তির গহোন হোক। আরো দু-জালি ধান ঝাড়তে হবে—, দীনবন্ধু কোমরে হাত দিয়ে তিন জনের মুখোমুখি যেন রুখে দাঁড়াল, যার না পোষায় চলে যাক দল ছেড়ে। নিজের মাগের কাছে গে মেজাজ দেখাক।

সকলেই জানে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল দীনবন্ধু।

পবন উঠে দাঁড়াল সকলের আগে। ধানের গাদা থেকে খড় বাড় করতে লাগল নতুন করে জালি দেবার জন্যে।

দু-জালি ধান ঝাড়া শেষ করতে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। খামারটা দেখাচ্ছে যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত। এলোমেলো ছড়িযে রয়েছে খড়ের আঁটি। হাঁটুভর পোয়াল জমে উঠেছে। সামনে খড়ের স্তূপ। বাড়ির ভেতর থেকে গৃহস্থের কিষাণ এসে কুলো, ধামা, বাণ্ডিল পাকানো থলে রেখে গেল। ধামা, কুলো লাগবে ধান পরিষ্কার করতে। পরিষ্কার ধান বস্তাতে ভরে ঘরে রেখে আসতে থলের বাণ্ডিল।

ধান ঝাড়া শেষ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিল সকলেই। দীনবন্ধু উঠল। নিজেই ঝাঁটা নিয়ে খসর-খসর করে ঝাঁটা চালিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল খামারের একটা অংশ। কুলোর বাতাস নিয়ে ধান পরিষ্কার

হবে ওখানে। বিষ্টু, ভুজেন হাতে কুলো তুলে নিয়েছে। ধামায় ধান ভর্তি করছে পবন। পরিষ্কার করা জায়গা মাঝখানে রেখে তিনজনে দাঁড়িয়েছে তিন দিক ঘিরে। পবন ধামা ভর্তি ধান হাত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল উঁচু করে। গোল ছাতার মতো আকার নিয়ে ধামা ভর্তি ধান খামারে পড়ার আগেই তিন জনের হাতের কুলো ঝাপটা দিয়ে ঝড় তুলল বাতাসে। উড়ে যাচ্ছে ধানের ধুলো, খড়ের কুচি, শূন্যগর্ভ চিটে ধান। ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুলো উড়ছে আকাশে। মাথায় বাঁধা গামছা খুলে নিয়ে নাকেমুখে জড়িয়ে নিয়েছে চার জনেই। তবু ধুলো ঢুকছে নাকে। ধানের শুঁয়ো গিয়ে বিঁধছে কণ্ঠনালীতে। কাশছে। সবে গিয়ে ধুলোয় কালো কফ ফেলে আসছে খামারেব বাইরে। চার জনের মাঝখানে পরিষ্কার ধান চূড়ো হয়ে উঠেছে। বাতাসে কুলোর ঝাপটায় ঝড় তুলে ধানের চুড়ো ঘিবে বৃত্তাকাবে সমান গতিতে, এতকালে ঘুবছে তিন জনে। ভুজেনের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে দীনবন্ধু, বিষ্টুর জায়গায় ভুজেন। —থামছে সামান্য সময়ের জন্যে। ধামা ভর্তি ধান নিয়ে আসছে পবন। ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্চে আকাশমুখো। কুলো বাতাস কাটছে সাঁইসাঁই।

কেউ সামান্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। চড়াৎ করে শব্দ হল। ওপর থেকে পড়া ধান কুলোয় লেগে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। গামছার ফাঁক দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল দীনবন্ধু, সামলে— ।

ছাতার আকার নিয়ে ধান পড়ছে খামারে।

কুলোয় বাতাস কাটছে সাঁইসাঁই।

ধুলো উড়ছে ধোঁয়ার মতো।

গ্রামের ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজছে। —বেলা গেল।

শস্যশূন্য মাঠের মধ্যে পা-চল সিঁথিপথ দিয়ে আগেপিছে হাঁটছে চারজন। অন্ধকার পক্ষ যাচ্ছে। তারার চুমকি বসানো ভারি জমকালো পোশাক পরেছে আজকের আকাশ। গ্রামের উনুনের যত ধোঁয়া মাঠে বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জায়গা নিয়ে।

মাঠে নেমে বউমরা ভুজেন গলা ছেড়ে গান ধরেছে, ও আমার ম-ও-ন পাখি/ও আমার প্রা-হা-ণ পাখি/তোমার সঙ্গে কথা ছিল কি—

পায়ের সাড়া পেয়ে ছুটে আলের গর্তে গিয়ে ঢুকছে মেঠো ইঁদুর। কিটকিট শব্দ তুলে ধানের শুকনো নাড়ার মধ্যে থেকে উড়ে যাচ্ছে, উচ্চিংড়ে, ফড়িং। বাতাস ঘন করে ঝিঁঝিঁ ডাকছে বিরাম, বিরতিহীন।

বেশ খানিকটা এগিয়ে চলেছে দীনবন্ধু। মাথার ঠিক ওপরেই ধোঁয়ার চাঁদোয়া। একসঙ্গে অনেক চিন্তার জট মাথায়। —হাটে দোকানটা খোলা পাবে তো! মুর্শিদাবাদের আউশ ধানের চাল আনে দোকানে। মোটা লাল রঙের চাল। শক্ত করে ভাত রাঁধলে পেটে থাকে অনেকক্ষণ। মাথাপ্রতি খোরাকি লাগে কম। দরেও সস্তা পড়ে কিছু। আজকের যা মজুরী হয়েছে তাতে সেই পুরোনো কাসুন্দি। চাল কিনতে আটা কেনার পংসা থাকে না। তার ওপর নুন, তেল। এখন আফশোস হচ্ছে—। সকালে আগুন পুইয়ে অতোখানি বেলা নষ্ট না করলে কিছু মজুরী বাড়ানো যেত। মন্দের ভালো, দর কম হলেও কাজটা চলবে কদিন। গতরে খেটে দরের কমতা পুষিয়ে নিতে হবে। পরের দিন কী করে চলবে ভেবে জেগে রাতভোর করার দুর্ভোগ থেকে কদিন রেহাই মিললো।

পবন হাঁটছে সকলের পেছনে। তার সামনে বিষ্টু।

পবন—, কি খাচ্চিস রে — ?

অন্ধকারে পবন বাঁ-হাত তুলে দেখাল। পোয়াল হাঁটকে ক'ছড়া ধানের শিষ নিয়ে এসেছে। তার থেকে চলতে চলতে একটা করে ধান ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে।

আমায় দে একছড়া—।

ও ভজাদা—, পবন পেছন থেকে হাঁক দিল, চুপ করলে কেন? বেশ হচ্চিলো তো। লতুন করে ধরো একখানা—।

পেটে পাক মারলি কি গলায় গান আসে—, বলতে বলতে পেটের মধ্যে কলকল ডাক উঠল। ভুজেন বলল, অ-ই, মহাপ্রাণী আড় ভাঙলেন আবার— !

ভুজেনের হাতে ধানের ছড়া ধরিয়ে দিয়ে হনহন হেঁটে দীনবন্ধুকে ধরল পবন, নাও মোড়ল,—ধরো।

কি—, দীনবন্ধু আড়চোখে পবনের হাতের দিকে তাকিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

কি হল ? ধরো—। দাঁতে কাটতি কাটতি চলো। পেটের মোচোড় চাপা পড়বে।

পবনা মেজাদ নরম কর, মেজাদ নরম কর। বিষম বেপদে পড়ে যাবি।

তুমি সামাল দেবা—। মাতার ওপর তোমায় মোড়োল বসিয়েচি তবে কি কর্তে ?

অন্ধকারে সাদা দাঁতের সারি বার করে হাসছে পবন। কানে টগরফুল

পরেছিল কোন সকালে। শুথিয়ে কানে লেগে রয়েছে এখনো।

চারজনে এখন পথ হাঁটছে গায়ে গায়ে। অন্ধকারে দাঁতে ধান কাটার কুটকুট শব্দ। জিভের ডগা দিয়ে খোসা ছিটিয়ে ফেলছে মাঠে। দাঁতের চাপে চাল গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মুখের ভেতরে লালার কোষেরা সমস্ত অর্গল খুলে দিয়েছে। লালা জমে ভরে যাচ্ছে মুখ। চালের গুঁড়ো লালায় ভিজে জিভ আঠালো ভারি করে তুলছে।

নাচের পুতুল

ল্যাচের হাতলে মোচড় দিয়ে দরজা খুলতে যাচ্ছে, দু-হাতের বেষ্টনে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল বিষাণ। অপছন্দ, বিরক্তি লাগছিল। তবু মালতী ঠিক তখনি বাধা দিল না। বিষাণের হাতে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিল নিজেকে।

ডানহাতের মুঠোয় ল্যাচের হাতল। চোখের সামনে দরজার বন্ধ পাল্লা। প্যাসেজের আলো নেভানো। বসার ঘরে কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। দরজা দিয়ে আলো পড়েছে প্যাসেজে। রাত প্রায় বারোটা। ল্যাচের হাতলে হাত দেবার আগে পাল্লার 'পিপহোল' দিয়ে মালতী বাইরেটা আগেই দেখে নিয়েছে। — বাগানের বাইরে রাস্তা-নির্জন। লাইটপোস্টের নগ্ন-বাল্ব হলদে হয়ে জ্বলছে। নিঃশব্দে কখন ফিসফিস করে একটু বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছায়ান্ধকার, ভেজা, ভূতুড়ে দেখাচ্ছে রাস্তাটা।

মাথার খোঁপা বিষাণের কাঁধ ছুঁয়ে। শরীরে লেপটে এসেছে শরীর। ঘাড়, গলা, কাঁধের অনাবৃত অংশে বিষাণ ঠোঁট বোলাচ্ছে। গরম প্রশ্বাস লাগছে। বিষাণের শরীরের পেশীরা দৃঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ। আলিঙ্গনের চাপ, উষ্ণতা বাড়ছে। মালতীর নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া সমর্থন মনে করে বিষাণ যেন আবার একটা উত্তপ্ত মুহূর্ত তৈরি করতে চাইছে প্রাণপণে।

ছাড়ো —, নিজেকে ছাড়িয়ে হাতলে মোচড় দিল মালতী। মৃদু শব্দে লিভার সরে ফাটল ধরল পাল্লার জোড়ে। দরজার নিচে সিঁড়ি। দোতলার ঝুলবারান্দার নক্সার সঙ্গে সমতা রেখে অর্ধবৃত্তাকার। তিনটে ধাপ ভেঙে বাগানের রাস্তা। ফুট কুড়ি হেঁটে গ্রিলের গেট। মালতীর বাঁ-হাতে লোহার চেনে লাগান টিপ্‌তালা। তালা সমেত চেন এগিয়ে দিল বিষাণের দিকে। গেট বন্ধ করে চেন জড়িয়ে তালা টিপে দিয়ে যাবে যাবার সময়।

বেরিয়ে পড়ো —।

বিষাণের যাবার জায়গা ছেড়ে মালতী দেয়াল ঘেষে দাঁড়াল। দরজার দিকে বিষাণের মুখ ফেরানো। তারের মতো সোজা, শক্ত চুল ঘাড়ের নীচ অবধি। মাথার তেলে, ঘামে চকচক করছে মুখ। পুরু ঠোঁট। মোটা জুল্‌ফি নেমে এসেছে

কানের নিচ অবধি। মেরুন রঙের জমির ওপর হলদে সুতোর কাজ করা পাঞ্জাবি গায়ে। বুকের বোতাম থাকে না এসব পাঞ্জাবির। রোমশ বুকের অনেকখানি অনাবৃত। চওড়া, ছড়ানো কাঁধ। নাকের পাশ থেকে গালের ওপর দিয়ে টানা শুকনো ক্ষতচিহ্ন। বোমার টুকরো মাংস কেটে বেরিয়ে গেছিল। যে-ঘরে বোমা বাঁধা হচ্ছিল, সেই ঘবেব অন্যদিকে বসে গল্প করছিল বিষাণ, দলের কয়েকজন। মুহূর্তের অসতর্কতায় বোমা ফাটে যে বোমা বাঁধছিল তার হাতের মধ্যেই। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাশে রাখা আরো দুটো তাজা বোমা ফাটে একই সঙ্গে। মাথার ওপর খাপবার চাল পুরোটা উড়ে যায। যে বোমা বাঁধছিল, সে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ। ঘরের সকলেই কম-বেশি আহত। বিষাণের আঘাতই সবচেয়ে বেশি। মুখ ছাড়াও পিঠে, হাতে, গভীব ক্ষত আরও তিনটে। তল্লাট ছাড়া সকলেই। গণপতি কি-সব ব্যবস্থা করে সকলকেই এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল একে একে। বিষাণকে আনতে হযেছিল সব শেষে। প্রায সাত মাস পরে। বিষাণেব ওপব পুলিশের আগে থেকে নজব —। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এম এল এ-কে দিযে পুলিশের ওপর চাপ তৈরি করছিল নাটের গুরুকে ধরার জন্য। তাছাড়া, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলেব চাঁই যোগী সিং, আকস্মিক ঘটনাটা থেকে ফয়দা তুলে নিতে চাইছিল যথা সম্ভব। রেলের ইয়ার্ডের দখল নিয়ে বিষাণ তখন তাকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছে। যোগী সিং-এর ডান হাত হীরা তার দল নিয়ে ইয়ার্ডের একেবারে দক্ষিণ কোনে কোন রকমে টিকে রয়েছে মাত্র। যোগী সিং এও বুঝেছিল, মালগাড়ি থেকে রেলেব কয়লা খালাস, রেলের ইঞ্জিনের ছাই ফেলে নতুন করে কয়লা বোঝাই করে ইঞ্জিন প্রস্তুত করার এতো দিনের শাঁশজল ভরা কণ্টাক্টটা বোধহয় আর হাতে রাখতে পারল না। কচ্ছপের কামড়ের মতো কামড়ে ধরেছিল অবস্থাটাকে। দৌড়াদৌড়ি, যথাস্থানে জলের মতো টাকা ঢালতে কসুর করেনি।

বোধহয় চাঁদা দেবার শাঁশালো পার্টি হিসাবে গণপতির মুখেব দিকে তাকিয়ে বামপন্থী দল প্রথম দিকে চুপ করেই ছিল। হাওয়ার বেগ বাড়তে তারা আর হাওয়ায় উজান ঠেলতে ভরসা পায় নি। মিছিলে শ্লোগান তুলেছিল, পুলিশের নিক্রিয়তার বিরুদ্ধে। রাগ চেপে, মাথা গরম না-করে গণপতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অপেক্ষা করতে হয়েছিল, হাওয়া জুড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত। সে সময় দেড়টা বছর গণপতির খুব খারাপ সময় গেছে।…হীরাকে হটিয়ে রেলের ইয়ার্ডের বটতলা পর্যন্ত দখল কায়েম করে এনেছিল বিষাণ। বাকি ছিল লেভেল ক্রসিংয়ের গেট। রোজ রাত ন'টার মধ্যে যে যেখানেই

থাবুক বাড়ি ফিরে আসত বটতলা কলোনীর লোক। সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে, আটেকাটে দরজা-জানলা বন্ধ করে বিছানায়। দারুন গরমেও জানালা খোলার উপায় নেই। রাত দশটা পর্যন্ত একটা নিস্তব্ধ, অস্বস্তিকর, দীর্ঘ সময়। ঠিক রাত দশটায় এ্যাকশান স্বরু —। প্রথম বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেত। তারপর রাত তিনটে পর্যন্ত একটানা —। রেল-লাইনের এপারে শহরের লোক নাম দিয়েছিল, টেক্সাস্ —। বিষাপার্টি আর হীরাপার্টির রেল-ইয়ার্ডের মাটি দখলের লড়াই। রাত্রে বিছানায় নিরাপদে শুয়ে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ শুনে শহরের লোক একটা চাপা গর্ব অনুভব করত। বিষাণ শহরের ছেলে। হীরা ওপাশের মহল্লার। রেলের ইয়ার্ড বরাবরই মহল্লার পার্টির দখলে। এই প্রথম এ-শহরের একটা ছেলে ইয়ার্ডের দখল নিচ্ছে। ফুটবল খেলার মতো ব্যাপার হলে, বিষাণ ইঞ্চি ইঞ্চি এগুচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়লে, পট্‌কা ফাটতো। বিষাণ লেভেল ক্রশিং নিয়েছে খবর পেলে, শাঁখ বাজত, পতাকা উড়তো, সারারাত মাইক বাজিয়ে ফিস্ট্।

বটতলা পর্যন্ত এগিয়ে বিষাণ দাঁড়িয়ে গেল। লেভেল-ক্রসিং পর্যন্ত এগুতে হবে। ফাঁকা করে ফেলতে হবে জায়গাটা। ইঞ্জিনের ছাই ফেলার চৌবাচ্চা, কয়লা বোঝাইয়ের ক্রেন্ ওখানে। রেলের বাবু, ইউনিয়ন লিডার, দলের সর্দার — সকলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে কাজ পাকা করে রেখেছে গণপতি ভেতরে ভেতরে। দাবী-টাবি নিয়ে ঝঞ্ঝাট্ পাকিযে আটাদন কাজ বন্ধ রাখতে পারলেই রেলের আইনে যোগী সিং-এর কণ্ট্রাক্ট্ বাতিল। রেলের ঘরে সিকিউরিটির টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত। জায়গাটা দখলে আনতে না-পারলে গণপতির সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ। হীরার দলের পাহারায় যোগী সিং সাতদিনের আগেই বন্ধ ভেঙে দিতে পারে। —রোজ বৃষ্টির মতো বোমা ছুঁড়েও আর এগুতে পারছে না বিষাণ।

একদিন রতন এলো। আগে কখনো রতনকে দেখেনি মালতী। নাম শুনেছে। — শরীর তত মজবুত নয়। চোখ দেখলে বোঝা যায় মাথায় বুদ্ধি ধরে। চেহারা, পোশাকে বিষাণের থেকে আলাদা। মালতী শুনেছে, রতনই নাকি দলের ব্রেন। তার পরামর্শেই বিষাণ দল চালায়। ঘরে অনেকক্ষণ ধরে গণপতির সঙ্গে কথা হচ্ছিল রতনের। বেশ রাত। ঘরের টিউবলাইট দাউদাউ জ্বলছে। মালতী বিরক্তিতে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে গণপতির জন্য অপেক্ষা করতে করতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। স্টিলের আলমারি খোলার শব্দে চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে মশারির মধ্যে থেকে দেখেছিল, গণপতি

আলমারি খুলেছে। ভেতরের লকার খোলার শব্দে বুঝল, টাকা বার করছে।

তারপর আর এগিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি বিষাণের। ওর কাছ থেকেই মালতী জেনেছিল, খুব আফশোষ বিষাণের—। ঠিকমত ব্যবহার করা গেলনা জিনিশটা। বিহার থেকে আমদানি। সেলফ্ লোডিং রাইফেল্। একসঙ্গে আশিটা গুলি উগ্রোয়। খালের উঁচু বাঁধ লক্ষ করে শুধু দু দিন হীরাকে আওয়াজ শুনিয়েছিল। তাতেই কাজ হাসিল। হীরা কাপড়ে-চোপড়ে—।

ঠিক এই সময়, এই অবস্থায় বিস্ফোরণের ঘটনা।

গণপতি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। চোয়ালে চোয়াল চেপে হজম করল। দু বছর সময় লেগেছিল, যোগী সিং-এর হাত থেকে রেলের কন্ট্রাক্ট নিজের হাতে আনতে।

নিচেব তলায় কেউ নেই যে শুনতে পাবে। গলা নামিয়ে বিষাণ বলল, কাল আসব। সাড়ে-দশটা নাগাদ।

বিষাণের চাপা স্বর, বলাব ভঙ্গিতে হঠাৎ মালতীর কান তেতে উঠল। অস্বস্তি হল। কিন্তু কিছু বলার নেই —। বুঝল, রাগ উঠে আসছে। —আদেশ, দাবী? বিষাণের মর্জি মতো চলতে হবে নাকি? তাকে ভাবে কী ও? কঠিন গলায় মালতী বলল, না।

কেন? গনুদার ফিরতে তো পরশু —?

বিষাণের গলার স্বরে বিস্ময়, না-বোঝা ভাব। যেন খুব সরল ভাবে জানতে চাইছে, গণপতি নেই। সে আসবে না কেন? বাধছে কিসে? ...একটু আগের রাগ ঝাঁঝ হারিয়ে ফেলছে। আবার মালতীর এও মনে হচ্ছে, উপলক্ষ যাই থাক সেই-ই তো ধরতে গেলে পরোক্ষে ডেকে আনিয়েছে বিষাণকে। —বিষাণ চাবি দিতে এসেছিল। যেমন আসে, একটু রাত করে এসেছে। তারপর রুটিন মতো হয়ে গেলো সবকিছু।

কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে গণপতি বলেছিল, সকালের ট্রেনে বাইরে যাব। ফিরতে শনিবার রাত। বিষাণকে ডাকিয়ে চাবি দিয়ে দিও।

চাবি বলতে গণপতির 'দত্ত এন্টারপ্রাইজের' অফিসের আলমারি, সিমেন্টের গুদামের চাবি। গণপতি থাকছেনা। মুহুরি মশাইয়ের যাতে কাজ চালাতে অসুবিধা না-হয় তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়। এ-অঞ্চলে চুনের ডিলার, আশ-পাশের কটা মিল-কারখানার পাথর কুচির সরবরাহক গণপতির কোম্পানি। প্রতিমাসেই দু-একবার সাত্না, পাকুড় যাতায়াত করতে হয়। বিষাণকে চাবি দেবার দায়িত্ব পড়ে মালতীর ওপর। বিষাণ সকালে চাবি

নিয়ে যায়। আবার রাত্রে চাবি পৌঁছে দেয়। গণপতি চাবি রাত্রে অন্য কারো কাছে থাকা পছন্দ করেন না।

মালতী বিরক্তি দেখিয়েছিল, এতোক্ষণ তো তোমার সঙ্গেই ছিল। বলে এলেই পারতে সকালে বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে।

উত্তর না-দিয়ে গণপতি পাশ ফিরে শুয়েছিল, কোথায় যাচ্ছি বলার দরকার নেই। বোলো ফিরতে পরশু হবে।

পায়ের দিকের জানালার বাইরে তাকালে গঙ্গার ওপারে টেলিকমিউ-নিকেশান্ টাওয়ারের আলো চোখে পড়ে। অন্ধকারে লাল আলো দপদপ করে জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে মালতীর আবারও মনে হয়েছিল, গণপতি আজকাল অনেক কিছু গোপন রাখতে চায় বিষাণের কাছে।

টিঙ্কুর স্কুলের প্রেয়ার-লাইন সকাল সাড়ে-ছটায়। মাসকাবারি চুক্তির সাইকেল রিক্সায় মালতী মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়। ফেরার পথে বাজার —। রিক্সা দাঁড় করিয়ে একেবারে আমিষ-নিরামিষ কাঁচাবাজার সেরে বাড়ি ফেরে।

সামান্য ঘুরপথে রেল-ইয়ার্ডের পাশে গণপতির 'দত্ত এণ্টারপ্রাইজ'। চুন-সুরকি-পাথর কুচির গোলা। সিমেণ্টের গুদাম। দু-খানা লরির গ্যারাজ্। মালতী গেটের সামনে রিক্সা দাঁড় কবিয়েছিল। দরোয়ান জটায়ু কূয়ার পাশে বসে দাঁতন মুখে ঘষেঘষে লোটা মাজছে। দুবার বেশ জোরে হর্ন বাজিয়েছিল রিক্সাওয়ালা। গেটের দিকে তাকিয়ে দেখে জটায়ু অফিস ঘরের দিকে যাচ্ছে গেটের চাবি আনতে।

ওকে ডাকতো —, মালতী রিক্সাওয়ালাকে বলেছিল, বলো চাবি আনতে হবে না। এদিকে আসতে।

রিক্সাওয়ালা বাঙালি। দু'বার হর্ন বাজিয়ে রগড় করে ডাকল, এ জটায়ু —। চাবি লে আনেকা জরুরথ নেই থে। ইধার শুনো হো।

গেটের ওধারে জটায়ু। গতকাল রাতের গাঁজার ঘোরে দুটো চোখ তখনো লাল।

শোনো —, মালতি রিক্সা থেকে বলেছিল, বাবু আজ সকালে বাইরে গেছেন। বাড়িতে চাবি আছে। বিষাণবাবু এলে বলে দিও বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে আসতে।

জী···, মাজী।

চলো—, রিক্সাওয়ালাকে বলেছিল মালতী। জটায়ুকে আর একবার বলল, ভুলোনা যেন।

বিষাণের দিকে চোখ পড়তে মালতী দেখল, মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে একটু বুদ্ধির আঁশও লেগে নেই। ছোটবেলায় নাকি পরপর তিনবার টাইফয়েড হয়েছিল। নিরাময়ের পর অসুখ স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে মস্তিকে। কঠিন করে না বলা মনে পড়ল। মালতী দু-চোখে কৌতুক এনে অপাঙ্গে তাকাল, ভ্যাট্— রোজরোজ।—না ?

চোখ মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় মালতীর উত্তর বিষাণকে খুশি করতে পারে নি। থমথমে মুখ। মালতী এগিয়ে এসে বিষাণের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর মিশিয়ে দাঁড়াল। সামান্য চাপ দিল। যেই বুঝল, বিষাণের একটা হাত উঠে আসছে—সরিয়ে নিল নিজেকে !

বেরিয়ে পড়ো।

হাতে চেন-তালা নিয়ে বিষাণ দরজা গলে বেরুতে যাচ্ছে, দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। বিষাণ থমকে দাঁড়িয়েছে।

চার-নম্বর ট্যাঙ্কের দিকে ফাটছে—, মালতী গলার স্বরে তাচ্ছিল্য এনে বিষাণকে আশ্বস্ত কয়তে চাইল।

বিষাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, মালতী হাত বাড়িয়ে বিষাণের হাত স্পর্শ করে ছোট্ট করে হাসল। —একটু বিদায়-মুহূর্তে বিষাণের উপরি পাওনার মধ্যে পড়ে। ভবিষ্যতে আবার একটা উত্তাপময় সময়ের প্রতিশ্রুতিও হয়ত।

রাস্তার ছায়ান্ধকারে অশরীরীর মতো মিলিয়ে গেল বিষাণ।

মালতী আঁচল টেনে চাবির গোছা হাতে নিল। দরজার পাল্লায় পেতলের লম্বা ছিটকিনি তুলে দিল। ল্যাচের সেফটি লিভার। টাওয়ার বোল্ট্ টেনে বড়ো নবতাল। টেনে দেখল ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা। প্যাসেজ থেকে বসার ঘর। ঘরে ফুল স্পীডে পাখা ঘুরছে। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। টিউব লাইটের স্যুইচ টিপে দিল। দুবার পিটপিট করে জ্বলে উঠল। ঘরের চার দেওয়ালে তিন রকমের রং। মসৃণ দেওয়ালে মাদুর কাঠির ক্যালেণ্ডার। মোজেকের মেঝে। মাঝখানে পাখার তলায় কার্পেটের ওপর সোফাসেট্, সেণ্টার টেবিল। বইয়ের আলমারিতে বাঁধাই রামকৃষ্ণ কথামৃত, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, —কৃষ্ণনগরের পুতুল। ওপরে বাঁকুড়ার ঘোড়া। ওপাশে রঙিন টি ভি সেট্। টি ভি সেটের ওপর মোরাদাবাদী রেকাবির ওপর ফুলদানীতে বাগানে পাতাবাহারের পাতার সঙ্গে রঙ্গন, রজনীগন্ধা। ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজর গেল, লোহার রড দিয়ে নক্সা করে বানানো নিচু চৌকির দিকে। কাশ্মীরি গালচে পাতা। সোফা থেকে একটা কুশান নিয়েছিল মাথায় দেবার জন্য। অন্য মনস্ক ভঙ্গিতে সেটা হাতে

তুলে খুঁটিয়ে গালচেটা দেখল। মাথার কাঁটা পেল একটা। তুলে নিল। কুশনটা যথাস্থানে রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে মালতী দেখল, জানলাগুলো ঠিক মতো বন্ধ কিনা। আলো, পাখা নিভিয়ে বাইরে এসে দরজা টেনে দিল। ল্যাচের লিভার পড়ল। টাওয়ার বোল্টের তলায় চাবি ঘোরাল।

একতলায় বসার ঘর, ডাইনিং স্পেস, প্যাসেজ, সিঁড়ি বাথরুম-টাথরুম মিলিয়ে ষোলোশো আশি স্কোয়ার ফুট ঢাকা জায়গা। মালতী সব দরজা উপযুক্ত ভাবে বন্ধ কিনা দেখে নিল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কোলাপসিপল্ গেট। দেখতে খুবই বেমানান। তবু সর্তকতার কথা চিন্তা করে অপছন্দ হলেও রাখতে হয়েছে। তালাটালা ভেঙে চোর ছ্যাঁচোড় একতলায় ঢুকলেও দোতলায় ওঠার মুখে কোলাপসিপল গেটের বাধা। ঠিক একই কারণে দোতলায় সিঁড়ির মুখে একটা গ্রিলের গেটও রাখতে হয়েছে। কোলাপসিপাল গেট বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ি ভাঙতে মালতীর সমস্ত শরীর নিংড়ে হাই উঠল। সিঁড়ি যেন আর শেষ হতে চায় না। দোতলার সিঁড়ির মুখে গ্রিলের গেট। মালতী গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল। যেদিন গণপতি থাকে না, বিষাণ আসে— সেদিন নিচে নামার সময় গ্রিলের গেটে তালা দিয়ে নামতে হয় মালতীকে—। রাজার বয়েস, দশ। টিঙ্কু ছয়ে পড়ল। হঠাৎ ঘুমভেঙে মার সাড়া না পেয়ে যদি নিচে নেমে আসে! সাবধান থাকতে হয়।

ছেলে মেয়ের ঘরে নীল আলো জ্বলছে। মালতী মশারির বাইরে থেকে দেখল, দু-জনেই অঘোর ঘুমে। রাজার কনুই বিশ্রীভাবে রয়েছে টিঙ্কুর নাকের কাছে। মুখে লাগতে পারে। মালতী মশারি তুলে রাজার হাত সরিয়ে দিল। টিঙ্কু ঘুমিয়ে কাদার তাল হয়ে আছে। তাকে ঠিকমতো শোয়াতে অসুবিধা হল না। রাজাকে সরাতে গিয়ে ঘুমের মধ্যে প্রবল আপত্তি।

ও— হোঃ, মালতী জোর করে সরিয়ে শোয়াল, ঠিক করে শুতে কি হয়।

পাশের ঘর মালতী, গণপতির। দু-ঘরের মাঝখানের দরজায় পুরু পর্দা! ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ। জানলার কাচের শার্শি নেহাৎ অসুবিধা না হলে খোলার উপায় নেই। মাইল খানেক দূরে গঙ্গার ধার ঘেঁসে বিশাল এলাকা নিয়ে থার্মাল পাওয়ার হাউস। ছটা চিমনির মধ্যে চারটে দিয়ে গলগল কালো ধোঁয়া উগরোচ্ছে সব সময়। এ শহরের মাথার ওপর ধোঁয়ার চাঁদোয়া। বাসিন্দাদের প্রতিটি চুলের গোড়ায়, পোশাকের পাটেপাটে, ফুসফুসের ভাঁজে কয়লার গুড়ো। বাড়ির বাইরের দিকের জানালা খোলা রাখলেই ঘরে ঢোকে

অদৃশ্য ধোঁয়ার মেঘ। বিছানা, আসবাব, মেঝে সব জায়গায় কিচকিচে কয়লার গুঁড়োর আস্তর। ছাদে উঠলে পায়ের তলার কালো ছাপ তুলতে সাবান, ছোব্ড়া লাগে।

ঘরের বন্ধ বাতাস যেন চেপে ধরল—। মালতী স্বইচ্ বোর্ডের কাছে গিয়ে পাখার স্বইচ্ টিপে দিল। দমচাপা ভাব কাটলেও গুমোট্ যায় না। মালতী দক্ষিণদিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শার্শির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকার আকাশের গায়ে চারটে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আজ আর এদিকে ধোঁয়া আসছেনা। পূর্বদিক থেকে হাওয়া বইছে। গঙ্গার ওপর দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। শার্শির পাল্লা খুলে দিল জানালার। হু হু হাওয়া ঢুকল ঘরে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আজ খুব নিশ্চিন্ত লাগল মালতীর।— পাওয়ার রয়েছে। জানালা খুলে শোয়া যাবে। কাল ছেলেমেয়ের স্কুলের ছুটি। গণপতি বাড়ি নেই। কাল বেলা করে উঠলেও কিছু এসে যাচ্ছে না। ছোট্ট খিঁচ অবশ্য একটা থেকেই যাচ্ছে। ঠিক ছটায় বাইরের গেটের তালা-চেন ধরে আওয়াজ করবে ঝি রমলা। বিছানা ছেড়ে উঠে এতগুলো তালা খোলা—, তারপরেও তো খানিকক্ষণ বিছানায় গড়ানো যাবে।

বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো।

মালতী ঠিক বুঝতে পারল না শব্দটা এবার কোন দিক থেকে এলো। চার নম্বর ট্যাঙ্কের দিক থেকে না পাওয়ার হাউসের দিক থেকে। চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে গঙ্গার ওপার থেকে চোলাই-চালানের ঠেক। নিত্য গোলমাল, বোমাবাজি লেগেই আছে। পাওয়ার হাউসের কাছে ওয়াগানের কয়লার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে একই ব্যাপাব।

চিমনিগুলোর দিকে তাকিয়ে মালতীর মনে পড়ল, রেলের কনট্রাক্টটা পাওয়ার পর গণপতির নজর পড়েছে পাওয়ার হাউসের ওপর। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পাওয়ার হাউসের আটটা বয়লারে প্রতিদিন টনটন কয়লা পোড়ে। কয়লা পুড়ে অবশেষে থাকে, ছাই। নিজের চৌহদ্দি থেকে ছাই সরিয়ে নিয়ে যাবার কন্ট্রাক্ট দেয় পাওয়ার হাউস। লরি লাগিয়ে, প্রতিদিনের জমা ছাই বার করে নিয়ে যেতে হয় পাওয়ার হাউসের এলাকা থেকে। বাজারে এই ছাইয়ের এখন দারুণ চাহিদা। হু হু করে শহর বাড়ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। পুকুর, ডোবা, নীচু ধানের জমি ভরাট করে বসবাসের জায়গা হচ্ছে। বাড়ি উঠছে একের পর এক। জমি ভরাট, উঁচু করতে এ অঞ্চলে সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিষ— পাওয়ার হাউসের ছাই। ছাই কলে পেষাই হয়ে হচ্ছে, যেষ।— চুন মিশিয়ে বাড়ির ইটের গাঁথনির

ঝশলা। সিমেন্টের দরের জন্য হিমসিম বাজেটের-বাড়ি করিয়েরা হামলে পড়েছে ঘোষের ওপর।

গণপতিকে দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখে ভাবতে হচ্ছে দুটি কারণে। এক তো যার হাতে বর্তমানে পাওয়ার হাউসের ছাই সরাবার কন্ট্রাক্ট— সে দেশের শাসক দলের এ অঞ্চলের এম এল এ-র ভাগ্নে। শহরের কানাঘুষো, বেনামে কন্ট্রাক্ট, আসলে ভাগনের মামার। দ্বিতীয়, পাওয়ার হাউস একেবারে মহল্লার হৃৎপিণ্ডের ওপর। হীরার এলাকা। জায়গাটাকে প্রায় দুর্গ করে রেখেছে হীরা। রেলের ইয়ার্ড থেকে সরে আসার পর নিজের এলাকা হাতে রাখতে মরিয়া। পাওয়ার হাউসের ঠিক গেটের সামনে চায়ের দোকানের বাইরে সবসময় টুল পেতে বসে থা ক হীরার লোক। প্রতিটি ছাই বোঝাই লরি গেটের বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধারে লরি দাঁড় করায়। ড্রাইভার নেমে প্রণামী দিয়ে যায় লোকটার হাতে। এখনো কোনো রাজনীতি নেই, দল বা পুলিশ নেই। কারবার চালাতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব হীরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছে মশারি তুলে বিছানায় উঠে মালতীর হঠাৎ মনে পড়ল, গণপতিকে এবার যাবার সময় তো জিজ্ঞেস করা হয়নি— সঙ্গে রতন যাচ্ছে কিনা! যোগী সিং এর হাত থেকে রেলের কন্ট্রাক্ট হাতে আসার পর থেকে গণপতি যেন একটু সাবধান হয়েছে। একা বাইরে-টাইরে যায় না। সঙ্গে কেউ থাকে এক জন। আগে সঙ্গে থাকত বিষাণ। ও গেলে এদিকের কাজের নাকি নানান্ অসুবিধা। আজকাল রতন যাচ্ছে সঙ্গে। ব্যাপারটা মালতী অপছন্দ করেনি। গণপতির নিরাপত্তার দিক চিন্তা করলে— ভালই।

ডাক্তার বললেন, বেড্ রেস্ট্।

মালতী দেখল, গণপতি হাসছে। কে বলবে এই মানুষের মুখের রং মাত্র কিছুক্ষণ আগে পাঁশুটে হয়ে গেছিল। বুকে হাত, চোয়ালে চোয়াল চেপে কষ্ট চাপবার চেষ্টা করছে। চোখে অচেনা দৃষ্টি।

কতদিন?

কেমন হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞেস করছে। মালতীর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে হাসি দেখে।

দিন পনেরো।

ওরে বাবা—! সাতদিন করুন ডাক্তার সমাদ্দার!

ডাক্তার ব্যাগে জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন। নীরব।

আচ্ছা—, দশদিন।

অসুখটা যেন সওদা। ডাক্তার বেচছেন। গণপতি কিনবে। দর কষাকষি হচ্ছে।

না—, পনেরো দিন, ডাক্তারের বদলে উত্তর দিল মালতী। গালার স্বর ইস্পাতের মতো কঠিন।

কারবারের বারোটা বেজে যাবে।

বাজুক।

ডাক্তার বললেন, দিন কতক বাইরে ঘুরে আসুন না।

হ্যাঁ যাব। ইলেকশান মিটুক।

সব চুপ করে শুনছে মালতী। যদিও সঠিক সময় নয়। ডাক্তারের মুখ দেখে উদ্বেগ পাতলা হয়ে এসেছে। বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকে গেল। গণপতিকে শুনিয়ে গলার আওয়াজ করল, —হুঃ!

ডাক্তারবাবু দরজার কাছে। পেছনে মালতী। নীচ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

নীচে এসে ডাক্তার বললেন, ব্যাপার বিশেষ কিছু মনে হয় না। দিন কতক রেস্ট্ দরকার। ভয় না দেখালে তো বিছানায় শোবেন না। আপনি আবার আকাশ-পাতাল ভেবে নিজে বিছানা নেবেন না যেন!

হিশাব ইত্যাদির কাগজ পত্র দেখে শুতে রাত হয় গণপতির। ওঠেও বেশ বেলা করে। ততক্ষণে ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো, বাজার স্নান সারা হয়ে যায় মালতীর। রান্না ঘরে ঢোকে। চায়ের কাপ নিয়ে গণপতিকে ঠেলে তোলে। আজ ঘরে এসে দেখে গণপতি নিজেই উঠে বিছানায় বসে আছে। বুকে হাত। মুখ পাণ্ডুর। অচেনা চোখে তাকিয়ে।

বুকে ভয়ের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, কি হয়েছে?

কিছু নয়—, যেন দাঁত চেপে বলল গণপতি।

মালতী পাশের টেবিলে চায়ের কাপ রেখে প্রায় ছুটে পাশে এসে বসেছিল। বুকের ওপর রাখা গণপতির হাতের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, ব্যথা করছে।

তারপর আর মুহূর্ত দেরি করেনি। গণপতিকে রেখে কোনোরকমে পায়ে চটি গলিয়েছিল। রমলা কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে একাই বক্‌বক্ করে যাচ্ছে। পাঁচটা বাড়ি পরে ডাক্তার সমাদ্দারের বাড়ি। খুব একটা নামডাক-ওয়ালা ডাক্তার নয়। এক পাড়ায় বাড়ি। খুচ্-খাচ্ অসুখে ডাকাডাকি

করতে-করতে প্রায় গৃহ-চিকিৎসক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাকে প্রাতঃরাশের টেবিল থেকে তুলে এনেছে।

প্রথম দিনটা গণপতি সুবোধ, শিষ্ট বালকের মতো কাটাল। সারাদিন বিছানায়। ঘুমল। খবরের কাগজ মুখস্ত করল। রাজা-টিঙ্কুর অরণ্যদেব, টিনটিনের বইয়ের পাঁজা প্রায় শেষ করে ফেলল। মালতীর অন্যরকম লাগছে। চোদ্দবছর বিবাহিত জীবনে গণপতিকে এমন অবস্থায় দেখেনি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, দোহারা চেহারা লোকটা সারাদিন বিছানায় টানটান শুয়ে। ডাক্তারের সঙ্গে তার ষড়যন্ত্রের ফল দেখে বেশ মজা উপভোগ করছিল মনেমনে। দ্বিতীয়-দিন গণপতি চিন্তিত ভাবে বলল, বিষাণকে কাকে দিয়ে একটা খবর পাঠান যায় বল দিকি ?

মালতী গম্ভীর ভাবে বলল, শুরু হলো ?

শুরুর কি আছে ? বাড়ি থেকে তো বেরুচ্ছিনা। বিষাণকে ক'টা জরুরি কথা বলে দেব।

গণপতি নিজেকে চিন্তিত দেখালেও ভালোই জানে বিষাণকে খবর দেবার পদ্ধতিটা কি। বাজার সেরে ফেরার পথে মালতী বলে এলো জটায়ুকে।

বিষাণ বসার ঘরে মাথা নীচু করে বসে আছে। রান্নাঘর থেকে হাত খালি হতে আঁচলে মুছতে-মুছতে ঘরে ঢুকল মালতী, এসো— ওপরে চলো।

ওপরে— !

এর আগে বিষাণ বোধহয় কোনোদিন ওপর পর্যন্ত ওঠেনি। বেশ আড়ষ্ট। মালতীর পেছনে শোবার ঘরে এলো বিষাণ। কথাবার্তা হচ্ছে গণপতির সঙ্গে। মালতী নড়ছে না ঘর থেকে। গণপতিকে বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ দিতে চায় না। ঘুরছে— ফিরছে। এটা ওটা মোছামুছি করছে। লক্ষ করল, আড়ষ্টতা ছাড়াও তার উপস্থিতি বিষাণকে বেশ অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। কথা শেষ করে পালাতে পারলে বাঁচে।

বিষাণের যাবার সময় গণপতি বলল, রতনটাকে একটু পাঠিয়ে দিস তো, দরকার আছে।

মালতী অনুভব করল, অন্যমনস্ক বা অভ্যাসবশে যাই হোক বাইরের দরজা পর্যন্ত বিষাণকে এগিয়ে দিতে এসেছে।

গণুদার কি হয়েছে— সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে বিষাণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

গলার স্বরে, দৃষ্টিতে অকৃত্রিম উদ্বেগ লক্ষ করে মালতী সত্যি কথা চাপতে পারল না। তাছাড়া, এমন একটা ষড়যন্ত্রের কথা আর কারো কাছে বলতে না-

পেয়ে পেট ফুলছিল। —বিষাণকে বলা যায়।

তেমন কিছু নয়। আসলে, বড্ডো খাটাখাটি করছে। তোমার গণুদাকে কদিন বাড়িতে আটকে রাখতে চাই—।

ওঃ— বিষাণ মাটির দিকে তাকাল। উদ্বেগ কেটে কৌতুকের হাসি মুখে।

তুমি যেন আবার বেশি ভালবাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিও না গণুদাকে।

যাঃ—, বিষাণ মাটির দিক থেকে মুখ তুলে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল মালতীর মুখের দিকে, তুমি বারণ করছ—!

রাত্রের ছায়ান্ধকার নয়। দিনের আলো কটকট করছে। বিষাণের তাকে তুমি বলা কানে খট্ করে লাগল। খুব একটা সচেতন ভাবে না হলেও অন্য কারো কানে গেছে কিনা জানতে মালতী চকিতে আশেপাশে তাকাল।

গণপতি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। দু-হাতে চায়ের কাপ নিয়ে মালতী বারান্দায় এলো। অন্যমনস্ক ভাবে পাওয়ার হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে গণপতি। বারান্দায় মালতী এসেছে যে খেয়ালও নেই।

তোমার চা।

গণপতি ফিরে তাকিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিল। মালতী বসল অন্য চেয়ারে। গণপতিকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

তোমার পাওয়ার হাউসের ব্যাপারটা কতদূর এগুলো?

কই আর এগুচ্ছে। —ইলেকশানে কি হয় দেখি।

কথার স্বরে হতাশা। মালতী খানিকক্ষণ আর কথা বলল না। হাতের খালি কাপের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে একসময় বলল, কি দরকার!

কি—, গণপতি আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বললে?

দৃষ্টি নিচু করে চায়ের কাপ প্লেটের ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে মালতী কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

দরকার—, গণপতি ক্ষীণ হাসল, হ্যাঁ—, না হলেও চলে যায় হয়তো?

তাহলে—,মালতীর গলায় আবেগ, উৎসাহ একসঙ্গে।

টিকে থাকার জন্যে দরকার—। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে দরকার, শেষ বিকেলের বিষন্নতা গণপতিকেও যেন স্পর্শ করছে আজ। একটু সময় যেতে দিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল, এগুতে

হবে—। সাইজে বড়ো হয়ে উঠতে হবে ক্রমশ। গণপতির পেছনে একজন মহীপতি আছে। মহীপতির পেছনে অন্য এক পতি। গণপতি থেমে পড়েছে বুঝলেই মহীপতি এগিয়ে এসে গণপতিকে গিলে খাবে। মহীপতি থেমে পড়লে তার পেছনের পতি। টিকে থাকতে হলে সাইজে বড়ো হতে হবে। —ওদের হাঁ-মুখের চেয়ে বড়ো। এ-খেলার এই নিয়ম।

শ্রান্তি, অবসাদে নেতিয়ে পড়েছে শহর।

নির্বাচন গেল।

মিটিং, মিছিল, ফেসটুন, পোস্টার, ভোটদিন ভোট দন।

পালা জ্বরের তাড়সে তেতে উঠে শহর কাঁপছিল এতোদিন। নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। শাসক দলের চেয়ার উল্টোমুখো। শুধু চেয়ারই উল্টোয়নি। চারটে পায়া পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে বিজয়ী দল।

গণপতি দারুণ ব্যস্ত। হঠাৎ যেন স্বপ্নাদ্য কোন টনিক খেয়ে কর্মোদ্যম ফিরে পেয়েছে বর্ধিত হারে। বাড়ি আসা অনিয়মিত। নাইবার খাবার সময়ের ঠিক নেই। মালতী কিছু বুদ্ধিহীনা হয়। আন্দাজ করে এম-এল-এ এখন প্রভাব প্রতিপত্তি সমেত প্রাক্তন। মামা এখন শুধুমাত্রই মামা। পাওয়ার হাউসের কণ্ট্রাক্টের জন্য গণপতি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাগারাগি করে এখন যদি মালতী কুলুপ এঁটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজা আগলে, গণপতি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়বে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে ভাবে, যা খুশি করুক। — নিজেই বুঝবে।

বাগানের গেটের চেনে তালা নাড়ার আওয়াজে সময় মতো ঘুম ভেঙেছে মালতীর। ঘর থেকে বিরক্ত গলায় সাড়া দিয়েছে, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

আওয়াজ বন্ধ হতে বুঝল, রমলা তার সাড়া শুনতে পেয়ে অপেক্ষা করছে।

ঘুম চোখে চারটে তালা খুলে বাগানের গেটের দিকে তাকিয়ে মালতী অবাক। রমলা গেটের ওধারে রাস্তার ওপর উবু দিয়ে বসে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদছে। ঘিনঘিন কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

ঘুমের জড়তা মুহূর্তে উবে গেল। তাড়াতাড়ি তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গেটের এ-পাশে দাঁড়িয়ে মালতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, রমলা কি হয়েছে ?

রমলা কথা বলল না। মুখ তেমনি কাপড় চাপা। শুধু একটুখানি কপাল দেখা যাচ্ছে। কান্নার বেগ, শব্দ যেন বাড়ল।

ততক্ষণে গেটের চেন-তালা খুলে ফেলেছে মালতী। গেট খুলে সামনে

দাঁড়িয়ে, —রমলা ?

রমলা যেন প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর, সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো বৌদি ! সব্বোনাশ হয়ে গেছে।

কি হয়েছে ?

আমাদের বিষাণ আর নেই গো বৌদি— ! বিষাণ আর নেই।

হঠাৎ দু হাতে কে যেন মালতীর গলা টিপে ধরল। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো, কে–এ !

বিষাণ গো বৌদি —বিষাণ ! বিষাণকে ওরা খুন করেছে !

মালতীর মনে হল চেঁচিয়ে গণপতিকে ডাকে, 'শুনে যাও— । শিগগির শুনে যাও। দেখো রমলা কি যা-তা সব বলছে।' পরক্ষণেই মনে হলো, কোথায় গণপতি ? গতকাল টেলিগ্রাম পেয়ে দুপুরের গাড়িতে গণপতিকে শহরের বাইরে দৌড়তে হয়েছে।

গেটের সামনে পথ-চলতি লোক থমকে দাঁড়াচ্ছে কৌতুহলী হয়ে।

মালতী ততক্ষণে অনেকটা ফিরে পেয়েছে নিজেকে।

ওঠো—, রমলার হাত ধরে ওঠাল, ভেতরে চলো।

বাড়ি যেতে যেতে মালতী ভাবল, যা-শুনেছে ভুল না হতেও পারে। রমলাদের পাড়াতেই বিষাণের বাড়ি। কাছেই।

বসার ঘরে চৌকিতে বসে মালতী। রমলা বসেছে মেঝের ওপর।

পেত্থমে পেছন থেকে পেটো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তাপ্পর চার-পাঁচজন বিষাণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ন্যাপলা না কি সব অস্তোর দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে গো বৌদি। কুপিয়ে-কুপিয়ে মেরেছে।

মালতী স্থির, শান্ত।

কে বললে তোমায় ?

এই দ্যাকো—, কান্নাটান্না গিলে রমলা একদম স্বাভাবিক, আমাদের পাড়ার সক্কলে তো সকাল হবার আগেই জেনে গেছে। কি হৈ-চৈ বৌদি, কি হৈ-চৈ। এতোক্ষণে দেক্‌গে যাও বাজার শুদ্ধ, নোক জেনে গেছে। দোকান-পাট বোধহয় আজ আর খুলবে না। রতনরা তো সে সব ব্যবস্থাই করছে শুনে এলাম।

কোথায় হল ঘটনাটা— ?

মহল্লার মদ্দে গো —। একেবারে হীরার ঘরের বাজুতে।

মহল্লার মধ্যে — ? হীরার ঘরের কাছে —মালতী দারুণ বিস্মিত, ওখানে

কি-করতে গেছিল ও ?

তবে আর বলচি কি—। ব্যাপার রয়েছে মন্দে—রমলার গলা খাদে নেমে এলো, —রত্নার কাজ এসব। রত্না গো ? বিষাণের দলের রতন ? বাবুর কাছে আসে পেরায়ই ?

চিনি। —বলো।

তোমায় বলেই বলচি বোদি—, রমলা গলার স্বর একেবারে না শোনার পর্যায়ে এনে ফেলল, রত্নাই আসলে করালে কাজটা। নিজে দলের মাথা হতে চায়। বিষাণটার তো দাম্ড়ার মতো দেহখানি আর গলায় হাঁকডাকই ছিল। —ঘটে কিছু নেই। রত্না আগেই হীরাপার্টির সঙ্গে ষড় করে থুয়েছিল। রাতে বিষাণকে খুব চুল্লু-টুল্লু খাইয়ে তোল্লা দিয়ে তাতিয়ে-তুতিয়ে রাইফেল হাতে পাইটেছিলো হীরার বাড়ি। নিজেরা যেন দলবল নিয়ে পেছনে রয়েছে। ঘরের দরজায় গিয়ে বিষাণ হাঁক দিয়ে দিয়েছে, 'হীরা বেইরে আয়।' হীরার দলবল কাছেভিতে লুকিয়ে রেডি হয়েছিলো। জায়গা মতো রাইফেল হাতে বিষাণ দাঁড়াতে পেথমে পেটো। ...বিষাণের সেই রাইফেল এখন হীরার হাতে।

সারাদিন, সারারাত বোমা ফাটল মহল্লায়। মাইক বাজল। বদ্লা নেবার আনন্দে—উৎসব। ঘর থেকে শুনলো মালতী।

গণপতি দেরি করে ফিরল। চারদিন পরে।

মালতী দরজা খুলে গণপতির মুখ দেখে বুঝল, গণপতি রাস্তায়ই দুঃসংবাদ শুনেছে। হয়তো গোলায় গেছিল। সেখানেও শুনে থাকতে পারে।

সারাদিন গুম হয়ে রইল গণপতি। বিশেষ কথাবার্তা বলল না। খেতে বসে থালা ঠুক্রে উঠে গেল। চোখে কনুই চাপা দিয়ে শুয়ে রইল সারাদিন।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে দু জনে। মালতী জানলার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছে। পাওয়ার হাউসের চারটে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আজও পূবে বাতাস। গঙ্গার ওপর দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে।

মালতী বলল, ঘুমুলে ?

না, গণপতি সাড়া দিল।

এবার রতন তোমার সঙ্গে যায় নি ?

নাঃ। তাড়াহুড়ো করে যেতে হলো, ওকে আর নেওয়া হয় নি। —কেন জিজ্ঞেস করছো ?

এমননিই। —মনে হলো।

আকাশের বুকে চারটে চিমনি নিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখের পাতা শ্রান্তিতে জুড়ে আসতে চাইছে। ঘুম কি আসছে? অথচ, মাথার ভেতরটা দারুণ সজাগ। ···পাওয়ার হাউস। হীরার এলাকা। নতুন দল। সেলফ্‌ লোডিং রাইফেল। হীরার পরাক্রম। রতনের ব্রেন। হঠাৎ সমস্ত অস্তিত্বে ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের পাতা খুলে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাকাল মালতী। —টেলিগ্রাম কি সত্যিই এসেছিল? গণপতি স্বইচ্ছায় এ শহরেব বাইরে থাকতে চায়নি তো কদিন?

মূকাভিনয়

বেলতলা যুব সমিতির বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে এবছরের অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, বাউল গানের আসর। ইলামবাজার থেকে এসেছেন অবনী দাস। ছেলে গৌর দাসকেও সঙ্গে এনেছেন। বছর চোদ্দ বয়স। গত দু বছর গান গেয়ে নাকি কেঁদুলীর আসর মাতাচ্ছে। পাত্রসায়র থেকে এসেছেন বলরাম খ্যাপা। স্থানীয় বাউল নিত্যানন্দ বৈষ্ণব তো আছেই। আসর পরিচালনার দায়িত্ব স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এছাড়া, দলের সঙ্গে সঙ্গতকারী হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁশী, শ্রীখোল বাজিয়েরাও এসেছেন।

তেরাস্তার মোড়ে বুড়ো বেলতলা। পাশে সমিতির খেলার মাঠ। রাস্তার ধার ঘেঁষে টিনের ছাউনি আর মুলিবাঁশের দরমার বেড়া দেওয়া সমিতির দু কুঠুরি ঘর। একটায় পাঠাগার। বড় ঘরটায় অফিস, বেকার সদস্যদের সারাদিনের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। চাকুরেদের মজলিশ সন্ধ্যার পর। তাস, দাবা, ক্যারাম্ খেলার ব্যবস্থা আছে। প্রতি রবিবার একজন বৃদ্ধ হোমিওডাক্তার টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বসেন বারান্দায়। কলোনীর দুঃস্থ অধিবাসীদের চিকিৎসার পরামর্শ, ওষুধ দেওয়া হয় বিনামূল্যে।

রাস্তা থেকে মাঠে ঢোকার মুখেই দেবদারু পাতায় মোড়া তোরণ। তোরণের নিচের দিকটায় একটি করে আমপাতার পর একটি করে গাঁদাফুল মালার মতো গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাল সালুর ওপর গাঁদাফুল দিয়ে অক্ষর সাজিয়ে লেখা, 'বেলতলা যুব সমিতির বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' দেবদারু পাতার ফাঁকে রঙিণ টুনি। লোডশেডিং বলে জ্বলছে না এখন। মাঠের মাঝখানে শামিয়ানা। শ্রোতাদের মাথায় শেষ আশ্বিনের হিম ঠেকাতে চটের আচ্ছাদন। স্থানীয় চটকল থেকে কাজ শেষ হলে ফেরৎ দেবার অঙ্গীকারে চেয়ে আনা হয়েছে। সমিতির সদস্যরাই খুঁটিটুটি পুঁতে শামিয়ানা খাটিয়েছে। বাড়িবাড়ি ঘুরে চেয়ে আনা রঙ-বেরঙের শাড়ি, চাদর টাঙিয়ে শোভাবর্ধন করার চেষ্টা হয়েছে আসরের। শতেক তালি দেওয়া বাউলের উলঝুল আলখাল্লার মতোই দেখাচ্ছে খানিকটা। ঠিক মাঝখানে আসরের জায়গা রেখে চারধার দিয়ে মহিলা এবং

পুরুষদের বসার পৃথক ব্যবস্থা।

বাড়ি থেকে আসতে আসতে কলি শুনছিল, রেকর্ডের গান থামিয়ে মাইকে শ্রোতাদের উদ্দেশে আসন গ্রহণ করার আবেদন এবং অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠান শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। তোরণের কাছে আসতে চারপাঁচজন সমিতির সদ্যযুবা সদস্য হই-হই করে ঘিরে ধরল কলিকে, বউদি এতো দেরি করলেন?

কলি রাগ দেখিয়ে বলল, তোমাদের আর কি—। থলে ভর্তি বাজার বারান্দায় ঢেলে দিয়ে বলে এলে, বউদি বাজার রইলো। বাউলরা রাত্রে এখানে খাবে। তারপর একটিবার উঁকি দিয়ে দেখতে গেছো—বউদি এক হাতে কি করে সামলাচ্ছে?

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে শম্ভু বলে উঠল, হাসিকে তো আপনাকে হেল্প করতে যেতে বলে এসেছিলাম! —যায়নি?

শম্ভুর বোন হাসি। গত বছর কলেজে ঢুকেছে।

গেছিল বলেই তো হল শেষ পর্যন্ত—, শম্ভুর দিকে তাকিয়ে কলি চোখ পাকিয়ে বলল, নইলে সব ফেলে রাখতাম। যিনি তোমাদের দিয়ে হুকুমজারি করে খালাস হয়েছেন—তিনি এসে করতেন।

মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অযথা জটলা করবেন না। শ্রোতাদের আসতে দিন। মিসেস সেক্রেটারি, আপনি অনুগ্রহ করে ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করুন।

ও মা—, কলির গলা দিয়ে অস্ফুট বিস্ময়োক্তি বেরিয়ে এল।

ছেলেরা হেসে উঠল উঁচুগলায়।

আসরের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে কলি জিজ্ঞেস করল, —কে বলছে?

কে আবার—প্রিয়ব্রত হেসে বলল, বলার কায়দা শুনে বুঝতে পারছেন না? —ছাত্রনেতা।

কেষ্ট, —না? আসর শেষ হোক, বাঁদরটার কান ছিঁড়ে দেব!

কলি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

কাকে খুঁজছেন—সমীর জিজ্ঞেস করল, বেলতলা যুব সমিতির সেক্রেটারিকে?

ধরা পড়ে কলি লজ্জা পেল, আসেনি এখনো?

শম্ভু একটা নেবা বাল্বের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এলে দেখতেই পেতেন। মার্কারি বাল্বের মতো আলো করে রাখতো চারিদিক।

ব্যর্থটা বুঝল কলি। আলো জ্বলছে না। অর্থাৎ বিদ্যুৎ নেই। সেক্রেটারি বিদ্যুৎ সরকারও অনুপস্থিত।

ফাজলামি হচ্ছে —কলি কপট ধমক দিল, থাকলে সেজেগুজে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রোমিওগিরি বেরিয়ে যেতো।

শম্ভু জিভ কাটল, সরি বউদি।

প্রিয়ব্রত বলল, বিদ্যুৎদা খবর পাঠিয়েছে ওদের ডিপার্টমেণ্টে কি একটা মেশিন ব্রেক্‌ডাউন হয়েছে। আটটার আগে বেরুতে পারছে না মিল থেকে।

কলির মনে হল, কি অস্বস্তি নিয়েই না কাজ করছে বিদ্যুৎ! এখানে যে কি হচ্ছে, মিলের ভেতর থেকে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না। এতো বড় একটা ব্যাপার। তার ওপর লোডশেডিং-এর দৌরাত্ম্য। যদিও আলোর জন্যে বেশ কয়েকটা হ্যাজাক্‌, ব্যাটারি সেটের মাইক সব পরিপূরক ব্যবস্থাই রাখা আছে। একাদিক্রমে সাত বছর বেলতলা যুব সমিতির সেক্রেটারি বিদ্যুৎ। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিদ্যুৎ নিজে জোর করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেও পারবে কিনা সন্দেহ! সমিতি ছাড়বে না তাকে। সমিতির কাজ ছাড়াও কলোনির সব ব্যাপারের মধ্যেই সে। কাজিয়া-বিবাদ মেটাতে, মুমূর্ষুকে হাস-পাতালে পাঠাতে, অভাবী মানুষের শবদাহের ব্যবস্থা করতে, এমনকি দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্তের আর্থিক সমস্যা মেটাতেও ডাক পড়ে বিদ্যুতের।

শম্ভু বাগ, প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত —মাইকে গলা শোনা গেল, আপনারা যেখানেই থাকুন সমিতির অফিসে এসে দেখা করুন। শম্ভু বাগ, প্রিয়ব্রত ··

শালা--, শম্ভু প্রথমে অ্যাম্‌প্লিফায়ারের দিকে, তারপর আসরের যেখান থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে বলল, দেখতে পাচ্ছে না কোথায় রয়েছি--। হাতে মাইক পড়েছে, —না?

প্রিয়ব্রত বলল, বউদি আপনি আসরে গিয়ে বসুন। আমাদের ডাক পড়েছে।

কলিকে শামিয়ানা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে প্রিয়ব্রত পাশেপাশে হেঁটে এল। বলল, হাসিকে আপনার জন্যে জায়গা রাখতে বলেছি সামনের দিকে।

হাসির সঙ্গে প্রিয়ব্রতর প্রেমপর্ব চলেছে। এম.কম্‌ পড়ছে প্রিয়ব্রত। মেধাবী ছাত্র। একটু গম্ভীর প্রকৃতির। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। হাসির কাছে শোনা, তার অপছন্দের জন্যেই নাকি চাপ দাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা ভাই—, কলি হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ব্রতর দিকে এক ঝলক্‌ তাকিয়ে

বলল, কোনো ব্যাপারে বউদিকে দরকার পড়লে জানিও। সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

কলি বুঝল, ইঙ্গিতটা ঠিকই ধরেছে প্রিয়ব্রত। লজ্জা পেয়ে ঘাড় হেঁট করল।

শামিয়ানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে প্রিয়ব্রত বলল, আপনি তাহলে ভেতরে যান বৌদি। আমি ওদিকটা দেখি।

খুঁটিতে ঝোলানো হ্যাজাক জ্বলছে অনেকগুলো। সঙ্গতকারীরা নিজেদের বাদ্যযন্ত্রের স্বর বাঁধছে। দো-তারা বাঁধছে নিত্যানন্দ। আসরের একেবারে সামনের দিকটায় বাচ্চাদের জমাট ভিড়। ঝগড়া, হুড়োহুড়ি চলছে। হাসিকে দেখতে পেল কলি। সামনে, বাচ্চাদের পরই জায়গা দখল করে রেখেছে। কলিকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

হেঁট হয়ে ঘোমটার কাগড় দাঁতের চাপে বিন্যস্ত রেখে কলি ভেতরে যাবার চেষ্টা করতে করতে সামনে বসা বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের অনুরোধ জানাল, একটু যেতে দেবেন।

সকলেই কমবেশি চেনা। অনেকে কুশল জিজ্ঞাসা করল।

কলি প্রত্যুত্তর দিল। কুশল জিজ্ঞাসা করল।

পাশে বসতে হাসি জিজ্ঞেস করল, সব হয়ে গেছে ?

রাত্রে বাউলদের খাবার ব্যবস্থার কথা জানতে চাইছে হাসি। মাথা নেড়ে কলি বলল, পরিবেশন করার আগে একটু গরম করে দেব শুধু।

বিদ্যুৎদা ফিরেছে ?

না, আটটা নাগাদ আসবে খবর পাঠিয়েছে।

জ্যাঠামশাইয়ের কি ব্যবস্থা করে এলে ?

খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে তো এসেছি—, কলির গলার স্বর দুশ্চিন্তায় মৃদু হয়ে এল, পাশের বাড়ির ওদের বলে এসেছি, একটু নজর রাখতে, আত্মমগ্ন ভাবে বলল, বাড়ির বাইরে থাকলে এমন দুর্ভাবনা হয়।

বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠল কলির। কাঠা দশেক জমির ওপর বাড়ি। তিনটে ঘর। বারান্দায় টিনের ছাউনি। সীমানা ঘিরে রাংচিতার বেড়া। একধারে টিউবওয়েল। পাশে লাউ, শিমের মাচা। …তার শ্বশুর মণিমোহন। বছর সত্তর বয়স। দু চোখেই সরের মতো ছানি। লো-প্রেসারের রুগী। দুবার পড়ে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

দেশ ভাগ হয়ে এখানে আসার পর মাথায় সামান্য গোলমাল নজরে পড়েছিল। 'পাঁচ বছর আগে বিদ্যুতের মা'র দেহান্তের পর নাকি বেড়েছে

ব্যাপারটা। এসব বিদ্যুতের মুখে কলির শোনা। এমনিতে কিছু নয়। বেশ আছেন। কথাবার্তায় কিছু বোঝার উপায় নেই। বাগানের শাক ক্ষেত নিড়োচ্ছেন। ঝুলে পড়া লাউ, শিম, শশার লতা তুলে দিচ্ছেন মাচায়। উঠোনে পড়া শুকনো পাতা কুড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন। আপন মনে আছেন। হঠাৎ এক সময় উধাও। দু মাইল হেঁটে গিয়ে বাজারে কি স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। একবার তো ট্রেনে চেপে শেয়ালদা চলে গেছিলেন। লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, খালি গা। বদ্যুতের এক বন্ধু দেখতে পেয়ে অফিস কামাই করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। কেন এমন করে বেরিয়ে যান জিজ্ঞাসা করলে বলেন, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। তমুক কেমন আছে খোঁজ করতে গেছিলেন, —যাদের নাম করেন, বিদ্যুৎ জীবনে তাদের নাম শোনে নি। জানার কথাও নয় তার। বিদ্যুতের জন্ম এদেশে, দেশ ভাগ হওয়ার কয়েক বছর পর। বিদ্যুতের দাদা টাটা কোম্পা নর চাকুরে। জামসেদপুরে থাকেন। ছুটিছাটায় আসা-যাওয়া। একবার শুনে বলেছিলেন হঁা, মনে পড়েছে। নৌকো বাইত। আমাদের বাড়িতে এসে প্রায়ই গানটান শোনাতো। ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব — এইসব। বাবা এসরাজ বাজাতেন সঙ্গে। অবাক হয়ে বলেছিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন বলছেন? সে এখানে কোথায়!

যৌবনে মণিমোহন নাকি মজলিসী লোক ছিলেন। জমিজমা আর ধানচালেব ছোটো ব্যবসাব আয় থেকে সংসার মোটামুটি চলে যেত। খুব একটা উদ্যোগী পুরুষও ছিলেন না। বরং একটু অলস প্রকৃতিরই ছিলেন বলতে গেলে। গান-বাজনার শখ ছিল। নিজে এসরাজ বাজাতেন। বিভিন্ন গানের আসর থেকে ডাক আসত প্রায়ই। এসরাজটা এখনো আছে। মণিমোহনের ঘরের দেওয়ালে কাপড়ের খোলের মধ্যে টাঙানো। কিন্তু কোনোদিন মণিমোহনকে একটিবারের জন্যে ফিরে তাকাতেও দেখে নি কলি এসরাজটার দিকে। বিদ্যুতের মুখে শুনেছে, বিদ্যুতের মা মারা যাবার আগে পর্যন্ত মণিমোহন হঠাৎ একেকদিন ধুলোটুলো ঝেড়ে, তার বেঁধে এসরাজ নিয়ে বসতেন। যেদিন বসতেন, সেদিন তাঁকে এসরাজ ছেড়ে তোলাই মুশকিল হত। গত রাতের স্বপ্নের কথা যেমন করে বলে মানুষ তেমনি করে বিদ্যুৎ বলেছিল, চৌকির ওপর বসে বাবা এসরাজ বাজাচ্ছেন। সাদা খোলের লালপাড় শাড়ি পরে মা ঘরের দরজার পাল্লায় ঠেসান দিয়ে বসে। তখনও ইলেকট্রিক আসেনি কলোনিতে। ঘরে হ্যারিকেন জলছে। বাইরে কলোনির রাত গভীর হচ্ছে ক্রমশ। এসরাজের সুর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। মা জেগে বসে থাকতেন। যতক্ষণ না বাবা নিজে থেকে বাজনা

ছেড়ে উঠছেন।

এসব দৃশ্য কলি দেখে নি। বিদ্যুতের মা মারা যাবার বছর দুই পরে সে এ-বাড়িতে এসেছে। কলি দু-একবার আবদার জানিয়েছে মণিমোহনের কাছে, বাবা, একটু বাজান না এসরাজটা, শুনি। আমি কখনো তো শুনিনি আপনার বাজনা।

এসরাজ!

বিহ্বল দৃষ্টি মণিমোহনের সরের মতো ছানি পড়া চোখে। জীবনে যেন এই প্রথম এমন একটা শব্দ শুনলেন। তারপর বেশ কষ্ট করে মনে করার মতো করে বলেছিলেন, সব তার ছিঁইড়া গেছে গিয়া।

এমনভাবে বলেছিলেন মণিমোহন যার আক্ষরিক অর্থের চেয়ে ভাবার্থ বড়ো হয়ে কলির বুকে বেজেছিল। উৎসাহ দেখিয়েছিল। অর্থবহ করে বলেছিল, আবার নতুন করে তার বাঁধুন। আপনার ছেলেকে বলে তার আনিয়ে দিচ্ছি। একটু থেমে গভীর স্বরে বলেছিল, আমাদেরও তো একদিন আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছে হয় বাবা।

নাঃ, উদাস গলা মণিমোহনের, অহন আর কিছুই মনে পড়ে না।

কলি বুঝতে পেরেছিল, মণিমোহন এড়িয়ে যেতে চাইছেন। জেদ ধরেছিল, এসরাজটা হাতে নিলেই মনে পড়বে।

এহন আর মনে কর্তে চাইলেও মনে হয় না।

চিকিৎসার ত্রুটি রাখেনি বিদ্যুৎরা দুই ভাই। ডাক্তার শেষে বলেছিলেন, বুঝতেই তো পারছেন। আসল অসুখ যেখানে সেখানে কোনো ওষুধেরই হাত পৌঁছোয় না। শরীরটা সুস্থ রাখতে হালকা বলকারি খাবার, যত্ন আর লক্ষ্য রাখা —কোথাও যেন একা বেরিয়ে না যান। কোথাও পড়েটড়ে গিয়ে হিপ্-জয়েন্ট ভাঙলে বা মাথায় আঘাত লাগলে খুব মুশকিল হবে।

আমাদের গানের আসর এখনই শুরু হচ্চে, মাইকে কথা বলছে নিত্যানন্দ। হাসি গড়িয়ে পড়ল কলির, নিতুদা কী রকম সেজেছে দেখেছো বউদি?

কলির হাসি পেল। খুব সেজেছে নিত্যানন্দ। তেল-জল দেওয়া কোঁকড়া চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর। কপালে নিখুঁত রেখায় আঁকা রসকলি। নাকে তিলক। চোখে সরু করে কাজল পরেছে। পরনে, হাঁটুঝুল ধোপদুরস্ত গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ধুতি। হাঁটাচলা, কথা বলায় একটু মেয়েলি ধরনের নিত্যানন্দ। সামান্য নাকি সুরে কথা বলে, গান গায়। বিদ্যুৎ বলে, শচীন বর্মনের স্টাইলটা

নিয়েছে। পাড়ার চ্যাংড়ারা সব সময় পেছনে লাগছে। নিত্যানন্দ নির্বিকার। রেগে যায় ছেলেরা যখন 'মুরগী চোর' বলে। গালাগালের বান ছোটায় খোনা গলায়। কেন যে রেগে যায় কে জানে! হয়ত বৈষ্ণবদের ওসব ছুঁতে নেই বলে।

নিত্যানন্দ আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এ্যাঁই মুরগী চোঁর, নিত্যানন্দের নাকি স্বর নকল করে কে যেন বলে উঠল পেছন দিক থেকে।

হাসির হুল্লোড় উঠল বাচ্চাদের মধ্যে। বয়স্কদের কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোবার চেষ্টা করলেন।

নিত্যানন্দ কোমরে দু-হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে আসরের মাঝখানে। দু-চোখে আগুন। দেখার চেষ্টা করছে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। আবার হাসির হররা উঠল নিত্যানন্দের ভঙ্গি দেখে।

পাশে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হাসি ফিসফিস করে বলল, পিন্টুদের দল।

সব জায়গায় যেমন থাকে এই কলোনিতেও তেমনি কয়েকটা ছোট দল আছে। অল্পবয়সী ছেলের দল। পড়াশোনা বা অন্য কোনো কাজ নেই। রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে সারা দিনের আড্ডা। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, সাট্টা ওসব নিয়েই আছে। এ-দল ও-দলে বদলা নেবার উত্তেজনাময় ঘটনাও ঘটে মাঝেমধ্যে।

মাইক চালু রয়েছে। নিত্যানন্দের ঠোঁট ফেটে কি-যে সব শব্দ বেরিয়ে আসত বলা যায় না! কেষ্ট এসে অবস্থার রাশ ধরল। মাইকটা মুখের সামনে ধরে গম্ভীর স্বরে কয়েকটি অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হওয়ার জন্যে সমিতির তরফ থেকে ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইল সমবেত শ্রোতাদের কাছে। তারপর অনুষ্ঠান সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে শ্রোতাদেরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল।

হাঁরে হাসি, গোলমাল বাধবে না তো, কলি বেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

ধ্যুত, তাচ্ছিল্যের শব্দ করে ব্যাপারটা একেবারেই উড়িয়ে দিল হাসি, এখানে গোলমাল করার মুরদ হবে নাকি? একটু-আধটু আওয়াজ দেবে হয়ত। স্বভাব যাবে কোথায়।

বলরাম খ্যাপার অনুষ্ঠান দিয়ে আসর শুরু হল।

একতারার তারে আঙুলের টোকা পড়ল। কোমরের সঙ্গে বাঁধা ডুগি। বাঁ হাতে তাতে বোল বাজল, ডুগ, ডুগুস। বলরাম খ্যাপা আসরে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

পরনে বড়ো বড়ো তালি দেওয়া ময়লা আলখাল্লা। মাথায় পাগড়ি। ধবধবে সাদা দাড়ি বুকের মাঝখান পর্যন্ত নেমে এসেছে। কলির মনে হল, বইয়ের পাতার ছবির বাউল আসবের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই স্বর ছড়িয়ে পড়ল, খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কেম্‌নে আসে যায়।

নাচের তালে পা-ফেলার বয়েস ধরা পড়ে। চড়ায় স্বরভঙ্গ হচ্ছে। তবু কলির চোখে মুগ্ধতা ফুটে উঠেছিল। কথার সঙ্গে স্বর মিশে বুকের মধ্যে একটা গভীর উদাস ভাব জেগে উঠছিল। পরপর খানচারেক গান গেয়ে বসলেন বলরাম খ্যাপা। আসর যে জমে উঠেছে— এমন মনে হচ্ছিল না। বলরাম খ্যাপার গান অনেককেই খুশি করতে পারে নি। বিশেষ করে অল্পবয়সী শ্রোতাদের। শ্রোতাদের মধ্যে বেশ গুঞ্জন চলছে। সামনে বাচ্চাদের মধ্যে হই-হুল্লোর শুরু হয়েছে আবার। মহিলারা অনুচ্চ স্বরে ঘর-গৃহস্থালির খবরা-খবর সেরে নিচ্ছেন পরস্পরের মধ্যে।

বাঁচ্ছারা, তোঁমরা গঁণ্ডোগোল কোঁরোনা। এঁখন গাঁন গাঁইতে উঠছেন… মাইকের সামনে নিত্যানন্দ দাঁড়িয়েছে।

এই নিঁতে—, পেছন থেকে কে হেঁকে উঠল, তুই শাঁলা বঁসবি ?

শামিয়ানার ভেতরের সব আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। তোরণের রঙিন টুনিগুলো জ্বলতে-নিবতে লাগল। সমবেত শ্রোতাদের গলা দিয়ে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল। সমিতির কয়েকজন সদস্য হ্যাজাকগুলো নিবিয়ে দিতে এসে আবার ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সাব্যস্ত হয়েছে, হ্যাজাক যেমন জ্বলছে জ্বলুক। আবার কখন আলো চলে যায় বলা তো যায় না।

রুণঝুন ঝুমুরের শব্দ। গৌর দাস গান গাইতে উঠবে। পায়ে ঘুঙুর বাঁধছে। কেষ্ট আসরে এসে হাঁটুগেড়ে বসে অবনী দাসের সঙ্গে বোধ হয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করছে কিছু।

কলি হাসিকে বলল, একবার কেষ্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারবি তোর দাদা এসেছে নাকি ? তারপর বলল, আচ্ছা, কেষ্টকে একবার ডাক এদিকে।

কেষ্টদা, হাসি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

অবনী দাসের সঙ্গে কথা শেষ করে কেষ্ট আসরের সীমানায় এসে দাঁড়াল।

হাসি জিজ্ঞেস করল, বিদ্যুৎদা ফিরেছে ?

কেষ্ট কলির দিকে তাকিয়ে বলল, না বউদি, এখনো আসে নি। এখুনি এসে পড়বে। দরকার আছে কিছু ? এলে পাঠিয়ে দেব ?

কলি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, দরকার নেই।

কেষ্ট চলে গেলে হাসি জিজ্ঞেস করল, কিছু দরকার হলে বলো, আমি কেষ্টদা এলে উঠে গিয়ে বলে আসব।

ভাবছিলাম —অন্যমনস্কভাবে কলি বলল, ও এলে যদি সাইকেল করে বাড়ি গিয়ে সব একবার দেখে আসে। বাবা একা বাড়ি রয়েছেন তো!

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে উত্তেজিত গুঞ্জন উঠল। গৌর দাস উঠে দাঁড়িয়েছে। পায়ে ঘুঙুর। বগলে খমোক্। অবনী দাস নিজে স্ট্যাণ্ড থেকে মাইক-বুমের উচ্চতা নামিয়ে গৌর দাসের গান গাইবার সুবিধাজনক অবস্থায় এনে দিচ্ছে।

ই—স্ কি মিষ্টি—, হাসির গলায় মুগ্ধতা উপচে পড়ল, ঠিক সিনেমার বাচ্চা বাউলদের মতো। —না বউদি?

গৌর দাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কপালে দু হাত জড়ো করে ঘুরে ঘুরে প্রণাম জানাল আসরকে। তারপর খমোকের তার টান করে দ্রুত ঝংকার তুলে আসরের সীমানা দিয়ে দুবার কোমর ভেঙে নুয়ে হালকা পায়ে ছুটে ঘুরে গেল। দাঁড়াল মাইকের সামনে। খুব নিচু স্বরে উচ্চারণ করল, গাড়ি···। দুবার পা-ঠুকে ঘুঙুরে আওয়াজ তুলল। খমোকে দ্রুত ঠোকা দিল দুবার। পাশে ঘাড় হেলিয়ে মিষ্টি করে হাসল। কেটে কেটে কথা বলার মতো বলল, গাড়ি চলছে আজব কলে···। মাইক থেকে সামান্য পিছিয়ে দাঁড়াল। খমোক্ বেজে উঠল। ঘুঙুরে বোল ফুটল। রিনরিনে, টানা তারের মতো স্বর ভেসে উঠল, গাড়ি চলছে আজব কলে।

কি-ই-ই চালু, হাসি বিস্ময় কাটিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিল।

গৌর দাসের সপ্রতিভতা দেখে কলিও অবাক। বলল, হবে না। এই বয়েসে কতো বড়ো বড়ো আসর মাৎ করছে?

গুরু, গুরু — উল্লাস ফেটে পড়ল পেছন থেকে।

পাশের অন্ধকার দিকটা থেকে আওয়াজ এল, কৈ ছিলা সোনামুনি!

ট্যারা সুশীলের গ্যাং-ও এসেছে, পাশের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে হাসি বলল।

বয়স্করাও নড়েচড়ে বসেছেন। তাল, চড়া স্বরের মাদকতা ছড়িয়ে পড়ছে শ্রোতাদের মধ্যে।

বউদি. হাসির হাতের আঙুল চেপে বসেছে কলির বাহুর ওপর।

কী হল, হাসির মুখের দিকে তাকিয়ে কলি অবাক। হাসির বড়ো বড়ো চোখ বিশাল হয়ে উঠেছে। যেন হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে তাকিয়ে আছে আসরের দিকে। কাঁপা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল, জ্যাঠামশায়।

যন্ত্রচালিতের মতো আসরের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে গেল কলি।' মণিমোহন। নেশাগ্রস্তের মত টলমল পায়ে এগিয়ে এসেছেন আসরের দিকে। হাতের লাঠিটাও নেই। আলোর নীচে মণিমোহন এসে উপস্থিত হতে কলি দেখল, বাক্স হাতড়ে একটা পাটভাঙ্গা ধুতি বার করে কোনোরকমে কোমরে জড়িয়েছেন মনিমোহন। তসরের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছেন। কোমরে বেঁধেছেন সাদা চাদর। বগলে, কাপড়ের খোল থেকে বার করা এসরাজ।

কেষ্ট এবং সমিতির কয়েকজন ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশেই। ঘটনার আকস্মিকতায় তারাও বিমূঢ়। কেষ্ট এসে মণিমোহনের হাত ধরল। আসরে ঢোকার ব্যাপারে বাধা দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করছে। মণিমোহন ঝট্‌কা মেরে কেষ্টর হাত ঝেড়ে ফেললেন। টলমল পায়ে এগিয়ে গেলেন, সঙ্গতকারীরা যেখানে বসে আছে, সেদিকে। মাটিতে পাতা চটে পা-জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো অবস্থা। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল কলি। কেষ্টই পেছন থেকে ধরে ফেলে মনিমোহনের পড়ে যাওয়া সামলাল। তারপর খুব নিরুপায় ভাবে মণিমোহন যেখানে বসতে চাইছেন সেখানে বসিয়ে দিল হারমোনিয়াম বাজিয়ের পাশে। বসেছেন মণিমোহন। সে বেচারি তাড়াতাড়ি সরে বসার জায়গা করে দিল। কেষ্ট আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকাল শ্রোতাদের মধ্যে বসে থাকা কলির দিকে। কলি বিভ্রান্ত।

আসরে গান চলেছে। কিন্তু কোথায় যেন স্বর কেটে গেছে। শ্রোতাদের কৌতুহলী উৎসুক দৃষ্টি তখন মণিমোহনের ওপর। বাউলরা, সঙ্গতকারীরা তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। গৌর দাস বারবার ফিরে তাকাচ্ছে তার বাবার দিকে। অবনী দাসের কপালে অসন্তোষের রেখা। আসরের ছন্দপতনে স্পষ্টতই বিরক্ত। চোখের ইশারা করল গৌর দাসের দিকে তাকিয়ে। গৌর দাস খমোকে জোরে বোল তুলল। ঘুঙুরে দ্রুত ঝংকার। মাইক মাঝে রেখে নাচতে লাগল অনেক খানি জায়গা নিয়ে। শ্রোতাদের দৃষ্টি, মনোযোগ ঘুরিয়ে আনতে চাইল তার দিকে। নতুন গান ধরল, ওহে হরি আমার কবে ফুটবে বিয়ের ফুল।

মণিমোহন কাঁধের ওপর এসরাজ ঠেসান দিয়ে বসেছেন। ডান হাতে ছড়। স্বর ধরার চেষ্টা করেছেন। ছড় টানবেন তারের ওপর। এসরাজের দিকে তাকিয়ে কলির মুখ লাল হয়ে উঠল। ঘাড় হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হবে বউদি, অসহায় স্বর হাসির।

কলি তাকাল, মণিমোহন বাজিয়ে চলেছেন। অদৃশ্য তারের ওপর নিখুঁত

ভঙ্গিতে ছড় টানছেন। বাঁ হাতে আঙুল ঘাটগুলোর ওপর দিয়ে ওপর-নীচে ওঠা নামা করছে। সমিতির ছেলেদের কাউকে দেখতে পেল না কলি। মনে হল, ওরা সরে গিয়ে বোধহয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে, এ অবস্থায় কী করা যায় মণিমোহনকে নিয়ে। কলি ভাবল, বিদ্যুৎ কি এখনো আসেনি?

পাগল মানুষটাকে কি এমন বাড়িতে একলা ফেলে গান শুনতে আসতে হয় মা— পেছন থেকে একজন প্রৌঢ়া কলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

সমস্ত মুখে রক্ত ছুটে এল কলির।

আপনি চুপ করুন তো মাসীমা, প্রৌঢ়ার দিকে তাকিয়ে হাসি ঝামরে উঠল, যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না।

ভালোর জন্যই বলা মা, প্রৌঢ়া চুপ করে গেলেন।

হাসির হুল্লোড় উঠল শ্রোতাদের মধ্যে। কাঁপা দৃষ্টি নিয়ে কলি আসরের দিকে তাকাল। হারমোনিয়াম, খোল, বাঁশী বাজছে দ্রুত লয়ে। চোখ বুজিয়ে মণিমোহনও দ্রুত ছড় টানছেন এসরাজে। বাঁ হাতের আঙুল এসরাজের ঘাট ছুঁয়ে ওপর নিচ করছে।

পাশের অন্ধকার থেকে আওয়াজ এল, কি দিচ্ছে রে দাদু!

পেছন থেকে শব্দ উঠল, টপ দাদু। টপ। ঘুরে ফিরে দাদু।

কলি মাথা নিচু করে বসে। বেশ বুঝতে পারছে, আশপাশ থেকে অনেক দৃষ্টি এখন তার ওপর থেকে অনড়। অপমানে, ক্ষোভে চোখ ফেটে জল আসতে চাইল কলির।

জানোয়ার সব, হাসি দাঁতে দাঁত চেপে বলল। একটা হাত রাখল কলির বাহুর ওপর।

কলির বয়সী একটা বউ পেছন থেকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল কলিকে, আপনাকে ডাকছে।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, প্রিয়ব্রত। শামিয়ানার শেষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য। শ্রোতাদের ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজের উপস্থিতি জানাতে মাথার উপর হাত তুলল।

ভাঙা আসরের হাল ধরতে অবনী দাস নিজে মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে নানান গানের ফরমাশ আসছে। কারো ফরমাশ অবনী দাসের বাজার চালু রেকর্ডের গান, গোলেমালে পিরীত করে গোলমেলে লোকে। কারো অনুরোধ, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে। কারো আবার, ছ্যাখ, ছ্যাখ, ছ্যাখ কালো বাঘটা।

বউদি, বিদ্যুতদা ডাকছে আপনাকে।

কোথায় ?

প্রিয়ব্রত ইশারা করে দেখাল। এ টু দূরে মাঠের ধারে বাতাবি লেবু গাছের ছায়ার অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ। যেন লোকজনের দৃষ্টি এড়াতে বেছে নিয়েছে জায়গাটা। সমস্ত অপমান, ক্ষোভ পাকিয়ে উঠে আসতে চাইল গলার কাছে। বিদ্যুতের কাছে যেতে সামনেই ভাঁটুই ভর্তি মাঠটা প্রায় ছুটে পার হতে কলির ঠোঁটে কথাগুলো উঠে আসতে চাইল, জানো, বাবা কী করে যেন এখানে এসেছেন। আর ওরা— বিল্টু, ট্যারা-সুশীলের দল···

বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন ?

কলি থমকে গেল। দেখল, বিদ্যুতের পরনে কারখানার পোশাক। খাঁকি প্যাণ্ট, হ্যাণ্ডলুমের হাফহাতা চেক হাওয়াই শার্ট। চোখেমুখে সারা দিনের শ্রান্তি। দু-চোখে কঠিন দৃষ্টি কলির মুখের ওপর।

আমি নিয়ে এসেছি ?

না হলে এলো কেমন করে— চাপা হিমহিম স্বরে জিজ্ঞেস করল বিদ্যুৎ।

আমি তো খাইয়ে-দাইয়ে ··। পাশের বাড়ির ওদের বলে···, কলি অসহায়ের মতো বলল।

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে আসনি কেন ?

দারুণ রাগ উঠে আসছে মাথায় টের পেল কলি। গলায় ঝাঁঝ ফোটালো, কি যাতা বলছো ? একজন বুড়ো মানুষকে ঘরে শুইয়ে দরজায় তালা দিয়ে গান শুনতে আসা যায় ? করেছি কখনো এরকম ?

বিদ্যুৎ ঠাৎ কথা খুঁজে পেল না। মাটির দিকে তাকাল! ক্ষোভে দুঃখে যেন নিজেকেই ছি ছি করে ওঠার মতো করে বলল, একটা ভাঙা এস াজ। একটাও তার নেই···। মাথা কাটা যা চ্ছ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে সমিতির অফিস ঘরের দিকে চলে গেল বিদ্যুৎ। কলি এক জায়গায় স্থাণু। বিদ্যুতের চলে যাওয়া দেখল।

অবনী দাস আসর জমিয়ে ফেলেছে আবার। মাইকে গান ভেসে আসছে, সই গো, আমি কত ধকল সই/ঢাকা ছিল মাখন ভাণ্ড, খলে খেল ওই/করলো ঘিয়ের ভাণ্ড লণ্ডভণ্ড/কত কাণ্ড করে যায়/কালো বেড়াল কে পোষে পাড়ায়···

উল্লাস ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল শ্রোতাদের মধ্যে।

গলার স্বর সরু করে পাশের অন্ধকার থেকে কে বলে উঠল, আমি ঢাকা

সরিয়ে মাকোন খাব।

পেছন থেকে বিড়ালের জিভ দিয়ে দুধ খাওয়ার মতো চক্‌চক্‌ শব্দ করে উঠল একজন।

কলি পায়ে পায়ে শামিয়ানার ধারে এসে দাঁড়াল।

আলোয় উজ্জ্বল আসরটাকে এখান থেকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। অবনী দাস অনেকখানি জায়গা নিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে। হারমোনিয়াম বাজিয়ের পাশে বসে বিভোর হয়ে এসরাজ বাজিয়ে চলেছেন মণিমোহন। ঘাড় হেঁট। চোখের দৃষ্টি বাঁ হাতের আঙুলের ওঠানামার ওপর। ডান হাতের ছড় কেঁপে কেঁপে এসরাজের তারের ওপর দিয়ে আসছে-যাচ্ছে। কলি বুঝল, শ্রোতাদের কৌতূহল এবং দৃষ্টি এখন আর মণিমোহনের ওপর নেই। অবনী দাসের গান তাদের সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছে।

নতুন গান আরম্ভ হবার আগে হাসি আসর ছেড়ে কলির পাশে এসে দাঁড়াল, বউদি, ভেতরে যাবে না?

না রে। ভালো লাগছে না। এখানেই ভালো। তুই যা।

হাসি গেল না। দাঁড়িয়ে রইল পাশে।

চরা সুরে নতুন গান ধরল অবনী দাস, খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন···।

হাঁড়ি শব্দটার পর দীর্ঘ চড়া সুরে টান। শুধু অবনী দাস নয় গৌর দাসও উঠেছে বাবার সঙ্গে। এখন আর বগলে খমোক নেই। তার বদলে একদিকে চামড়া দিয়ে ছাওয়া, ফাঁকে ফাঁকে টিনের চাকতি দেওয়া বাজনা। মাথার ওপর তুলে বুকের কাছে নামিয়ে দু-হাতে বাজাচ্ছে সেটা। তার রিনরিনে গলা অবনী দাসের গলার সঙ্গে মিশে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে চার পাশে। তাল ঠোকার শব্দ আসছে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে। গানের মুখে অবনী দাস ফিরে আসছে যখনই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ গলা মেলাচ্ছে তার সঙ্গে।

আলো নিবে গেল। এই যে গেল কাল সকাল বারোটার আগে আর আসছে না।

হ্যাজাকগুলোর মধ্যে কয়েকটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিক-ওদিক দম ফুরিয়ে যাওয়ার মতো জলছে বাকিগুলো। ছেলেরা টাঙানো শাড়িটাড়ি খুলে রাখছে। শ্রোতদের বসার জন্য মাটিতে যে চট বিছানো ছিল সেগুলো গুটিয়ে পাট করে রাখছে।

বাবা, কলি মনিমোহনের হাত ধরল, বাড়ি চলুন।

মণিমোহন তখনও বসে। অবস্থাটা যেন ঠিকমতো ধরতে পারছেন না এখনও। ঘোরলাগা বিহ্বল দৃষ্টি ছানিপড়া চোখে, এর মইধ্যে গান শ্যাষ অইয়া গেল ?

অত্যন্ত নিরুৎসাহিত মুখে মণিমোহন এসরাজটা এক হাতে তুলে নিয়ে অভ্যাস মতো অন্য হাতে আন্দাজে হাতড়ে লাঠি খুঁজছেন।

লাঠি আনেননি। আমার হাত ধরুন।

আনি নাই, মণিমোহন কলির হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন, গান কিন্তু খুব জমছিল আইজ !

প্রিয়ব্রত, হাসি এসে পাশে দাঁড়াল, চলুন বউদি, বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসি আপনাদের।

কেডা রে, মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জ্যাঠামশাই। —প্রিয়ব্রত।

সঙ্গে কে ? হাসি নিকি রে ?

হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। গান ভাল লেগেছে আপনার ?

খুউব সোন্দোর।

কলি বলল, দরকার নেই। এইটুকু তো রাস্তা। চলে যাব। টর্চ রয়েছে। তুমি বরং রাত না বাড়িয়ে বাউলদের নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ বাড়ি গিয়ে খাবার গরম করি। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার দাদা কোথায় ?

অফিস ঘরে বসে আছে চুপ করে।

কলি একটা নিঃশ্বাস চেপে অফিস ঘরটার দিকে তাকাল। তারপর মণি-মোহনের দিকে ফিরে বললো, চলুন বাবা।

মণিমোহনের একটা হাত কলির মুঠোয়। টলমল পায়ে আস্তে আস্তে পা-ঘষটে হাঁটছেন মণিমোহন। মাথার ওপর গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় কোজাগরী জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে।

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, আশ্বিন মাসের আর কয়দিন বাকি বউমা ?

হিসেব করে কলি বলল, আর পাঁচদিন বাবা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটলেন মণিমোহন। তারপর সুরু করে বললেন, আশ্বিন যায় কার্তিক আসে। মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে। আর কয়দিন পর [illegible]

শিব বাইরাতে শুরু করবো।

কলি টর্চের আলো রাস্তায় ফেলে সাবধানে খানাখন্দ এড়িয়ে চলেছে।

এই সময় ধান খেত থিকা একরকম বাস বাইরায়।

সামনেটা উঁচু—একটু দেখে পা দেবেন।

বউমা ?

কি বলছেন বাবা ?

বিদ্যুতের লগে তুমার দেখা হইসে আসরে ?

হয়েছে, বলতে গিয়ে কলি মিথ্যে করে বলল, না তো।

আইজ তুমারে খুউব বকা দিব বিদ্যুৎ, যেন খুব মজা করে বলছেন এই রকম করে বললেন মণিমোহন।

কলি অবাক হল, কেন বাবা ?

আমি বাড়ি থেইকা একা আসরে আইসি, —এসরাজ বাজাইসি।

কলির বুকের মধ্যে হঠাৎ অভিমান গুমরে উঠল। মনে মনে বলল, কেন এমন করেন বাবা। আপনি তো জানেন না, আপনাকে নিয়ে কি দুর্ভাবনায় কাটে আমাদের। যদি হোঁচট খেয়ে কি মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে যেতেন ? অবস্থাটার কথা আন্দাজ করে শিউরে উঠল কলি।

আমি তো ঘুমাইয়া ছিলাম। এমুন সময় কানে স্বর আইতে লাগল। ভাবলাম, স্বপন বুঝি। জাইগা দেখি নাতো। এক্কেরে হেই স্বর। হেই গান।

রাস্তায় খানিকটা মাটি বসে গেছে সামনেই। কলি টর্চের আলোয় শক্ত করে মণিমোহনের হাত ধরে পার করালো।

বউমা, মণিমোহন যেন দীর্ঘশ্বাস চেপে ডাকলেন, আমি কি আর জানি না আমায় এসরাজে স্বর বাইর অয় না। একডাও তার নাই এসরাজে। ছড়ে একগাছি বালাম্‌চিও নাই, হাসি ফুটে উঠল মণিমোহনের ক্ষয়া ঠোঁটে, লোকে খুউব হাসছে, মজা পাইসে খুউব। আমি ট্যার পাইসি।

কলি হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। দারুণ বিস্ময়ে তাকাল মণিমোহনের মুখের দিকে। ঘোমটা খসে পড়েছে।

ছেলেমানুষের মতো মণিমোহন বলছেন, তহন আমি কি করি বউমা ! স্বর যে তহন আমার বুকের মধ্যিই ফুইলা-ফুইলা উঠত্যাসে। দম্ বন্ধ কইরা দিত্যাসে। ঝ্যান ছাখলাম, আমার শিয়রে খাড়াইয়া আমার মরণ।

কলি টের পেল, তার মুঠোর মধ্যে মণিমোহনের উত্তাপহীন, লোলচর্ম হাত

ঝংকার দেওয়া তারের শেষ অণুরণনের মতো থরথর করে কাঁপছে।

খুব ফাঁড়া গেসে আইজ। খুউব বাঁচা বাঁইচা গেসি—হাসি হাসি মুখে ঘোলা দৃষ্টি তুলে গাছের ছায়ায় অন্ধকারে কলির মুখ খোঁজার চেষ্টা করছেন মণিমোহন।

কলির চোখের সামনে উদ্ভিন্ন কোজাগরী হঠাৎ বড় ম্রিয়মাণ হয়ে এল। আর ঠিক সেই সময়, চটকলের শিফট বদল হবার হুটার বাজছে। বাতাসের বুক চিরে আর্তনাদের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

সোনা-ঠোকরা

তিনজনে মিলে দল। বংশী, পীতাম্বর, নাড়ু। বংশী, পীতাম্বর সমবয়সী। পঞ্চাশের কোঠায় দুজনেই। পীতাম্বর হাঁপানী রুগী। টান উঠলো তো কি-শীত কি-গ্রীষ্ম বুকে বালিশ চেপে জানলার ধারে কদিন ঠায় বসে। বংশী এখনো অতোটা কাবু না-হলেও অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কোমরে, গাঁটেগাঁটে বাতের টাটানি টের পায়। নাড়ু বয়সে অনেক ছোটো। বছর চারেক ভিড়েছে দলে। আজ দুদিন হল কাজে বেরিয়েছে। পীতাম্বরের আনা খবর ধরে গেছে লালগোলা লাইনে নসীপুর স্টেশনে নেমে তিন মাইল পুবে এক গ্রামে। বলে গেছে, শুক্রবারের মধ্যে না-ফিরলে থ'না-পুলিশে খোঁজ-খবর করতে। দরকারে জামিনের ব্যবস্থা করতে। সংসারের খাই-খরচ দিতে বৌয়ের হাতে।

পীতাম্বরের কাজ আড়কাঠির। ভীতু মানুষ। হাতে কাজ করতে চায় না। চাড্ডি ওষধি গাছ-পালা, লতা-পাতা চেনে, গুণাগুণ জানে। পিঠে বস্তা ফেলে গ্রামের মধ্যে সেঁধোয়। রাস্তার ধার, আলের পাশ দেখতে-দেখতে গ্রামের ভেতরে গৃহস্থের বাড়ির কানাচ অবধি। যেন ওষধি গাছ-লতার সন্ধান করতে গ্রামে আসা। বস্তা বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে হাটে-শহরে চটপেতে বসে শেকড়-ডাল-পাতা বিক্রি পঁচিশ-পঞ্চাশ পয়সায়। কেউ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর এইটাই। খবরা-খবর সংগ্রহ করে মাথার মধ্যে করে নিয়ে আসে পীতাম্বর। মোটামুটি ক'ঘর লোকের বাস। ক' ঘর অবস্থাপন্ন তার মধ্যে। গ্রামে ঢোকার, বেরুবার রাস্তা। রেল, বাস-রাস্তার হদিশ। এসব বাড়ি তৈরীর নকশার মতো ছকে নিয়ে আসে মাথার মধ্যে। কাজ করতে গ্রামে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেই মিলে যায় সব।

যেমন আজ।

পীতাম্বর এই গ্রামখানায় ঘুরে গেছে দিন-পনেরো আগে। নকশা তুলে নিয়ে গেছে মাথায়। গ্রামের মাঝখান চিরে চওড়া কাঁচারাস্তা। পশ্চিমে মাইল দুই দূরে রেল স্টেশন। পুবে জাতীয় সড়ক। হরদম বাস চলে। গ্রামে ছ' ঘর অবস্থাপন্ন। তার মধ্যে আবার এই বৈশাখে দু-ঘরের মেয়ের বিয়ে। গ্রামের

দু-ধারে দুটো ডিপ-টিউবওয়েল। সারা বছর আবাদ মাঠে। এখন মাঠে সরষে তোলা হচ্ছে। বোরোধান, আলুর আঁচপাট চলছে। গ্রামের খাটিয়ে মানুষ সারা-দিন ভর মাঠে। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাঠে দুপুরের পান্তাভাত, জল পৌঁছে দিয়ে আসে। পীতাম্বরের খবর, গ্রামটার গন্ধও ভাল। গ্রামটা ছোট হলেও মানুষ-জন এককাট্টা, গোঁয়ার ক্লাসের নয়। অনেক গ্রাম আছে, একটা বাড়ি থেকে হাঁক উঠল তো আশপাশের দশটা বাড়ি থেকে লোকজন লাঠি, দা, কুড়ুল নিয়ে রে-রে ধেয়ে এলো। আবার এক-একটা গ্রামে পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখে এ-বাড়ির লোক মুখে কাঁথা চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। এই গ্রামের ঘরে ঘরে দল। মানুষ-জনে মিলজুল নেই। বিস্তর গাছপালা, এঁদো পুকুর, পচা ডোবা, বাঁশ বাগান। বাড়ি ঘর ছড়ান। এ-বাড়ি, ও-বাড়ি নজর চলে না। নেহাৎ ভাগ্য বৈরী না হলে বংশীর কাজের উপযুক্ত পরিবেশ।

মাঠ পেরিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে একটা পিটুলি গাছ। গাছের ছায়ায় বসে বংশী সামনে তাকিয়ে নকশার সঙ্গে গ্রামটার চেহারা মিলিয়ে নিচ্ছে। দাঁতে চাপা নেবা বিড়ি। পাশে, যন্ত্রপাতি রাখার কাঠের বাক্স। বাক্সর ওপর হাপরে হাওয়া দেবার চামড়ার জাঁতা। ফাল্গুন মাসের শেষ। বেলা আন্দাজ দেড়টা। গরম বাতাস বইছে। পেছনে কঞ্চির বেড়াঘেরা বাঁশ বাগান। জায়গায় জায়গায় বেড়ায় ফাঁক। বেড়া ভেঙ্গে ভেতরে যাবার রাস্তা করে নিয়েছে লোকে। হাওয়ায় বাঁশের গায়ে গায়ে ঘষা লেগে ক্যাচোর-কোঁচর আওয়াজ হচ্ছে। একটু আগে একটা শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল বংশী। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছিল, একটা ছোটমেয়ে বাঁশ বাগানে ঘুরে ঘুরে শুকনো কঞ্চি কুড়োচ্ছে।

স্টেশানের নাম, ধর্মপুর। গ্রামের নাম, গ্রাম কেয়াবন।

দুয়ের যোগ মাঠের মাঝ দিয়ে উঁচু কাঁচারাস্তা। বংশী স্টেশানে নেমেছে সাড়ে বারোটা নাগাদ। স্টেশানের কাছটা দোকান-পসার, হাটচালায় মানুষে জমজমাট। ট্রেন থেকে নেমে বংশী দেরি করেনি। পা-চালিয়ে মাঠের রাস্তায়। এ-কাজে মানুষের নজর থেকে নিজের মুখ যতো আড়ালে রাখা যায় ততই নিজের মঙ্গল। দুপুরবেলা। রাস্তায় লোক চলাচল নেই। দূর মাঠে আবাদের কাজকর্ম। রাস্তার নাবালে গরু-ছাগল চরছে। এই-যে এই গ্রামটায় আজ ঢুকেছে বংশী, যদি কাজকর্ম পায়, কাজ করে নিরাপদে সরে পড়তে পারে, আজীবন গ্রামের নামটা মনে রাখতে হবে, গ্রাম কেয়াবন। গ্রাম কেয়াবন। সারাজীবনে আর ভুলেও এ-মুখো নয়। কে জানে কোথায় বংশীর অগোচরে বসে মুখটা মুখস্থ করে রেখেছে একজন। সব ফাঁস হয়ে গেলে জানতে পেরে তাক করে

রেখেছে, একবার হাতের নাগালে পেলে হয়। আর কাজ করতে-করতে একটা কিছু হয়ে গেলে, তারপর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে—সারাজীবন আপনা-আপনি নামটা সবুরে-অবসরে ঠেলে উঠবে মনে। যেমন দুঃস্বপ্নের মতো মনে পড়ে, সীতাপতিপুর। মালদা জেলার মধ্যে। ধ্যাড়-ধ্যাড়ে গ্রাম। খালি আম গাছ। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। কাঠের বাক্স, চামড়ার জাঁতা নিমেষে উধাও। কিল, চড়, ঘুষি—গণ ধোলাই। নাক-মুখ নিয়ে রক্তের ধারা। তার ওপর গোটা বৈশাখ মাসের দুপুর পা-বাঁধা অবস্থায় আকাশমুখো। দু-হাতের চেটোর ওপর পাঁচখানা করে থান ইট। বেলা তিনটের পর আর কিছু মনে নেই। বামাল ফেরৎ পেয়েছিল বলেই হোক বা মানুষ খুনের দায়ে পড়ার ভয়েই হোক— থানা-পুলিশ হয়নি এর পরে। সেই ধাক্কা সামলাতে বিছানায় দুটি মাস পুরো। ডাক্তার, ওষুধ, সংসার চালাতে মেলাই ধার-দেনা দুমাসে। —মাঝে মাঝে বংশীর সমস্ত চৈতন্য চমকে দিয়ে মনে পড়ে যায়, সীতাপতিপুর। তলপেট মুচড়ে খানিক তেতো জল উঠে এসে আলজিভের তলায় পুঁটলি হয়ে জমে থাকে। মনে হয়, এখুনি উঠে উবু দিয়ে না-বসলে কাপড় ভিজিয়ে ফেলবে। ভেতর থেকে কে বলে, 'বংশীবদন, একদম মারা পড়বে। এ-বয়সে অতো হুজ্জোৎ শরীরে আর সহ্য হবে না। বৌ, ছেলেমেয়ে কেউ জানতেও পারবে না। জানটা বেঘোরে বেরিয়ে যাবে।'

অ নোক—। নোক গো।

বংশী কাউকে দেখতে পেল না। বাঁশ বাগানের ভেতর দিকে বেড়ার ওপর একবোঝা কঞ্চি নড়াচড়া করছে।

আমার বোঝাটা ধরবা এট্টু? বেড়া পার করে দেবা, নোক?

বংশী উঠল। কঞ্চির বোঝা ধরে বেড়ার এপারে পার করে নামিয়ে রাখল মাটিতে। মেয়েটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে এধারে এসে দাঁড়াল। আট-দশ বছর বয়সে। পরনে ছেঁড়া ঝুলঝুলি ফ্রক। চামড়ায় খড়ি। রুক্ষ চুল। দেখলেই বোঝা যায়, দিনমজুরের ঘরের মেয়ে। দাঁড়িয়ে পেছনে হাত দিয়ে চুল গোছাতে গোছাতে মেয়েটা লক্ষ্য করছে বংশীকে। বংশীর বাক্সটাকে। চুলবাঁধা শেষ করে খানিক ময়লা কানি বিড়ে পাকিয়ে মাথার চাঁদির ওপর বসিয়ে থাবড়ে চেপে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাক্সোয় কি আচে গো নোক? তুমি ঝালাইঅলা?

মেয়েটা তাকে কাঁসা-পেতলের ঘটিবাটি সারানোর লোক ঠাওরেছে। বংশীর মাথায় অন্য চিন্তা। পীতাম্বরের খবর, গ্রামের সম্পন্ন চাষী কানাই দাস। বড়-মেয়ের বিয়ে। খবরটা যাচিয়ে নেবার জন্যে মেয়েটার দিকে ফিরল, খুকি, তুমি তো এই গ্রামেই থাক? কানাই দাসের মেয়ের বিয়ে কবে জানো?

সে তো সামনের মাস বাদ দে তাপ্পরের মাসে।

বংশী চিন্তা করল, তার মানে বৈশাখ মাস পড়ছে।

আমার দিমাকে দশ বস্তা ধান দে গেলো ভাপিয়ে শুকনো করার জন্যি, মেয়েটা ভারিক্কি ভঙ্গিতে বলল, বে'র ব্যাপার। গুষ্টি এসে থাকবে কদিন। মেয়েটা কঞ্চির বোঝার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অ নোক, বোঝাটা মাতায় তুলে তাওনা গো। ধান ভাপানে র খড়ি ফুইরেচে। দিমা বসে আচে।

বোঝাটা মাথায় বসিয়ে দ্রুত চিন্তা করে নিল বংশী, মেয়েটার সঙ্গে গ্রামে ঢোকা যাক। পীতাম্বরের খবর তো আছেই, দেখা যাক মেয়েটার কাছ থেকে আরো কিছু খবরা-খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা। বলল, চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। কানাই দাসের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।

মেয়েটা এগিয়ে। পেছনে বংশী। বাঁশ বাগান পেছনে পড়েছে।

খুকী, নাম কি তোমার, আলাপ জমবার মতো করে বংশী জিজ্ঞেস করল।

পদ্ম। দিমা ডাকে পদি।

বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো তোমার। তিনু মণ্ডলেরও তো মেয়ের বিয়ে—তাই না?

পাখীদির—, পদ্ম দাঁড়িয়ে পড়ে মাথার বোঝা শুদ্ধ ফিরে তাকাল, চেনো পাখীদিকে? পদ্ম খবর দেবার মতো করে বলল, জানো, পাখীদিকে আর ইস্কুলি যেতে দেয় না মণ্ডল মশাই।

কেন?

ওমা, বে যে। পাখীদির বেও তো সামনের মাসের তাপ্পরের মাসে। সামনের মাসের তাপ্পরের মাসে গেরামে দুটো বে।

তিনু মণ্ডলের বাড়িটা কোনদিকে পদ্মদিদি?

উই তো মনসাতলার গায়ে পাকা বাড়ি! নাল ছিমেণ্টের রোয়াক। —ওই বাড়ি।

নকশা মিলে যাচ্ছে। পীতাম্বরের পাকা কাজ। তবে এও খবর, তিনু মণ্ডল লোক খুব কড়া ধাতের। চণ্ডালের মতো রাগ। অনেক জমিজমা। তার ওপর বন্ধকী কারবার।

রাস্তার ওপর সিমেণ্টের সাঁকো। বাঁদিকে প্রাইমারি স্কুল। গ্রামের শুরু এখান থেকে। পীতাম্বরের নকশার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে হুবহু।

উই যে দাসেদের বাড়ি—পদ্ম দাঁড়িয়ে পড়ে দেখিয়ে দিল।

রাস্তার গা-দিয়ে আম-কাঁঠালের বাগান। মাঝে মাঝে মাঝে নারকেল, সুপারি। বেড়ার গেট ভেতর দিকে।

তুমি কি করগো লোক? ঘটিবাটি সারাও?

মেয়েটারে কৌতূহল যাচ্ছে না। এতক্ষণে মেয়েটার ওপর বেশ খুশী হয়ে উঠেছে বংশী। তাকাল মুখের দিকে,—স্যাকরার কাজ করি গো পদ্মদিদি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গয়না গড়ে দি।

পদ্ম অবাক। বড় বড় চোখ করে বংশীকে দেখছে। কাঠের বাক্স, চামড়ার জাঁতা দেখছে। অবিশ্বাসী গলায় বলল, কিসের গয়না? —সোনার?

বংশী তাকিয়েছিল গেটের দিকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

দুল গড়তে পারবা? নাকছাপি?

বংশী ফিরে তাকাল। কাটাতে হবে। বলল, তুমি বাড়ি যাবে না? ধান ভাপানোর খড়ি নেই বললে—দিদিমা বসে আছে যে।

পদ্ম তবু দাঁড়িয়ে।

যাও, বাড়ি যাও—বংশী খুব মিষ্টি করে হেসে আম-কাঁঠালের বাগানের ভেতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ দিয়ে এগিয়ে গেল।

পুরানো একতলা বাড়ি। উঠোনের একদিকে গোয়াল। গোয়ালের ছাউনির পচা খড় ফেলে টালি দিয়ে ছাওয়া হচ্ছে চাল। দুজন চালের ওপর টালি লাগাচ্ছে। নীচ থেকে টালির যোগান দিচ্ছে দুজন। বেড়ার ধারে গাছের ছায়ায় বসে তদারক করছেন কানাইবাবু। বংশী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে নিচ্ছিল মানুষটাকে। পীতাম্বর কানাইবাবুকে দেখেনি। নকশা তুলে নিয়ে গেছে লোকমুখে খবরা-খবর শুনে। বিঘে কুড়ি জমি। নিজেই জন-মজুর ধরে আবাদ। প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার। পঞ্চায়েতের মেম্বার। নরম প্রকৃতির মানুষ।

কি চাই—, চালের ওপর থেকে হেঁকে জিজ্ঞেস করল একজন।

বাবু কি বাড়ি আছেন?

বাবু আপনেরে কেডা যান ডাকে, চালে-বসা লোকটা নিজের কাজে মন দিল।

কানাইবাবুর পরনে লুঙ্গি। গামছা দিয়ে খালি গা ঢেকে গেটের ওধারে দাঁড়ালেন। বেঁটেখাটো। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। মাথায় কাঁচাপাকার ঘন কোঁকড়া চুল। চল্লিশের কোঠায় বয়েস। কষের দাঁত পড়ে গাল তুবড়ে গেছে। বেশ অবাক। বংশী, বংশীর মাথায় আজটা দেখলেন, কাকে চাই?

আপনাকেই বাবু, আজ্ঞে প্রণাম, —বংশী মাথার ব্যালেন্স ঠিক রেখে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাল।

হ্যাঁ, কানাইবাবু কপালে একটা হাত ঠেকালেন, কি চাই?

আজ্ঞে আপনার নাম শুনেই আসা।

আমার নাম শুনে? —কি ব্যাপার?

গাঁয়ে জিজ্ঞেস করতে প্রথমেই সকলে আপনার নামেই করলে। বললে, মানুষ ভারী সদাশয়। গরীব মানুষের দুঃখ বোঝেন। ওঁনার কাছে গেলে কাজকর্ম পাবে। বংশী থামল, সবাই তো বাবু এসব কাজ করবার ভাগ্যি নিয়ে জন্মায় না। লোকে বললে, ওঁনার মেয়ের বিয়েও সামনের বোশেখ মাসে।

হ্যাঁ আমার বড় মেয়ের। তা কাজটা কি করবে তুমি?

বংশী আরও খানিক সময় যেতে দিতে চাইছিল। মাথার বাক্স নামাবার উদ্যোগ করে বলল, বাক্সটা নামাই বাবু। সেই সকাল থেকে মাথায় নিয়ে ঘোরা।

মুখের ভাব যথাসম্ভব ক্লিষ্ট রেখেছে বংশী। এখন সত্যিই ভারি করুণ দেখাচ্ছে তাকে। বসা গালে সপ্তাহের পাকা দাড়ি। তিন রকমের ছিট কাপড়ে তৈরি ঘামে ভেজা ফতুয়া গায়ে। হাঁটুর ওপর তুলে পরা ছেঁড়া ধুতি। একটা হত-দরিদ্র মানুষের প্রতিমূর্তি। বংশী বেশ বুঝতে পারছে, ক্রমশই কানাইবাবুর কৌতূহল বাড়ছে। বাক্স, জাঁতা সামনে নিয়ে উবু দিয়ে বসে বংশী। গেটের ওধারে কানাইবাবু। লুঙ্গি এখন পায়ের পাতায় লুটোচ্ছে।

কি কাজ কর তুমি?

আজ্ঞে আমি একজন দুঃস্থ স্বর্ণশিল্পী—বংশী থামল। কানাইবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছে, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সামনে বসে মা-জননীদের মনের মতো প্যাটানের গয়না গড়ে দি।

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গয়না গড়ো?

কি করব বাবু—পুঁজিপাটা নেই যে দোকান দেব। অথচ বাপ-ঠাকুর্দার কাছে বিদ্যেটা শেখা। নিজের মুখে নিজের কথা কি বলব বাবু। লোকে ভালবেসে বলে, এমন হাত হাজারে একটা মেলে। এক দোকানে কাজ করতাম। দোকানের মালিক মরতে ভাই-ভাই লাঠালাঠি করে দোকান তুলে দিল। আর এক দোকানে কাজ ধরলাম তো দেখলাম, বড় অধর্ম। চোখ তুলে খদ্দেরের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। শেষে ভাবলাম বিদ্যেটা যখন জানি দোরে-দোরে ঘুরে কাজ ধরব। দেশে তো এখনো ভালোলোকের, সমঝদার মানুষের

আকাল হয়নি। দোকানে যে গহনা গড়ার বানি দশ টাকা—আমি পাঁচ টাকায় করে দেব। স্বাধীন কাজও হবে, ধর্মও সঙ্গে রইল। কেমন-না বাবু?

কিন্তু আমার তো গ নার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।

বংশী বুঝল, কানাইবাবু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সতর্ক হচ্ছেন। গলার স্বর নরম করে বলল, সে তো যথার্থ ই বাবু। আপনাদের মত মানী লোক কি যেখানে সেখান থেকে গহনা গড়াবেন? আমার বাবু পেলাসটিক, ভেলভেটের বাক্স নেই। কিন্তু দুটো হাত আর দশটা আঙুল আছে। কাজ কিন্তু বাবু করে এই দশটা আঙুলই।

না না আমি সেকথা বলছি না—, সাদামাটা ধরনের মানুষ। বিব্রত হলেন, আসলে আমার সব অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। কিছু আর বাকি নেই। থাকলে দেখতাম।

তাতো হওয়ার কথাই বাবু—, না-দমে বংশী বলল, সব কিছুই তো সময় থাকতে গুচিয়ে রা তে হবে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। আপনাদের মতো মানী মানুষ—এ তো দু-এক ভরির ব্যাপার নয়! বংশী থামল। মুখ, গলার স্বর যতখানি সম্ভব করুণ করে বলল, আমি বলছিলাম, মা-জননীর অঙ্গে এই দুঃস্থ লোকটার হাতে-গড়া দু-দশ আনার একটা চিহ্ন থাকত। তারও সময়-অসময়ে মানুষটার কথা মনে পড়ত, আমারও রোজগণ্ডা হয়ে যেত।

বুঝতে পারছি। কিন্তু বললাম যে, সব অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এদিক পানে এলে পরে খবরা-খবর কোরো। আমার তো এখনো আর একটা মেয়ে রয়েছে। দু-তিন বছরের মধ্যে বিয়ের যোগাড় দেখতে হবে।

কানাইবাবু চলে যাচ্ছেন।

বাবু—, গলার স্বর কাতর করে বংশী ডাকল, মজুরী অনেক কম পড়বে। না হয় বাজার যাচাই করে মজুরী দেবেন।

কানাইবাবু ততক্ষণে গোয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁতে বিড়ি চেপে দেশলাই জ্বালছেন। হাত নেড়ে জানালেন, পরে।

বাবু!

চালের ওপর লোকটা ধমকাবার মতো করে বলল, বাবু বলচেন তা পরে খপোর নিতি। যাও দিনি এ্যাকোন।

ধুর শালা সানাইয়ের পো। নিজের কাজ কর, বংশী মনে মনে খুব একচোট নিল লোকটাকে।

সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। রাস্তার দু-ধারে গাছপালা, পুকুর, বাগান-

ঘেরা বাড়ি। নিজেকে ডেকে বংশী বলল, 'বংশীবদন এবার ? কানাইবাবু তো চারে এসে লেজ নেড়ে সরে গেল। টোপে ঠোঁট ছোঁয়ালে না। এবার কি ? তিলু মণ্ডল ? লোক নাকি খুব কড়া ধাতের ! চণ্ডালের মত রাগ। মেয়ের যেন কি নাম ? পাখী। চলো ব শীবদন, দেখ পাখী পোষ মানে কিনা !'

নকশা মিলিয়ে বংশী দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ঝকঝকে খামার। পাশে খড়ের গাদা। একপাশে বস্তাচাপা পাম্পসেট। বাড়ির সামনে টিনের ছাউনি দেওয়া লাল সিমেণ্টের রোয়াক। দু'ধারে সিমেণ্টের বেঞ্চি। দেখলেই বোঝা যায়, বাড়ির মালিকের সিন্দুকে টাকা আসে কোন রাস্তা ধরে। চাষবাসের ওপর একশো টাকায় বছরে একশো টাকা স্থদে টাকা খাটে। দোনলা বন্দুক থাকে এসব বাড়িতে।

বাঁ-ধারের বেঞ্চিতে উঠতি বয়সের চারটি মেয়ে। মাঝখানের জনের কোলের ওপর একটা সিনেমার বই। বাকি তিনজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখছে। ট্রান-জিস্টারে হৈ-হৈ গান বাজছে, যিসকি বিবি মোটি···।

গলা-খাঁকারি দিল বংশী। কারোরই কানে গেল বলে মনে হল না। শেষে গলা তুলে বলল, বাবু কি বাড়ি আছেন ?

মাঝখানে বসে-থাকা মেয়েটি বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল, বাবা বাড়ি নেই।

শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বংশী গুটিগুটি রোয়াকের নীচে এসে দাঁড়াল।

বললাম তো বাড়ি নেই।

বংশী ঠোঁটে হাসি ফোটাল, শুনলাম এ-বাড়ির দিদিমণি কদিন বাদেই শ্বশুর-বাড়ি চলে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম এই বুড়ো লোকটার হাতের একটা কাজ দিয়ে যদি দিদিমণিকে সাজাতে পারতাম···।

মাঝখানের মেয়েটির মুখ লাল হল। চোখের দৃষ্টি নরম। বংশী বুঝল, এই তাহলে পাখী। একটু বা গোলগাল, মোটি-মোটি কিন্তু মুখের ডৌলটি ভাল।

এই রেডিওটা কইমে দে না—, বংশীর দিকে তাকিয়ে লজ্জা জড়ান স্বরে বলল, আপনার কি দরকার বলুন —বাবা রাতে বাড়ি এলে বলবো।

কর্তামশাই বাড়ি নেই. বংশী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আমার বরাতই মন্দ। বলতে বলতে বাক্স নামিয়ে রেখেছে রোয়াকের ওপর। নিজে বসে গামছায় ঘাড়-মুখ মুচছে, কাজ আর কি দিদিমণি। আমি একজন দুঃস্থ স্বর্ণশিল্পী। বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাল-ফ্যাসানের গয়না গড়ে পেটের ভাতের ব্যবস্থা করি।

গয়না—, চার মেয়ের গলা দিয়ে কথাটা ছিটকে বেরিয়ে এল।

বংশী বলল, প্যাটানের বই রয়েছে। পছন্দমতো যেটা বলবেন। তা বাবুই

বাড়ি নেই —কাকে দেখাব!

দেখি, দেখি বইটা দেখি —সিনেমার বই বেঞ্চির ওপর ফেলে চার মেয়েই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাক্স খুলে বই বার করে মেয়েদের হাতে দিয়ে কাপড় সরিয়ে কোমরের কষি চুলকোতে চুলকোতে বংশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

এ-প্যাটনটা কি সুন্দর। এটা ছাখ, এটা ছাখ।

উত্তেজিত কথাবার্তা ছিটকে আসছে। হবু কনে বংশীর দিকে তাকাল, আপনি বসুন। আমি বইটা মাকে দেইকে নিয়ে আসছি।

'বংশীবদন', নিজেকে ডাকল বংশী, 'চার জমেছে। জলের ওপর খুব বুজকুড়ি। তবে এসব কুচোর জ্বালাতন। টোপ্ ঠুকরে যাচ্ছে। ধাড়ি না এলে কিছুই হচ্ছে না। হে মা কালী, হে মা জগদম্বা —ধাড়িটাকে টোপের মুখে এনে দে মা'।

কে — গা —।

ধাড়ি আসছে। আওয়াজ পেয়ে বংশী আগে থেকেই পোজ্ ঠিক করে রেখেছিল। ঘাড় হেঁট করে দণ্ডবৎ। গামছা ঘাড়ের ওপর দিয়ে এনে দু'হাতের মুঠোয়, আজ্ঞে বংশীবদন। দুঃস্থ স্বর্ণশিল্পী।

মাথা তুলতে বংশী দেখল, পেছনে সাদা চুনকাম করা দেওয়াল, লাল সিমেন্টের রোয়াকের ওপর দিয়ে একটা পীচের ড্রাম গড়াতে-গড়াতে এসে কেত্রে সোজা হল। লালপাড় বারো হাত শাড়ি যেন বলছে, ক্ষেমা দে। —কুলোতে লারছি। কিন্তু বংশীর চোখের ডিম ঠিকরে বেরোনোর উপক্রম। গলা, ওপর-নীচ হাত, কান সব মিলিয়ে আট ভরির নীচে নয় কিছুতেই।

আ—হা—, বংশীর গলা বুজে এল, মা আমার, সোনার জগদ্ধাত্রী!

যেন কুঁচ ফলের শুঁটি ফাটল। দু-একটা পান খাওয়া দাঁত উঁকি দিল পুরু ঠোঁট ফাটিয়ে। বংশীকে দেখাবার জন্যেই যেন গিন্নি পাশ ফিরলেন। আবার সোনালী ঝিলিক। পাছার ওপর বেড় দিয়ে চওড়া গোট। আটের সঙ্গে আরো চার ভরি অচিরাৎ যোগ করে ফেলল বংশী।

কি বলছে রে নোকটা?

স্যাক্রা, স্যাক্রা, মেয়েরা বলল।

ও। তা কি বেত্তান্ত?

আঁজ্ঞে মা— স্যাকরার কাজ করে পেট চালাই। রোজগণ্ডা করার আশায় এই গ্রামে আসা। তা গ্রামে যাকেই জিজ্ঞেস করি তো সবাই বলে, স্যাক্রার

কাজ করানোর ক্ষমতা মণ্ডল বাড়ি ছাড়া এ-গ্রামে আছে কার? সোনার মুড়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে। গিন্নিমার মনটি ভারি নরম। ওঁনাকে গিয়ে ধরো। রোজগণ্ডার কথা ভাবতে হবে না।

এই হারটা গাইলে—, গিন্নি আলগোছা নিজের গলার হার হলুদমাখা আঙুলে তুলে দেখালেন, বইয়ের ছবির হারটা গইড়ে দিতে পারবা? পাকা আড়াই ভরি।

একেবারে আড়াই ভরি। বংশী যত ঠাকুর-দেবতার নাম মনে আসে সকলের পায়ে মাথা কুটে খুন হয়ে যাচ্ছে মনে মনে।

মায়ের মুখ থেকে কথাকটি খ তে যা দেরি। মেয়ে মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে হারের হুক্ খুলে ফেলেছে। দু-হাতের ফাঁকে মালা-বদলের মালার মতো ঝুলছে আড়াই ভরি। বংশী প্রায় জোর করে চোখ সরিয়ে নিল। গলা কাঁপছে। তবু যথাসম্ভব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, বইটা একটু এগিয়ে দেবেন মা। প্যাটানটা দেখি।

বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে পরিপূর্ণ, মুগ্ধ দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের ওপর চোখ রাখল বংশী, মায়ের আমার জহুরীর নজর, বইয়ের সেরা প্যাটানটা চোখে তুলে নিয়েছেন। এই এক গাছি হারের জেল্লাতেই দিদিমণির শাউড়ি, ননদের চোখ উল্টে যাবে। আ—হা। মায়ের আমার কি পছন্দ, কি নজর!

পারবা গড়তে?

গড়াই তো কাজ আমার মা। সামনে বসেই তো কাজ। বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবেন।

পুরোনো দিনের মটরমালা প্যাটানের হার। দূর থেকে রঙ দেখেই বংশী বুঝেছে, পাকা গিনি সোনা। মনে মনে হিসেব করছে দ্রুত। তিন টুকরোয় কাটবে। এমন কায়দায় কাটবে যাতে একটা টুকরোর ওজন ভরির ওপরে থাকে। প্রথমে, মুচির মধ্যে অ্যাসিড, সোহাগা দিয়ে একটা টুকরো বসিয়ে দেবে হাপরে। হাঁড়ির মুখে সরা চাপার মত আরও একটা খালি মুচি সোনা-গলানো মুচির মুখে চাপা দেবে। মুচি দুটো ঢেকে দেবে চুড়ো করা কাঠকয়লার তলায়। হাপরে আগুন জেলে হাপরের মুখে যাঁতা ফিট করে হুশহাশ হাওয়া। মুচির মধ্যে হারের টুকরো গলছে। সামনে বসে সোনার মালিক। দু'চোখে সজাগ দৃষ্টি। সোনা বলে কথা—একবিন্দু এদিক-ওদিক না-হয়। এই দৃষ্টি, সামনে বংশীর হাতের খেল্। বংশীর মুখ অনর্গল। পার্টির খাওয়া বুকে ভাসান ছাড়া। মাঝেমাঝে নিজের প্রয়োজনীয় কথা গুঁজে দেওয়া, 'মা-আমার যে প্যাটান চোখে

ধরিয়েছেন তিনবেলা খেটে শেষ হয় কিনা কে জানে ?' লোহার শিক দিয়ে হাপরের আগুন খুঁচিয়ে দিতে দিতে, 'আজ তো বেলা গেল। সোনাটুকু গালিয়ে মায়ের হাতে গচ্ছিত করে যাই। কাল সকাল-সকাল এসে গড়তে লাগব।' জাঁতার হাতলে চাপ দিয়ে হাপরে হাওয়া ঠেলে 'একটা নতুন মেটো-সরায় এক সরা চাল একটা কাঁটালী কলা, পান-সুপুরির ব্যবস্থা রাখবেন মা। গড়ার আগে মা-লক্ষ্মীকে সিদে দিতে লাগবে।' গলার স্বরে আবদার এনে, 'এই বুড়ো ছেলের যে আর একটা আবদার আছে মা। একটা করে বেলা ধরলে তিনটে দিন লাগবে হার-গাছা গড়তে। দুপুরে দুটি অন্ন সেবার আবদার রাখব অন্নপূর্ণা মায়ের চরণে।' এসবই—সে আজ সোনাটুকু গলিয়ে রেখে যাচ্ছে, আগামীকাল থেকে হার গড়ার কাজে হাত দেবে, তিনদিন ধরে কাজ করবে—এই ধারণার ভিত্ মজবুত করা। কথার তোড়ের মধ্যে দুবার হার-গলানো নিখাদ সোনার টুকরো তুলে দেবে হাতে। তার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা তৈরি করে নেবে। তিনবারের বেলায় বড় টুকরোয় এসে বংশীর হাতযশ, কপাল। এবার সকলের অগোচরে সোনা-গলানোর মুচি বদলে যাবে। এতক্ষণ যে-মুচিতে সোনা গলানো হচ্ছিল সেটা ওপরে, ঢাকা দেওয়ার মুচি নিচে। এ-মুচির নিচে সূক্ষ্ম ফাটল···হাপরে কয়লা দেবে নতুন করে। জ্বলন্ত হাপরে মুচির মধ্যে সোনা গলছে। সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে তরল সোনা একটু একটু করে জমা হচ্ছে হাপরের ছাইয়ের মধ্যে। অবস্থা, সময় বুঝে বংশী উঠবে। যেন তলপেট ভারি হয়েছে। আড়ালে গিয়ে উবু হয়ে না—বসলেই নয়। উবু দিয়ে বসে কোমরের গেঁজ থেকে পরিমাণ মতো পেতলের টুকরো বার করে রাখবে আঙুলের ফাঁকে। ফিরে এসে জাঁতার হাতল টিপে জোরে হাওয়া ঠেলবে হাপরে। কাঠকয়লার জ্বলন্ত ফুল্কি ছড়িয়ে দেবে চতুর্দিকে। সাবধান করার মতো করে বলবে 'সরে বসুন দিদিমণিরা'। হাপরের ধার থেকে এই কৌশলে ভিড় সরিয়ে বংশীর হাতের খেল্। আগুন খোঁচাখুঁচি করতে করতে পেতলের টুকরো ফেলে দেওয়া মুচির মধ্যে। যে ওজনের সোনাটুকু হাপরের ছাইয়ের মধ্যে জমা হচ্ছে, পেতলের খাদ মিশিয়ে সেই ওজনটুকুর ভরতুকি। মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে বংশী। আড়াই ভরি থেকে অন্তত আট আনার সোনা না-সরাতে পারলে এতো ঝুঁকি পোষায় না। তারপর। তারপর হাপরের ছাইয়ের মধ্যে আট আনার সোনা নিয়ে একদম হারিয়ে যাওয়া। শুধু গ্রামের নামটা মনে রাখতে হবে যতদিন বাঁচবে। গ্রাম কেয়াবন, ধর্মপুর স্টেশনে নেমে উত্তরে দু মাইল। সারা জীবনে আর এ-মুখো নয়।

মজুরী কত নেবা ?

মজুরী কেন বলছেন মা, বংশী দারুণ আহত, কাজটা করি। কাজ দেখে জিনিস পছন্দ হলে হাতে ধরে যা-দেবেন ঘাড় হেঁট করে দিয়ে যাব। একটা কথা পাবেন না মুখে।

দাও না মা, মেয়ের তর সইছে না।

তোর বাপ বাড়ি নেই—, গিন্নির ইতস্তত ভাব, চিনিস তো নোকটাকে। টের পেয়ে যদি নঙ্কাকাণ্ড বাধায়।

বাবা বলবে কেন, মেয়ে ফুঁসে উঠল, এটা তো ধর্মপুরের দত্তদের মেজ বৌয়ের হার। তোমার কাচে বন্ধক রেখে ছাড়াতে পারেনি। তোমার জিনিস তুমি আমায় দেচ্চো। বাবা বলবে কেন, মেয়ে নাকে কাঁদল, বাবা তো একোন মামলার তদ্বিরে সকাল-সকাল বাড়ি থেকে বাইরে গেছে। ফিরতে রাত্তির। দাখ না মা—

থরথর হাত কাঁপছে বংশীর। আড়াই ভরি এগিয়ে আসছে। হাত বাড়াবে এবার।

হঠাৎ সব কেমন থমথমে। মেয়েদের কলকলানি থমকে গেছে। চার মেয়ে সামনে তাকিয়ে পাথর। গিন্নির দু-চোখে আতঙ্ক। সামনে তাকিয়ে নিষ্পলক। কোথায় একটা ডিজেল পাম্প চলছে। বাতাসে তার চলার ভট্ ভট্ শব্দ ভেসে আসছে।

'গণ্ডগোল' ভেতর থেকে কে ডাকল বংশীকে, 'বংশীবদন, ভীষণ গণ্ডগোল।'

বংশী খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল।

দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে খামারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন। পাকা বাঁশের লাঠির মতো সটান। লম্বা মুখে লালের ছিটে লাগা আধুলি সাইজের দুটি চোখ। সার্টের সবকটা বোতাম খোলা। সাদা লোম উপছে বেরিয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি। হলদে ক্যাম্বিসের জুতো। বগলে রঙ-জলা কাপড়ের ছাতা। বলে দিতে হল না বংশীকে। —তিনু মণ্ডল। পীতাম্বরের খবর, লোক খুব কড়া ধাতের। চণ্ডালের মতো রাগ।

পরনের পোশাকের ভেতর দিয়ে শুঁয়োপোকা হাঁটার মতো একটা কাঁপুনি উঠে আসছে, টের পায় বংশী। দুম করে মনে পড়ে, সীতাপতিপুর, সীতাপতিপুর।

বকের মতো ডিঙি মেরে হেঁটে রকের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে তিনু মণ্ডল। বংশীকে দেখল। যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স, চামড়ার জাঁতা। রোয়াকের দিকে

তাকাল। চার মেয়ে কখন স্থট্‌সাট্‌ কেটে গেছে। রোয়াকের ওপর একা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়ের মা।

হচ্চে কি একেনে?

আ-শরীরে কেঁপে উঠল বংশী। গলার আওয়াজ কি!

নোকটা বললে স্যাক্‌রা। সামনে বসে হারছড়া গাইলে নতুন প্যাটানের হার গইড়ে দেবে—গিন্নির গলা দিয়ে স্বর সরছে না, মজুরী আমাদের যা-ইস্‌ছে। এমন করে বলল যেন এই একটি কথায় নিমু মণ্ডলের মুখের চামড়ার ভাঁজগুলো নরম হয়ে যাবে।

তিমু মণ্ডল বংশীর দিকে ফিরে তাকিয়েছে। চোখে চোখ পড়তে ঠোঁটে হাসি ফোটাতে গিয়ে বংশী অনুভব করল, ঠোঁটজোড়া অসাড়। গলা শুকনো। ঢোঁক গিলতেও সাহস হচ্ছে না।

তিমু মণ্ডলের আড়াই ভরির ওপর নজর পড়েছে ততক্ষণে। আধুলি সাইজের চোখ গোল হয়ে উঠেছে গোটা টাকার মতো। তাতে কলকল করে রক্ত ছুটে আসছে। আকাশ থেকে ডানামুড়ে ছোঁ-দিতে-নামা বাজপাখির মতো তিমু মণ্ডল ছুটে গিয়ে আড়াই ভরি নিজের হাতে তুলে নিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, ধম্মোপুরের নিধু স্যাক্‌রার কাজে মন ওটচেনা? জানা নেই শোনা নেই একটা নোক কি-বললে আর হারছড়া বাইড়ে ধরলে?

খুকির প্যাটানটা খুব পচোন্দ হয়েলো।

বংশী বেশ বুঝতে পারছে, গিন্নি গলার জোর পাচ্ছে না।

আর প্যাটান মারাতে হবেনি। চার মেয়ের বে-দিতি গে সব্বোশান্ত অবোস্থা। একোনো দুটো গলায় এট্‌কে। জুতো মেরে প্যাটান ঘুচ্চে দেবো।

বংশী ততক্ষণে যা-বোঝার বুঝে নিয়েছে। তিমু মণ্ডল টের না-পায় এমন সন্তর্পণে নিজের জিনিসপত্র গোচাচ্ছে। ভেতর থেকে খোঁচা টের পাচ্ছে, 'নোঙর তোলো। বংশীবদন নোঙর তোলো। হাওয়া খুব ঝপ্পাটে।'

এ্যা—ই, তিমু মণ্ডলের নজর পড়ল।

আজ্ঞে বাবু।

আজ্ঞে বাবু, তিমু মণ্ডল রোয়াকের ওপর। দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। বংশীর গলা নকল করে ভেংচে উঠল, ওঠ এক্কেন থেকে। আর একদিন এদিক পানে দেখলি তোরেই গাইলে ছাড়বো।

ভাসতে ভাসতে গ্রামের শেষ। বংশী বেলা আন্দাজ করল, বেলা তিনটে হবে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝল, সামনে বিল মাঠ। পীতাম্বরের নকশা

অনুযায়ী, গ্রামের শেষ। গ্রামের মাঝখান দিয়ে আসা রাস্তা বিলগাটের ওপর দিয়ে জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছে।

আড়াই ভরির ব্যাপারটা জোয়ান ছেলের মৃত্যু-শোকের মতো বুকে বাজছে এখনো। আট আনা সোনা। প্রায় হাজারটা টাকা। দু মাস পায়ের ওপর পা-দিয়ে বসে চলে যেত। তিনু মণ্ডল আর ঘণ্টা-খানেক বাদে বাড়ি ঢুকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? হাপরের ছাইয়ের মধ্যে আট আনা সোনা নিয়ে এতক্ষণে হাওয়ায় মিশে যেত বংশী। আড়াই ভরির মটরমালা হার যেন একটা উড়ন্ত পোকা হয়ে ঘুরঘুর করছে চোখের সামনে। হাতের ঝাপটা দিয়েও সরাতে পারছে না। মাঝে মাঝে হু হু করে উঠছে বুকের ভেতর। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে, 'ভেবে দেখিস মা বিচারটা তোর ন্যায্য হল কিনা!'

একটা চিকন স্বর ভেসে আসছে, অ-নোক। অ-নোক।

ডাকার ভঙ্গি, গলার স্বর চেনাচেনা। দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাল বংশী।

ইদিকে—। অ-নোক। ইদিকে।

ডানদিকে ঘাড় ফেরাতে বংশী দেখতে পেল—সেই মেয়েটা। যার মাথায় সে কঞ্চির বোঝা তুলে দিয়েছিল। খবরা-খবর নিতে নিতে এসেছিল কানাই দাসের বাড়ি পর্যন্ত। এখন একজন বয়স্কা, বিধবা স্ত্রীলোকের হাত ধরে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে আসছে। বংশীর মনে হল, বয়স্কা স্ত্রীলোকটি বোধ হয় মেয়ের সেই দিমা। মেয়েটার অস্থির, অসহিষ্ণু গলা কানে আসছে, আয় না পা-চেলিয়ে।

বংশী রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বেশ অবাক।

দিমা, এই নোক—, কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। হাঁপাচ্ছে।

তুমি গয়না গড়ো না গো নোক?

বংশী কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। মাথায় বাক্স। বাক্সের ওর জাঁতা। মেয়ের কথায় বলল, হ্যাঁ।

ওই দ্যাক—. মেয়ের দুচোখে আলো জ্বলে উঠেছে। দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝেঁঝে বলল, নিজির কানে শোন। আমি বললাম, বিশ্বেস হলোনি ত্যাকোন।

তুই চুপ কর ছুঁড়ি—, দিদিমা বংশীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি সোনা-রূপোর কারিগর বাবা? সন্তর্পণে চারিদিক দেখে চাপা স্বরে বলল, আমার দুটো জিনিষ গড়ে দিতে পারবা।

বংশী যারপর নাই বিস্মিত। চেহারা, পোশাক দেখে মনে হয়, একেবারে দিন-না-চলা দলের। ধান সেদ্ধ করে, পরের বাড়ির এটা-ওটা করে দিন চলে। গলার স্বরে বিস্ময় অকপটে রেখে জিজ্ঞেস করল, সোনা আছে ?

বেশ খানিক দূরে টিউবওয়েল ঘিরে কিছু মেয়ের জটলা। আশপাশে কেউ নেই। চারিদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে দিদিমা আরো কাছে সরে এল। ফিসফিস গলায় বলল, আচে। চুড়ি আছে একগাছা। ভেঙে দুটো জিনিস গইড়ে দেতে হবে।

একটা নাকছাপি আর কানের দুল।

মর ছুঁড়ি—, চাপা গলায় ধমকে উঠল দিদিমা। কথাগুলো কারো কানে গেল কিনা জানতে দু-চোখের দৃষ্টি এক-চক্কোর জরিপ করে এল চারপাশ।

নাকছাপি আর দু কানের দুল—, মেয়ে এবার দিদিমার গলার স্বর নকল করে ফিসফিস করে বলল, গইড়ে দেবা গো নোক ?

চোখের সামনে আড়াই ভরি ঝুলছে এখনো। তার কাছে একগাছি চুড়ি ? কতই বা ওজন হবে ? এক আনারই হোক। সেও আবার সোনা কিনা বংশীর ঘোর সন্দেহ হচ্ছে। হয়ত দেখবে, সোনার জল লাগানো ব্রোঞ্জের চুড়ি। বংশী বেলার দিকে তাকাল। আজ আর কাজের ভরসা নেই। খুব খারাপ যাচ্ছে সময়। আড়াই ভরি বেশ একটা আশা তৈরি করেছিল অনেকদিন পরে। ভেস্তে গেল।

নাতনী, দিদিমার পেছনে অনেকখানি আলের ওপর হেঁটে জিউলি, ঢোল-কলমীর বেড়া ঘেরা উঠোনে। গোবর-মাটি দিয়ে লেপা উঠোনে ছড়ানো ধান রোদে শুকোচ্ছে। একপাশে উনোনে লোহার কড়ায় চুড়া করা ধান। ফিনফিনে বাষ্প উঠছে কড়া থেকে। উনোন নিবে গেছে। —ধোঁয়াচ্ছে।

অ-পদি, বসতে দে কারিগরকে—, উঠোনে ঢুকে দিদিমা তাড়াতাড়ি উনোনের সামনে গিয়ে বসেছে। শুকনো খেজুরপাতা, কঞ্চি গুঁজে দিল উনোনে। সামান্য ধুঁইয়ে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

শব্দ করে একটা ধানের বস্তা ঝেড়ে পাট করে দাওয়ার ধারে পেতে দিয়ে মেয়ে বলল, বস গো নোক।

মাথার বোঝা দাওয়ায় নামিয়ে বসল বংশী। ধান ভাপানোর সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারি। বাঁ-পাশে মাচা। কঞ্চির ঠেক্‌না বেয়ে মাচা ছুঁয়েছে লাউ, পুঁইলতা। দুটো লঙ্কা গাছে ঝেপে লঙ্কা ফলেছে। কোনের দিকে কলার ঝাড়। একটা কলাগাছে মোচা ফল ছাড়তে শুরু করেছে সবে।

অ-পদি—।

কি পদি পদি করতে নেগেচো— মেয়ে দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে বংশীকে, কাঠের বাক্স, জাঁতা দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ঝেঁঝে উত্তর দিল, বলনা—, এখেনেই তো ডাইড়ে রইচি।

মানুষটা দুপুরের রোদ মাতায় তেতেমেতে এল। একঘটি জল দিলিনি?

তেষ্টাও পেয়েছে। বংশী ঘটির জল আলগোছা গলায় ঢালতে যাবে, পেছন ফিরতে দিদিমার নজর পড়ল। ধমকে উঠল নাতনীকে, মর ছুঁড়ি—। শুধু জল দেতে হয় মানুষকে? বংশীর দিকে তাকিয়ে দিদিমা বলল,— একটু দাঁড়াও বাবা। গরীবের বাড়ি এসে পড়েচো, কিইবা দেই তোমায়। দুটো মুড়ির মোয়া আচে ঘরে। তাই খেয়ে জলটুকু গলায় দাও। অ-পদি, দে না মা—।

খাস্তা, মুচমুচে মুড়ির মোয়া। দাঁতের সামান্য চাপে মুখের মধ্যে গুড়িয়ে যাচ্ছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, বিলমাঠের ওপারে জাতীয় সড়ক দিয়ে হর্ন বাজিয়ে বাস যাচ্ছে। মাঝের মেঠো রাস্তা দিয়ে জাতীয় সড়কের দিকে একটা গরুর গাড়ি চলেছে, টিকুস্, টিকুস্।

পীতাম্বর এতটা ভেতরে ঢোকে নি। এসব নকশাই নেই।

অ-পদি—।

কি-ই-ই, গলায় এখন ঝাঁঝ নেই। বিরক্তি।

যা মা—, পুকুরে দুটো ডুব দে এসে ভাতকটা খেয়ে নে।

পরে—।

আবার পরে কেন মা—। বেলা যে গইড়ে গেল, দিদিমায় গলায় অনুনয়, কোন্ সকালে রান্না করা ভাত— এরপরে আর মুকে দিতে পারবি?

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুড়ি আটকে যাচ্ছে। বংশী দু'আঙুলের চিমটেয় টিপে মুখে দিচ্ছে, তুমি এখনো চান-খাওয়া করো নি?

ছ্যান্ করবে, খাবে— সেই মেয়ে, দিদিমা উত্তর দিল, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর বাড়ি এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেগেচে। কবে বলেলাম, তোর মার চুড়িগাছ ভেঙে তোর গয়না গইড়ে দেব। তা তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর কতো ঝগড়া এতোক্ষণ আমার সঙ্গে। ধানের ওপর গড়াগড়ি দেতে দেতে কতো কান্না।

পদ্মর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নরম করে বংশী বলল, যাও—, দিদিমা বলচে চান করে ভাত খেয়ে নাও।

একোন একান থেকে নড়বে ছুঁড়ি— দিদিমার গলায় ঝাঁঝ, বসে বসে গয়না গড়া দেকবে।

সুযোগটা সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল বংশী, ওমা—, গহনা কি আজ গড়া হবে নাকি?

পদ্মর চোখের আলো নিবে গেছে। অবাক হয়ে বংশীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দিদিমা উনোনে কাঠিকুঠি গুঁজতে ভুলে পেছন ফিরে তাকিয়েছে।

বংশী এখনো চুড়িটা দেখেনি। মনের সন্দেহ কাটে নি, আসলে সোনা কিনা। তবু গলার স্বরে আশ্বাস নিয়ে এল, আজ আর বেলা কোথায়—?

নাকছাবি, দুল—কাজ তো কম নয়! গোটা দিনের কাজ। হাল্কা করে বলল, তার ওপর পদ্মদিদির গহনা। যা তা করে গড়লে তো চলবে না। আজ সোনাটুকু গলিয়ে রেখে যাই। কাল এসে গহনা গড়তে বসব। সারাদিন থাকব। পদ্মদিদির হাতের রান্না খাব—তবে তো?

সুমুখে বসে দুটো খাওয়াবো, সে কপাল কি করে এয়েচি বাবা— দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তবে মুখ ফুটে বললে, আমাদের যা-জোটে তোমারেও তাই বেড়ে দেব।

পদ্ম লাফিয়ে উঠোনে নামল। পেছন থেকে দিদিমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে কানে কানে কিছু বলছে। বংশী দিদিমার গলা শুনল, আচ্ছা, যাসখনি—।

বংশীর খাওয়া হয়ে গেছে। বেশ আয়েশ করে বিড়ি দাঁতে চেপে ধরেছে, দিমার কানে কানে কি বলছ গো পদ্মদিদি?

কি আর বলবে বাবা—, দিদিমা উত্তর দিল, বলছে পাঁচু দুলেকে বলে আসবে কাল দু-টাকার চুনো-চানা মাছ দিতে। কারিগর খাবে—। গুগলি, চিতি কাঁকড়ার ঝোল দে ভাত দিতি ওর বড়ো নজ্জা নাগবে।

বংশী নিশ্চিন্ত হল, যাক, কাল তার আসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েছে দু'জনেই। আজ সোনাটুকু গলিয়ে রেখে যাবে। কাল এসে গহনা গড়তে বসবে, দুল, নাকছাবি। মেটে-সরায় চাল, কলা, পান-সুপুরি— লক্ষ্মী সিধের কথা আর বলার দরকার নেই। নরম করে বলল, যাও পদ্মদিদি, চান করে ভাত খেয়ে নাও। তোমার খাওয়া হলেই না-হয় হাপরে আগুন দেব।

বংশী হাওয়া আড়াল করে বিড়ি ধরাল।

বলতে যা দেরী। দড়িতে ঝোলানো গামছা টান দিয়ে টেনে নিয়ে মেয়ে ছুটে গেল গেটের দিকে।

কড়ার ধান ভাপানো হয়ে গেছিল। দিদিমা ঘরে ঢুকে বাক্স হাতড়ে চুড়ি

এনে দিল, এই যে বাবা।

বংশী হাতে নিয়ে বুঝল, নাঃ, সোনারই চুড়ি। আনাটাক বা একটু বেশীই সোনা আছে। সোয়াশ টাকার মাল বাজার দরে। কোথায় হাজার টাকা আর কোথায় সোয়াশ। তবে বংশী এও অনুভব করল, চুড়িটা হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আড়াই ভরির শোক আর আগের মতো ততটা বড়ো করে বুকে বাজছে না।

দিদিমা উঠোনে পুরু করে বিছানো ধান পায়ে করে ফাঁড়ি দিতে শুরু করেছে। পায়ে করে ধান ফাঁড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে দাওয়ার কাছে আবার পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে বেড়ার ধাবে। ছড়ান ধানের ওপর পায়ের গভীর সিঁথির মতো দাগ পড়ছে। পায়ে পায়ে ধান ছিটিয়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে, শিরিপ্, শিরিপ্। কোথায় ডালে বসে শক্ত ঠোঁটে ডাল ফুটো করছে একটা কাঠ-ঠোকরা। শব্দ ভেসে আসছে, ঠ-র্-র্-র্।

মাঠান জমি ছেলো আঠাশ শতক। বেচে মেয়ের বে দেলাম। ছেলের সাইকেল, ঘড়ি। মেয়ের গলার হার, কানের দুল, হাতে দুগাছা করে চুড়ি। তা ভগবানের চোখ টাটালো। দুবারা সন্তান প্রসবকালে মেয়ে চোক্ষু মুদলো। তিনটে বচোরও ঘুরতে দেলে না— জামাই নতুন সংসার পাতলে। বে করতে যাবার সময় শত্তুরকে আমার কোলে ফেলে দে গেলো। বললে, বে-করে এসে নে যাবো। তো গেলো তো গেলো— সেই গেলো। একোন তার নিজেরই চারটে সন্তান। কোতা থেকে এই শত্তুরের বে দেবো, কি করবো— ভাবতে বসলি গলায় দড়ি দেতে ইস্‌ছে করে, দিদিমা ধানে ফাঁড়ি দিতে দিতে ধানের ওপর উবু দিয়ে বসে চোখে আঁচল চাপা দিল, ওরে তুই এ কি করলি রে মা— আমার। ওরে অতি বড় শত্তুরেও যে এ-শত্তুরতা করে না রে…।

বংশী ভাবছ, নাও—, এখন বসে বসে দিদিমার বিলাপ শোনো। অস্থির দৃষ্টিতে গেটের দিকে তাকাল, ভালোমানুষি দেখাতে ভ্যালা ঝামেলা হল। —ছুঁড়ি এখন কখন আসে দেখ।

রাস্তা থেকে একটু দূরে জায়গাটা একটা ডোবার পাড়। নাবাল মাঠের মাঝখানে ডাঙা মতো। কিছু বড়ো বড়ো বাব্‌লা, খেজুর গাছ। আশশ্যাওড়া, চারা-বাব্‌লার পাতলা ঝোপ। তলানি কাদা-জল রয়েছে এখনো ডোবায়। বর্ষায় চাষীরা ডোবায় পাট পচায়। সারাটা পাড় ধরে পাটের ফেঁসো, টুকরো পাটকাঠি, পাটকাঠির গুড়ো।

আশশ্যাওড়ার ঝোপের আড়ালে বসে বংশী তাকাল সামনে। দু জন লোক

রাস্তা ধরে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা সাদা গরু খুব আস্তে আস্তে হেঁটে রাতের আস্তানায় ফিরছে। মাথার ওপর বাবলাগাছের পাতা বুজে গেছে। আকাশ বেশ তাড়াহুড়ো করে দিনের আলো গুটিয়ে নিচ্ছে মাঠ-ঘাটের ওপর থেকে। চারিদিকে আর একবার সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে বংশী বাক্সের ডালা খুলে হাপর বার করল। এখনো যথেষ্ট গরম। হাপর উল্টে মাটির ওপর উপুড় করে সোজা করল। ছাইয়ে আগুন রয়েছে। হাওয়া লেগে কয়েকটা অঙ্গারের টুকরো লাল গা দেখাল। এই ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে রয়েছে আনাভর সোনার একটুখানি টুকরো। ছাই হাঁটকে সোনার টুকরো খুঁজে নিতে হবে বংশীকে। একটা পাটকাঠি তুলে ছাই হাঁটকে সোনা খুঁজছে বংশী। ঘাড় নিচু। সতর্ক চোখের দৃষ্টি। আবছা অন্ধকারে ছাইয়ের মধ্যে কখন ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে একটু-খানি ছাইমাখা সোনালী জেল্লা!

'ব-ং-শী-ব-দ-ন'

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো রক্ত আছড়ে পড়ল। তারপরই মনে হল, শরীর খালি করে সমস্ত রক্ত পায়ের নলের মধ্যে দিয়ে কলকল করে নেমে যাচ্ছে মাটির মধ্যে। ঘাড় শক্ত। শরীরে লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আবছা-অন্ধকার। মাথার ওপর বাবলাগাছ। বংশীর গলা ঠেলে প্রায় বেরিয়ে আসছিল, রাম, রাম।

আস্তে আস্তে বংশী ফিরে পেল নিজেকে।—ডাকটা চেনা! খুবই চেনা!

ধাতস্থ হয়ে আবার ছাইয়ের দিকে চোখ নামাতে গিয়ে নজর গেল নাবাল মাঠের ওপারে। ছায়ার মতো গাছপালার পাঁচিল। গ্রামের সীমারেখা। এক জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখা যায়। বংশী ভাবল, ওইটাই কি পদ্মদের বাড়ি! দিদিমা কি এই ভর-সন্ধ্যাবেলা নতুন করে ধান-ভাপানোর কড়া চড়িয়েছে উনোনে। কাল ভোরভোর উঠোনে বিছিয়ে ধান শুখোতে দেবে। সকালবেলাটা যেন চোখের ওপর ফুটে উঠল বংশীর। —বেড়ার খুঁটি ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়ে। সবুজ ডুরে শাড়ির আঁচলের শক্ত করে বাঁধা গিটের মধ্যে আনাভর পেতলের টুকরো। আনাভর কেন, বেশিই হবে। দেবার সময় দরাজ হাতে বেশ বেশি-বেশিই দিয়েছে বংশী। আঁচলের গিঁটে পেতলের টুকরো মুঠোয় চেপে বুকের মাঝখানে নিয়ে মেয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখবে সারারাত।

সামনে ছাইয়ের স্তূপ। ওর মধ্যে রয়েছে আনাভর সোনা। হাতে পাটকাঠি। ছাই হাঁতড়ে সোনা খুঁজবে। গ্রামের সীমারেখার দিকে তাকিয়ে বংশী ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

জন্মভূমি

অনাদির রবিবারের রুটিন-কাজ এগুলো। অফিসের তাড়াহুড়ো নেই। স্নানে যাবার ঘণ্টা-দুয়েক আগে কাজে লাগে। ঘরের সিলিংয়ের কোণার দিকে, জানলা-দরজার কপাটের আড়ালে কোথায় ঝুল জমেছে, মাকড়সা জাল পেতেছে —ঝুল-ঝাড়নে আলতো করে জড়িয়ে নেয়। বসার ঘরে পাখার তলায় টুল টেনে এনে, শোবার ঘরে খাটে উঠে পালখের ঝাড়ন ঝুলিয়ে পাখার ব্লেডের ধুলো পরিষ্কার করে। ছাদে উঠে দেখে জল বেরুবার নালি পাতাটাতা পড়ে বুজে আছে কিনা।

স্নানে যাবার ঠিক আগের কাজ বাগানের নর্দমা। পাঁচিলের পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের বড় নর্দমায় পড়েছে। বাতিল, ক্ষয়া একটা ঝাঁটা রাখা থাকে পাঁচিলের কোণায়। একটা দোমড়ানো ডোঙা-মতো-করা ক্যানেস্তারার টুকরো। ঝাঁটা ছোঁবার আগে কুয়ো থেকে দু বালতি জল তুলে রাখে কুয়ো-পাড়ে। নর্দমায় ঝাঁটা বুলিয়ে নোংরা জড়ো করে ক্যানেস্তারায় তুলে ফেলে আসে পাঁচিলের ওপাশে। এসে হাঁক দেয়, কই গো। কোথায় গেলে— এ।

শোভনা এসে জল ঢেলে দেয়। অনাদি শেষবারের মতো নর্দমায় ঝাঁটা বুলোয়। একটা সুতো-সরে-যাওয়া জ্যালজ্যালে লুঙ্গি, গত দোলের রং-বেরংয়ের ছোপধরা হাফ-হাতা গেঞ্জি, মাথায় পাগড়ি করে জড়ানো গামছা অনাদির এ সময়ের কাজের পোশাক।

বসার ঘরে সাদা দেয়ালে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জলবসা দাগ। রেকর্ড বর্ষা এ বছর। এখন ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ সবে শেষ হয়েছে। ঋতুর হিসাবে শরৎ কাল। বাগানের শিউলি গাছে ঝেঁপে ফুল এসেছে। স্থলপদ্মের ডালে ডালে প্রচুর কুঁড়ি। ভোরের দিকে রোদ অন্য রকম। তাহলেও বর্ষা শেষ হল বলা যায় না। কাল রাতেই এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত একটানা গম্ভীর বৃষ্টি। ভোর পর্যন্ত টিপটিপ। এখন অবশ্য রোদ। ভাদ্রের মধ্য-দিনের চড়া রোদ। শরীরের সমস্ত নুন টেনে বের করে আনে ঘামের সঙ্গে। রোদের দিকে তাকালে মাথা ধরে যায়। দেয়ালে জলবসা দাগ তো কি! ছাদ ফুটো করে মাথায় জল পড়েনি এ

বছর এই ঢের।

নজর করে ঝুল ঝাড়ছে অনাদি। হাতে ঝুল-ঝাড়ন। টিউবলাইটের তলায় পাতলা মাকড়শার জাল। ঝুল-ঝাড়নে জড়িয়ে নিল। মাকড়শাটা আটপায়ে দেয়াল বেয়ে পরিত্রাহি দৌড় লাগল। এদিকের দেওয়ালেও জলবসা দাগ। অনাদি ভ্রূ-কুঁচকে দেখলো। আগে ছিল না। কালরাতের বৃষ্টির জল ছাদ-চুঁইয়ে দেয়ালের ভেতরে ঢুকেছে! ঠিক ওপরের ছাদের নালির মুখ বুজে আছে কিনা দেখা দরকার।

ছাদের আর দোষ কি? জলছাদ করে উঠতে পারেনি। আলসের পাঁচিল হয় নি। বাইরের দেয়ালের পলেস্তারা বাকি। এখনো প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা শোধ হয় নি। শোভনার গহনা বন্ধক আছে সমবায় ব্যাঙ্কে। শেষ কিস্তি খেলাপি যাচ্ছে। সুদের ওপর সুদ চড়ছে। ছেলে দীপু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলো। মেয়ে পাপড়ি মাধ্যমিকের বেড়া উত্‌রোলো। কলেজে ভর্তির ফি। বই-পত্তর। পোশাক-আশাক। অনাদি তাল মেলাতে পারছে না। তার ওপর সামনেই পুজো। জলছাদ, আলসের পাঁচিল, বাইরে পলেস্তারা এখন স্বপ্নবৎ। মাথা-গোঁজার মতো একটা ঠাঁই খাড়া করে ভাড়াবাড়ির বাস তুলে উঠে আসতে পেরেছে— এই যথেষ্ট। অনাদি মনে মনে আওড়ায় 'পাকা হোক তবু ভাই পরের বাসা / নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।'—সান্ত্বনা পায়, আনন্দ, স্বস্তি।

দেয়ালে নজর রেখে ঝুল-ঝাড়ন বোলাচ্ছে অনাদি। এই সময় প্রায়ই একা থাকে সে! রুটিন-কাজ। শরীর নড়েচড়ে কাজ করে যায় নির্ভুল। মন বিশাল একটা মহীরুহের শাখা-প্রশাখায় ছোট্ট একটা কাঠ-বেড়ালের মতো ল্যাচ নাচিয়ে তুরতুর ঘুরে বেড়ায়। সমস্যারও পূর্ণচ্ছেদ নেই। ভাবনারও ছেদ নেই। মাঝে মাঝে কিছু সুখস্মৃতিও ঢুকে পড়ে এর মধ্যে। যুবককালের দু-এক কলি গানের সুরও গুনগুনিয়ে যায়। শ্যামল মিত্রের দারুণ ভক্ত ছিল সে। সতীনাথ-মানবেন্দ্রের তখন টপ্‌ ফর্ম। মেয়েদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখুজ্জে, প্রতিমা বাঁড়ুজ্জে।

আজ দুম্‌ করে মনের পর্দায় আবার সেই ছবিটা ভেসে উঠলো। ···কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশজুড়ে বিনবিন তারা। জনা-কয়েক সমবয়সী ছেলে পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ। দু-পাশে ধু-ধু ফাঁকা ধানী মাঠ। পথে পায়ের পাতা-ডোবা ধুলো। ছেলেদের একজন পরনের ধুতির কোঁচা ফাঁপানো ঝোলার মতো করে নিয়েছে। ঝোলার মধ্যে একরাশ জোনাকি। জোনাকিগুলো জ্বলতে-নিবতে, জ্বলতে-নিবতে ঝোলার ভেতর দিকে কাপড়ের গায়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। একটা অস্পষ্ট সবুজ আলোর পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। সেই আলোয় পথ, মুখগুলো অস্পষ্ট কিন্তু আলোকিত! …ছবিটা যে ঠিক এই একই ভাবে ভেসে ওঠে অনাদির মনের পর্দায়— তা নয়। নানাভাবে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভেসে ওঠে। কখনো অনাদি নিজে দলের মধ্যে রয়েছে, পথ চলেছে— এইভাবে ছবিটা দেখে। কখনো যেন নিজে মাঠে দাঁড়িয়ে আলোসমেত দলটাকে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখছে— দেখে এই ভাবে। আবার এমনও মনে হয়, সে-যেন একটা পাখি। ডানায বাতাস কেটে ঠিক মাথার ওপর দিয়ে দলটার সঙ্গে চলেছে। পাখির চোখে নিচের দৃশ্য দেখার মতো করেও দেখে। মোট কথা, ছবিটাকে দেখে অনাদি। আর দেখে হঠাৎ-হঠাৎ একেকদিন।

আসলে ছবিটা কোনো কল্পচিত্র নয়। এই রকম একটা ছবি সহসা একদিন তার চোখের সামনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। ছবিটার শেকড় আছে। শেকড় মাটির মধ্যে। ছবিটায় একটা ঘটনার ছোঁয়াচ আছে। সব মনেও নেই। কতদিন আগের ব্যাপার — আটত্রিশ, উনচল্লিশ বছর। তখন তার বয়সই বা কত! হিসাব করলে এগারো-বারো।…বর্ধমান জেলার অজগ্রাম। চার মাইল দূরে রেল-স্টেশন। তিন মাইল দূরে বাস রাস্তা। বাবার যে দাদা-স্থবাদের আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল, তিনি অসুখে শয্যাশায়ি। বাবা দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে অনাদিকেও নিয়েছিলেন। এতোদূর আসা। দিনকয়েক ছিলেন সেই গ্রামে। একদিন বাড়ির, গ্রামের কটা ছেলের সঙ্গে পাশের গ্রামে মেলা দেখতে গিয়েছিল অনাদি। দু গ্রামের মাঝখানে ধানিমাঠ। ফিরতে রাত হলো। আলোটালো সঙ্গে নেই। একটা ছেলে বুদ্ধি খাটিয়ে জোনাকির আলো বানিয়েছিল।

অনাদি ভাবে, জীবনের কতো ঘটনাই তো ভুলে গেছে। কিন্তু এই ছবিটা কী মারাত্মক জীবন্ত!— কেন? আজন্ম মফস্বল শহরের ছেলে সে। গ্রামের সঙ্গে তার পরিচয়ই ছিল না। ছবিটা এতো জীবন্ত কি এই সরল কারণে?— নতুনত্ব, অভিনবত্বের জন্যে? মনের সমর্থন মেলে নি। অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে এসেছে, ছবিটা এতো জীবন্ত তার রঙের জন্যে। কি অদ্ভুত রঙ! শুধু রঙটাই নয়। রঙের সঙ্গে যেন আরও কিছু মিশে আছে। মিশে আছে শান্ত একটা বেদনা। স্বপ্নের বেদনার মতো। যে-বেদনা শুধু স্বপ্নেই আসে। স্বপ্নের মধ্যে নিঃশব্দে চোখের কোল ভিজে যায়। ঘুম ভাঙলে কিছু মনে থাকে না। শুধু বেদনাবোধ মন আচ্ছন্ন করে থাকে।

বাগানের গেট খোলার আওয়াজ হল।

অনাদির মুখ দেয়ালের দিকে। গেট খোলার আওয়াজে অনাদির মনে হল,

পাপড়ি গানের স্কুল সেরে ফিরলো। অনাদি হাতের কাজ করতে করতে অপেক্ষা করছে গেট বন্ধ হওয়ার শব্দের জন্যে। শব্দ হচ্ছে না। বিরক্ত হলো, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কি যে এতো ব্যস্ততা। গেট বন্ধ করার কথাটাও মনে থাকে না। এখনই গরু-ছাগল ঢুকে গাছ মুড়োতে শুরু করবে। নিজেদের তো করতে হয় না এসব। ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে অনাদি অবাক। —গেটের সামনে একটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। এক ভদ্রলোক রিকশা থেকে নেমে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। হাত গেটের ওপর ছিটকিনিতে। ছিটকিনিটা অন্যমনস্ক হাতে নাড়াচ্ছেন। ফর্সা রঙ রোদ্দুরে লালচে। মাথার চুল একটু বা পাতলা। পরনে চওড়া পাড়ের ধুতি। কালো পাড় রোদ্দুরে চকচক করছে। ডান পকেটে কোঁচা গোঁজা। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির কাঁধ ঘামে চাবুচুবু। লেপটে রয়েছে শরীরের সঙ্গে। হাতকাটা জালি গেঞ্জি পাঞ্জাবির উপর ফুটে উঠেছে। ডান হাতে ঝুলছে অ্যাটাচি ব্যাগ। রিকশার হুড তোলা। ভেতরে কেউ একজন বসে আছে। অনাদি বুঝতে পারছে— দেখতে পাচ্ছে না। তবে মোজা-জুতো সমেত একজোড়া পা দেখে অনুমান করছে, একটা ছোটো ছেলে। দৃষ্টি সরিয়ে আবার ভদ্রলোকের মুখে ফেলতে অনাদির মাথার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটলো। —সুবিমল!

কয়েক মুহূর্ত অনাদি কি-করবে ঠিক করে উঠতে পারলো না। হাত পা নড়ছে না। তারপর হাতের ঝুল-ঝাড়ন ফেলে একছুটে দরজা খুলে দাঁড়ালো। গেটের ওধারে ভদ্রলোকের ঠোঁটে হাসি ফুটতে দেখে বিভ্রম কেটে গেল।

বিমলে—, চীৎকার করে অনাদি প্রায় ছুটে গিয়ে গেটের এধার থেকে জড়িয়ে ধরল সুবিমলকে।

বাড়ি করার পর নিরাপত্তা বোধেই হোক বা বয়সের জন্যেই হোক, অনাদির বেশ একটু ভুঁড়ি হয়েছে। গেটের গ্রিলে চাপ লাগছে। জড়িয়ে ধরাও হয়ে গেছে বেশ সাপ্‌টে।

আরে— ছাড় ছাড়—, সুবিমল বন্ধুর পিঠে দুবার চাপড় মেরে আলিঙ্গনমুক্ত করল নিজেকে। অনাদির বেশ-বাসের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কি রে— ? কা করছিলি ?

কি সুন্দর ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুবিমল! মুগ্ধতাটাকে তাড়িয়ে অনুভব করে নিজের সম্পর্কে সচেতন হবার সময় পেল অনাদি। ছি ছি করল নিজেকে। এই বেশে, ঘেমো শরীরে সে কিনা জড়িয়ে ধরেছিলো সুবিমলকে। লজ্জিত ভাব কাটাবার জন্যেই যেন একটানে মাথার পাগড়ি খুলে সপ্রতিভভাবে

বলল, গৃহসেবা।

স্থবিমল বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এই বাড়ি করেছিস?

ওই কোনরকমে একটা খাড়া করা আর কি।

গত আট বছর স্থবিমলের সঙ্গে যোগাযোগ কেবল চিঠিপত্রে। চিঠিতেই অনাদি জানিয়েছিল বাড়ি করবে মনস্থ করেছে। ভিত্-পুজো হল। লিনটেল পর্যন্ত তুলেছে। অপেক্ষা করতে হবে কিছুদিন। হাতখালি। ছাদ ঢালাই হল। —গৃহপ্রবেশের দিন— সতেরোই অগ্রহায়ণ।

কিন্তু তুই কবে এদেশে এ'লি?

পরশু — কেন চিঠি পাসনি?

না—, অনাদির স্বরে দলা পাকানো বিস্ময়।

পাসনি? দেশে আসার একটা কথা হচ্ছে জানিয়ে দুমাস আগে চিঠি দিয়েছি —শব্দটার ওপর জোর দিল স্থবিল,— বেশ মনে আছে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চিঠি দিয়েছি।

রাগ, বিরক্তি, হতাশা শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ হয়ে গলার স্বরে উঠে এলো, এদেশের পোস্টাল্-সিসটেম! —সব কিছু কোলাপ্স করছে— তারপর জিজ্ঞেস করলো, কোথায় উঠেছিস?

কেন— কোলকাতা, স্থবিমল স্থর করে টেনে টেনে বলল, শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী—।

অনাদির খেয়াল হল, স্থবিমল ভীষণ ঘামছে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে। ঝুলপির তলা থেকে ভরন্ত, মসৃণ গাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। চোখে ঈষৎ ক্লান্তি। ভাদ্র মাসের গরম। এক ফোঁটা হাওয়া নেই।

ড্যাড্—, খুব মৃদু, অবসন্ন স্বর ভেসে এল রিকশার হুডের তলা থেকে।

সহসা ছেলেটার কথা মনে হল অনাদির। —তাই তো, স্থবিমলের ছেলে প্রসেনজিৎ বসে আছে রিকশায়। তার কি কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না? এই গরমে রিকশার ক্যাম্বিসের হুডের তলায় বসে সিদ্ধ হচ্ছে অতটুকু ছেলেটা— আর তারা দিব্য গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। —আহা বেচারী! তাড়াতাড়ি গেট খুলে অনাদি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই স্থবিমল ডাকলো, রাজা নেমে এসো।

হোঁচট খেল অনাদি।—রাজা? রাজা কে? স্থবিমলের তো একটিই ছেলে জানে। আট বছর স্টেট্সে রয়েছে স্থবিমল, অলি। আর একটা ছেলে হতেই পারে! কিন্তু সেরকম কিছু হলে অনাদি জানবে না— অসম্ভব। তাছাড়া

প্রসেনজিৎ নাম অনাদিরই ঠিক করা। খুব পছন্দ হয়েছিল সুবিমলের বউ অলির।

উগ্র আগ্রহ নিয়ে অনাদি সাইকেল রিকশার দিকে তাকিয়ে আছে। যে নেমে এলো তাকে দেখে অনাদিকে বলে দিতে হল না, এর নাম প্রসেনজিৎ। যদিও আট বছর দেখা নেই। কিন্তু সেই চোখ, সেই মুখ, কোঁকড়া চুল। রঙ অবশ্য অনেক ফর্সা হয়েছে এখন। ছোটবেলাকার সুবিমল— অবিকল। প্রসেনজিতের জন্ম এখানেই। ওর যখন দু'বছর বয়েস পূর্ণ হয়েছে—সুবিমল পাড়ি দেয় স্টেট্‌সে। অনাদি ভাবল, তাহলে সুবিমল রাজা বলে ডাকল কেন? পরে ভাবল, হয়ত ডাক-নাম রেখেছে। কিন্তু তার আগে ছেলেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। একেবারে কাহিল, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সারা মুখ গনগনে লাল। পাতলা ঠোঁট শুকিয়ে সাদা। সারা মুখে ঘাম। দুটো হাত দিয়ে ঘামের ধারা গড়াচ্ছে। একটা ধূসর রঙের, সরু সরু সাদা স্ট্রাইপ-দেওয়া হাতকাটা গেঞ্জি পড়ে আছে। আঁটো শর্টস্। সাদা মোজার সঙ্গে গেঞ্জির রঙ জুতো। বলে দিতে হয় না, পোশাকের কোনোটাই এদেশের তৈরি নয়। গেঞ্জিটা দেখে অনাদির মনে হল, গা-থেকে টেনে ছাড়িয়ে নেয়। রাগ হল সুবিমলের ওপর। ভাবল বলে, রাস্কেল—এই গরমে ওইটুকু ছেলেকে এই রকম একটা মোটা গেঞ্জি পরায়? —নিজে তো শালা আদ্দি মারিয়ে এসেছো।।

গেট খুলে ছোট্ট মানুষটিকে অভ্যর্থনা করার জন্য সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে অনাদি।

সুবিমল বলল, কাকা। প্রণাম করো।

রাজা ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি অনাদির মুখের ওপর ফেলে কোমর নুয়ে পা-ছুতে যাচ্ছে। অনাদি ধরে ফেলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে রাজাবাবু। কতো বড়টি হয়ে গেছ তুমি?

সুবিমলের যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে পার্স বার করে রিকশাঅলাকে জিজ্ঞেস করলো, কত?

অবাঙালি রিকশাঅলা। ছোকরা। মস্তান-মস্তান চেহারা। অম্লানমুখে বলল, দু টাকা।

কি, দু টাকা? এক টাকা দে। স্টেশান থেকে ওইই ভাড়া, অনাদি ঝেঁঝে উঠল।

ঠাণ্ডা দৃষ্টি অনাদির মুখে ফেলে রিকশাঅলা বলল, ধুপ্‌ দেখচেন? কিত্‌না টাইম খাড়া করে রাখলেন?

ধূপ কি আমি তৈরি করেচি যে আমায় ট্যাক্সো গুণতে হবে—, আরও কি-সব বলতে যাচ্ছিল অনাদি।

সুবিমল বাধা দিল, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

একেবারে কারেন্সি থেকে বেরুনো করকরে পাঁচ টাকার নোট রিকশাঅলার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, খুশি তো?

কেমন অবলীলায় নোটটা হাত বাড়িয়ে নিল রিকশাঅলা ছোকরা। কোমরের কাছে প্যান্টের চোরা-পকেটে গুঁজে রাখল। তারপর সাইকেল রিকশা চালিয়ে চলে গেল। একটা ছোট্ট সেলাম, মুখে একটু সকৃতজ্ঞ হাসি ফুটে ওঠা দূরে থাক সুবিমলের প্রশ্নের উত্তরটাও দেওয়া দরকার মনে করল না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেল অনাদি। সুবিমলের ওপর রাগ হল। বলেও ফেলল, অনেক বেশি দিলি। আমরা এক টাকা দিই। ওটাই রেট।

সুবিমল বলল, যেতে দে।

রাজা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে মনে কোনো রকমে খাড়া রেখেছে শরীরটাকে। দুটো চোখ আধবোজা। দরদর ঘামছে। অনাদির ভয় হল, অজ্ঞান না হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি রাজার কাঁধে হাত রাখল, চল, চল। ঘরে চল। পাখার তলায় বসবি চল।

বলে আবার মনে হল, পাওয়ার আছে তো?

বসার ঘরে চারটে বেতের টোকা-চেয়ার। চেয়ারে পাতলা ঘরে-তৈরি তুলোর গদি। গদির ঢাকাগুলো বোধ হয় শোভনা কাচতে নিয়ে গেছে আজ। বেতের নিচু টেবিল। তক্তাপোশের ওপর মেদিনীপুরের কল্কাতোলা সরুকাঠির মাদুর। দেয়াল আলমারিতে কিছু বই, পুতুল। কাচের পাল্লায় সাটা অলিম্পিকের ঈগলশ্যামের স্টিকার।

আয়, আয়। অনাদি ঘরে ঢুকেই সুইচ-বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সুইচ দিতেই পাখা পাক খেল। নিশ্চিন্ত হয়ে অনাদি রেগুলেটারের নবে মোচড় দিয়ে ফুলস্পীড করে দিল। দুহাতে দুটো চেয়ার সরিয়ে এনে একেবারে পাখার তলায় দিয়ে বলল, বোস।

সুবিমল পায়ের নতুন-কেনা স্যাণ্ডেল ঘরে ঢোকার মুখে দরজার পাশে খুলে রাখল। ডাকল, রাজা?

বাবার ইঙ্গিত বুঝে রাজা ফাস্‌নার টেনে জুতো খুলল।

আরে থাক না—, শশব্যস্তে বলে উঠল অনাদি।

ততক্ষণে রাজা সুবিমলের পাশে সাজিয়ে রেখেছে জুতোজোড়া।

অ্যাটাচি ব্যাগ পাশে রেখে চেয়ারে বসল সুবিমল। পাশের চেয়ারে রাজা। অনাদি দেখল, চোখ বন্ধ করে আছে দু-জনেই। যেন পাখায় বাতাস শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে শুষে নিচ্ছে। অনাদি সুবিমলকে দেখছে, কি দারুণ দেখতে হয়েছে সুবিমল। খুব রোগা ছিল। এখন কি সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ের রঙ বরাবরই ফর্সা সুবিমলের। এখন তাতে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, চামড়ায় রক্তের আভা ফুটে উঠেছে। মাথার চুল পাতলা হয়েছে অবশ্য একটু।

খানিকক্ষণ বাদে চোখ খুলে ছেলের দিকে তাকাল সুবিমল। রাজা টোকা-চেয়ারে পা তুলে এলিযে আছে। সুবিমল বোধহয় পা নামিয়ে বসতে বলতে যাচ্ছিল রাজা ক। তার বদলে অ্যাটাচি কেস্ টেবিলে তুলে খুলে ফেলল। ব্যাগ হাতড়ে দুটো প্যাকেট কাগজের রুমাল বার করল। রাজার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা, ঘাম মুছে ফেলো। নিজেও কাগজের রুমাল কপালে আস্তে আস্তে থুপেথুপে ঘাম শুষে নিতে লাগল।

মৃদু, শীতল গন্ধ ছড়িয়ে গেল ঘরে। ওডিকোলনের গন্ধের সঙ্গে যেন টাটকা পাতিলেবুর গন্ধ মেশানো। প্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গেলেই শরীর জুড়িয়ে যায়। অনাদি বলল, রাজার গেঞ্জিটা খুলে দে না। —যা মোটা।

না-রে, সুবিমল বলল, গেঞ্জিগুলো আসলে এই রকম গরম আবহাওয়ায় পরার জন্যই তৈরি। শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

অনাদি ভাবল, দেখো কাণ্ড! মানুষের একটু সুখ, একটু আরামের জন্যে কতো কিছু মাথা খাটিয়ে বানায় ওরা। আর আমাদের দেশ? যা ছিল তা তো গেছেই। যা এখনো হয়ত অবশিষ্ট আছে, সেটুকু নষ্ট করার জন্যে হামলে পড়েছে। কিসসু হবে এদেশের?

অনাদির মনে হল, শোভনা বাড়ির ভেতরে। সুবিমল এসেছে— এ দারুণ খবরটা জানে না নিশ্চয় এখনো। তা ছাড়া এদেরও উপস্থিত একটু সরবৎ-টরবৎ দেওয়া দরকার। বলল, বিমলে, বোস একটু। শোভনাকে খবরটা দিয়ে আসি।

সুবিমল কিছু বলল না। ঝকঝকে দাঁতে হাসল।

শোভনা বাড়ির যতো কাপ-ডিশ নিয়ে বসেছে রকের ধারে। বাঁ-পাশে পলিথিনের গামলায় সাবান-জল। তাতে কাপ-ডিশ ডোবানো। ছোবড়া দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ডান পাশে বালতির জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এসব শোভনার রবিবারের রুটিন কাজ। ঘামছে। গরমে ভেতরে কিছু পরেনি। সাদা ব্লাউজ ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে পেঁয়াজের খোসার মতো সেঁটে আছে। হাতার দিকটায় সেলাই খুলে গেছে ব্লাউজের।

পাশে দাঁড়িয়ে অনাদি ব্যস্তভাবে বলল, ওঠো। ওঠো শিগগীর।

কাপের ভেতর দিক ছোবড়া ঘষে পরিষ্কার করতে করতে এতটুকু ব্যস্ততা প্রকাশ না করে শোভনা বলল, কেন?

আঃ। ওঠো না, বিরক্তভাবে অনাদি বলল, আরে সুবিমল এসেছে।

সুবিমল আবার কে? শোভনার সাদামাটা জিজ্ঞাসা।

আরে সুবিমল। আমাদের বিমলে।

শোভনার হাত থেমেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে অনাদির মুখের দিকে তাকাল। নাকের ডগায় জমা ঘামের ফোঁটা টুপ করে ঝরে পড়ল। দুচোখে অবিশ্বাস, যাঃ।

আরে হ্যাঁ। ছেলেকে নিয়ে এসেছে। দুমাস আগে দেশে আসতে পারে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল আমায়। সে-চিঠি পাইনি। পরশু ল্যাণ্ড করেছে দমদমে। আর আজই চলে এসেছে এখানে।

আমার কাছে বললেই যেন খুশি হতো অনাদি। কেমন লজ্জা করল। কিন্তু সুবিমল পরশু এ-দেশে এসে আজই কলকাতা থেকে এই গরমে ছত্রিশ কিলো-মিটার পথ ঠেঙিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে— ব্যাপারটার মধ্যে তার যে একটা গর্ববোধ হচ্ছে, কথার স্বরে, ভঙ্গিতে প্রকাশ না-করে পারল না। তাড়া লাগাল, এসো তাড়াতাড়ি।

যেতে উদ্যত হয়ে অনাদি থামল। শোভনার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরে দই তো আছে। পাতিলেবু আছে?

শোভনা হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি হাত ধুচ্ছে, —আছে।

শোনো। দু গেলাস ঘোল করে নিয়ে এসো। আর—

শোভনা দাঁড়িয়ে উঠেছে। আঁচলে ভিজে হাত মুছছে।

বউয়ের দিকে তাকিয়ে অনাদি বলল, শাড়ি-টাড়িগুলো বদলে এসো আসার সময়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনাদি বলল, হ্যাঁরে বউকে আনিস নি?—অলিকে?

সুবিমল ঘাড় নাড়ল।

আনলি না কেন, অভিমানী স্বরে অনাদি জিজ্ঞেস করল।

তিনি এখানে এসে অবধি তার বাবার ঠাণ্ডা ঘরটা থেকে বেরুচ্ছেনই না। কোনো রকমে খাবার সময় টেবিলে এসে বসেন। মাথার ওপর পাখা ঘোরে। পাশ থেকে পেডেষ্টাল ফ্যান। বারান্দার খসে অনবরত জল দেওয়া তো আছেই।

রাজা তেমনি পড়ে আছে চেয়ারে। গায়ের ঘাম শুকিয়েছে। হাতটা

ঝুলছে চেয়ারের বাইরে। মুঠোয় কাগজের রুমাল আলগা করে ধরা।

বিমলে—, অনাদি .লা নামিয়ে বলল, রাজার বোধহয় ঘুম পেয়েছে। ও ঘরের বিছানায় ফ্যানের তলায় শুইয়ে দিয়ে আসি।

ছেলের দিকে তাকিয়ে কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল স্থবিমলের, এখানকার সময়ের সঙ্গে এখনো ঠিক মানিয়ে নিতে পারে নি। আমি যেখানে থাকি সেখান-কার সময়ের সঙ্গে এখানকার সময়ের প্রায় সাড়ে-এগারো ঘণ্টার তফাত। হিসেব মতো—কব্জি উল্টে ঘড়িতে সময় দেখে বলল, ওখানে এখন রাত সোয়া এগারোটা। ওর এখন ঘুমোবার সময়।

অনাদি ভাবল, দেখো কাণ্ড! সেই একই পৃথিবী। কিন্তু কতো সব ফ্যাকড়া।

শোভনা ঘরে ঢুকলো। হাতে ট্রে। ট্রেতে ঘোলের সরবৎ। সোনালি বর্ডার দেওয়া সরবতের সেটের গেলাস। গেলাশের ওপর কুরুশে বোনা ঢাকা। ঢাকায় বড়ো বড়ো পুঁতি বসানো। অনাদি বুঝলো সবই তাড়াহুড়ো করে আলমারি থেকে বার করেছে শোভনা। ট্রেতে অনাদির জন্যও এক গেলাস ঘোল রয়েছে। অর্ডিনারি গেলাস। ঢাকা নেই। শাড়ি-ব্লাউজ বদলে এসেছে শোভনা। চুলে চিরুনিতে কটা দ্রুত টান। মুখে হালকা একটু প্রসাধন।

স্থবিমল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে মুখে নকল গাম্ভীর্য। দুটো হাত বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে বলল, স্বাগতম দেবী! সুস্বাগতম।

আহা—, চোখে লজ্জা নিয়ে শোভনা বলল, এতদিনে মনে পড়ল তাহলে?

এ শ্রীমুখ যে একবার দর্শন করেছে সে কখনো ভুলতে পারে?

এখনো যে শোভনার মুখ এমন কিশোরীর মুখের মতো রাঙা হয়ে উঠতে পারে—ভাবতে পারে না অনাদি। ভাবলো স্থবিমলটা তেমনিই রয়ে গেল। তেমান ফিচেল শয়তান।

রাজা তাকিয়েছে। স্থবিমল চোখ দিয়ে ইশারা করল—অনাদির নজর এড়াল না। রাজা উঠে এগিয়ে গেল শোভনার দিকে। হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

শোভনার হাতে ট্রে। ও—মা, বলে গলায় বিস্ময়ের শব্দ করে তাড়াতাড়ি ট্রে নামিয়ে রাখল মাঝখানের টেবিলে। হাত বাড়িয়ে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিল রাজাকে, কতো বড়োটি হয়ে গেছ।

মেঝের ওপর হাঁটুভেঙে বসে দু-করতলের মধ্যে রাজার মুখ ধরে খুঁটিয়ে দেখছে শোভনা। ঠাণ্ডা চোখে একেবারে শোভনার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে রাজা। যেন নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে শোভনার হাতে। অনাদিকে

উদ্দেশ্য করে মুগ্ধস্বরে শোভনা বলল, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে— না গো ?

বলে আবার রাজার হাত তুলে নিয়ে কড়ে আঙুলে আস্তে করে দাঁতের দাগ ধরিয়ে দিল।

নে···নে···সরবৎটা খেয়ে নে, পাছে সুবিমল ট্রে থেকে অর্ডিনারি গেলাসটা তুলে নেয় সেই ভয়ে অনাদি আগেভাগে নিজের গেলাস তুলে নিল।

ড্যাড্···, সুবিমল মুখের দিকে তাকাতে রাজা করুণ গলায় বলল, ওয়াটার।

ব্যস্ত হয়ে উঠল অনাদি, হ্যাঁ জল—, শোভনার দিকে তাকিয়ে বলল, এক গেলাস জল নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।

জল আনতে সামান্য দেরি হল শোভনার। আলমারি থেকে আর একটা সরবত সেটের গেলাস বার করতে হয়েছে। ধুতে হয়েছে। রাজা আবার গিয়ে চেয়ারে বসেছে। শোভনা জল নিয়ে রাজার সামনে দাঁড়িয়েছে। রাজা তৃষ্ণার্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুবিমল বলল, হ্যাঁরে—জল ফোটানো তো ?

অনাদি তাড়াতাড়ি বলল, ভালো জল। —টিউবওয়েলের—।

সুবিমলের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। অ্যাটাচি ব্যাগ তুলে নিয়ে খুললো। বলল, এসে যা দেখেছি তাতে তো মনে হয় দেশের পাতালটা পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত হাতে একটা ছোট্ট ফাইল বার করল সুবিমল। সরষের দানার মতো একটা বড়ি গেলাসের জলে ফেলে রাজাকে বলল, একটু পরে খেয়ো।

অনাদি একটু যেন দমে গেল। টিউবওয়েলের জল। খাবার জল তারা টিউবওয়েল থেকেই নেয়। কাজের মেয়েটি মোড়ের টিউবওয়েল থেকে নিয়ে আসে। বুঝল, সুবিমল গেলাসে যে বড়িটা দিল সেটা ওয়াটার-পিউরিফায়ার ছাড়া কিছু নয়।

শোভনা জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো সাহেব ছেলে— নাম কি তোমার ?

অনাদি উদগ্র কৌতূহলে কান খাড়া করে রেখেছে। এখুনি রাজা বলবে, প্রসেনজিৎ রায়। সুবিমল, অলি, শোভনাও হয়ত ভুলে গেছে। মনে রাখার কথাও নয়। নামটা পছন্দ করেছিল সে। নামটার সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে।

রাজা রয়—, স্পষ্ট উচ্চারণে জবাব দিল রাজা।

অনাদি বেশ অবাক। একটু আহত হয়ত বা। থাকতে পারল না। বলল, হ্যাঁরে বিমলে—, নাম রাখা হয়েছিল তো প্রসেনজিৎ। নামটা কি বদলে রাখলি ?

আরে সে-এক বিভ্রাট—, সুবিমলের যেন কোনো মজার ঘটনা মনে পড়েছে

সেইভাবে বলল, ওদেশে আমি যেখানে থাকি সেখানে কয়েকটি ভারতীয় পরি-বার থাকে অবশ্য। বাঙালি একজনও নেই। বাকি সব ওদেশের লোক। যাবার কয়েকদিন পরে শুনলাম ওরা কি একটা অদ্ভুত নামে ওকে ডাকছে। বুঝলাম, প্রসেনজিৎ নামটা উচ্চারণে অসুবিধা হচ্ছে ওদের। শব্দটা প্রসেনজিতের বিকৃত উচ্চারণ। অলি আর আমি অনেক মাথা ঘামিয়ে রাজা নামটা বার করলাম। ছোটো নাম। তার ওপর ভারতীয় মহারাজা শব্দের সঙ্গে ওদের খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও আছে।

ঠুং করে মনের ভেতর কোথা, যেন ঘা খেল অনাদি।

রাজা জিজ্ঞেস করল, ড্যাড্, মে আই ড্রিংক দা ওয়াটার নাউ ?

সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল সুবিমল।

শোভনা জিজ্ঞেস করল, ছেলে বাংলা বলতে পারে ?

ওইটাই হয়েছে মুশকিল, সুবিমল চিন্তাগ্রস্তভাবে বলল, বুঝতে পারে সবই —বলতে পারে না। একেবারে যে পারে না তা নয়। বলতে শুরু করে একটু পরে সঠিক শব্দ খুঁজে পায় না। খুব অস্বস্তি বোধ করে। বোধ হয় খানিকটা লজ্জাও পায়। মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। —বড়ো হচ্ছে তো ! আসলে ওদেশে বাংলা বলার সুযোগ তো খুব কম। অলি বা আমি কতক্ষণ আর বাড়ি থাকি।

অনাদির মনে পড়ল, অলি যথেষ্ট শিক্ষিতা। সুন্দরী তো বটেই। ওদেশের বেশ নামী একটা সংস্থায় চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

সুবিমল বলল, আমারও সেইজন্য বাংলা বলার জন্য বেশি চাপটাপ দিই না।

শোভনা একটা মোড়া টেনে এনে বসেছে।

গল্প শুরু হল। অনেক গল্প। হালকা রসিকতাও বাদ গেল না।

সুবিমল আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে বলল, ট্রাম-বাস, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা রে ! —তুই রোজ কোলকাতা যাতায়াত করিস কি করে ?

ও-ই—, অনাদি কেমন যেন লজ্জা পেল, না করলে চলবে না— তাই করতে হয়।

ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠলাম— সুবিমল বলে চলে, কামরায় একটা পাখা, আলো নেই ; দরজা-জানালা বন্ধ করার শাটার নেই। সবগুলো বসার সিটও নেই। কারা খুলে নিয়ে গেছে। কামরা বোধ হয় কোনোকালে পরিষ্কারও হয় না। টিকিট-ফিকিট চেক করারও বোধ হয় কেউ নেই। ফার্স্ট ক্লাসে বস্তা বস্তা প্লাইউডের ছাঁট, কয়লার গুঁড়ো। —কি ভিড় ! উঠতেই পারি না। অনেক কষ্টে উঠে বসার জায়গা দূরে থাকা পা রাখার জায়গাটুকুও পাই

না। তার মধ্যে ঝগড়া, চেঁচা-মচি। —কি করে যে এসেছি! রাজা তো গরমে, ওইসবের মধ্যে পড়ে এতো ক হিল হয়ে পড়েছে।

তোরও আক্কেল বলিহারি—অনাদি বেশ রাগ দেখিয়ে বলল, ইণ্ডিয়ায় আসার জন্য কেউ বছরের এই সময়টা বাছে? শীতের দিকে আসা উচিত ছিল তোর। কত দিন এই ক্লাইমেটের সঙ্গে তোরা অ্যাকাস্টম্পড নোস বল তো? — আমরাই হাঁপিয়ে উঠি।

এ-কথার উত্তরে সুবিমল কি রকম যেন গম্ভীর হয়ে গেল। কেটে কেটে বলল, এলাম নয়। আসতে হল।

অনাদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

সুবিমল হেসে গম্ভীর পারিবেশ সহজ করার মতো করে বলল, বলবো। সব বলবো। আগে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। —ওঃ কোলকাতা ফেরার জন্য ট্রেনে ওঠার কথা ভেবে আতঙ্ক হচ্ছে।

না, না। ফেরার সময় তোকে ভালো ট্রেনে তুলে দেবো। লোকাল ট্রেন। একটু আগে স্টেশনে গেলে জানালার ধারে ভালো জায়গা পাওয়া যায়, অনাদি যেন প্রাণপণে আশ্বস্ত করতে চাইল সুবিমলকে।

সুবিলল বলল, আলো, রাস্তাঘাট— কি হয়েছে রে দেশটা? আছিস কেমন করে?

আছি কি আর— অনাদি ক্লিষ্ট হাসল, টিকে আছি আর কি!

সুবিমল ঘড়ি দেখল, আমায় উঠতে হবে রে।

সে কি, শোভনা অনাদি একসঙ্গে বলে উঠল।

একবার বাড়ি যেতে হবে। ট্রেন থেকে নেমে সোজা এখানে এসেছি।

সুবিমলদের পৈতৃক বাড়ি স্টেশনের ওপারে। রেল লাইনের পূর্বদিকে। আগে ওদিকে কিছু রেলের কোয়ার্টার, সাধারণ মানুষের বসতি ছিল। দেশ ভাগের পর অনেকগুলো কলোনি গড়ে উঠেছে। এখন তো খুবই জম-জমাট। একটা সিনেমা হল পর্যন্ত হয়েছে। জায়গাটাকে পৌরসভার এলাকার মধ্যে আনার জন্য জোর তৎপরতা চলেছে।

অনাদি বলল, বাড়ি তো যাবিই—। দুটো ডাল-ভাত খা। বিশ্রাম কর। তারপর বিকেলের দিকে গেলেই হবে।

না রে—। ও ঝামেলা মিটিয়েই আসি আগে। আর খাওয়া-দাওয়া তো আমরা সেরেই এসেছি কোলকাতা থেকে।

ইয়ার্কির একটা সীমা আছে বিমলে—, অনাদি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল,

তুমি আমার বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে আজ প্রথম এলে আর আমি তোমায় শুধু মুখে বিদায় দেব!

ছেলে—, সুবিমল অবাক হয়ে বলল, রাজাকে কে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে? ও এখানে থাকবে তোদের কাছে। আমি ওখানকার কাজ সেরে ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাবো।

একটার পর একটা বোমা ফাটিয়ে চলেছে সুবিমল। অনাদি থই পাচ্ছে না, কি এতো কাজ তোর ওখানে যে এক্ষুনি না-গেলে চলছে না?

আজ দুটোর সময় কমিশন বসার কথা আছে—, আবার সুবিমলের মুখ গম্ভীর, কঠিন দেখাল।

এবার অনাদির মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, তোদের বিষয়-সম্পত্তির সেই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার?

সুবিমল আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়াল। আত্মমগ্নভাবে বলল, পাট চুকিয়ে দিয়ে আসি। আমার চিঠিটা পেলে তুই সবই জানতে পারতিস। —সবই জানিয়েছিলাম আমি।

বিষয়টার সবটা না-হলেও অনেকখানি জানে অনাদি। —সুবিমলের বাবা মারা যান বছর-দশেক আগে। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। বলতে গেলে বাবা মারা যাবার পর থেকেই সুবিমল বিদেশে পাড়ি দেবার পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিল। সুবিমলের বাবা অবস্থাপন্ন ছিলেন। বিরাট বাড়ি। অনেক জমি। পুকুর-টুকুর। তাছাড়াও অন্যান্য সম্পত্তি। সুবিমলারা ছ ভাই, চার বোন। মেয়েদের সৎপাত্রে সমর্পণ করে যেতে পেরেছিলেন সুবিমলের বাবা। পরিবারে সুবিমলই একমাত্র উচ্চশিক্ষিত। বাকিরা কেউ কলেজের চৌকাঠ মাড়ায়নি। সুবিমল তিন ভাইয়ের পর। অন্য দাদা-ভাইদের কেউ কাছাকাছি চটকল, কাগজ কলে চাকরি করে। কেউ কিছু করে না। বাবার রেখে-যাওয়া সম্পত্তির আয়ে চালায়। সবাই একই বাড়িতে থাকে, কিন্তু পৃথকান্ন। যা—হয়—। কারো সঙ্গে কারো সদ্ভাব নেই। চার বোন সুবিধা এবং পছন্দমতো ভাইটির সঙ্গে সেঁটে গেছে। সুবিমলের চিঠিতে জেনেছে, অবস্থা ক্রমে খুবই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনোমালিন্য, অসদ্ভাব তো ছিলই। ঝগড়া, মারামারি, ভায়ে-ভায়ে লাঠালাঠি হয়ে ব্যাপার থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। এতদিন বাদে সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে যা-হোক একটা মীমাংসায় আসা গেছে। —দলিলপত্রে সই-সাবুদ বাকি। সেটা তো সুবিমল দেশে না-এলে হচ্ছে না।

অনাদি যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, সুবিমলের এমন হঠাৎ এদেশে

আসার উদ্দেশ্য। খুবই কৌতূহল হচ্ছিল স্থবিমলকে জিজ্ঞেস করে, এই ভাগ-বাঁটোয়ার মধ্যে ওরও তো একটা অংশ আছে। সে-বিষয়ে কি ঠিক করেছে—ভাবছে-টাবছে। কিন্তু ভাবল, ব্যাপারটা স্থবিমলের এতো ব্যক্তিগত যে স্থবিমল নিজে থেকে কিছু না বললে কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন নয়।

গম্ভীর হয়ে স্থবিমল বলল, আমি ঠিক বাড়ির ওই পরিবেশে রাজাকে নিয়ে যেতে চাইছি না। কে-জানে কমিশনের সময় আবার কি অবস্থা দাঁড়ায়। রাজা তো এসব ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত নয়। দেখেনি কখনো—, একটু থেমে বলল, আজ সব ভালোভাবে মিটে গেলে ওদেশে ফেরার আগে একদিন শ্বশুর মশাইয়ের গাড়ি নিয়ে অলি, রাজাকে নিয়ে বাড়ি যাবো। রাজাকে ওর বাড়িটা একবার দেখানো দরকার। ও তো জ্ঞানে কখনো দেখেনি। ভোর-ভোর বেড়িয়ে পড়বো—কোলকাতায় সন্ধ্যার দিকে ফিরবো। রোদটা এড়ানো যাবে।

শোভনা জিজ্ঞেস করল, আপনার না-হয় জরুরি কাজ। ছেলে খাবে তো?

স্থবিমল লজ্জা পেয়ে বলল, রাজা তো খেয়ে এসেছে। তাছাড়া সময়ের ওলোট-পালোটে সব অনিয়ম হয়ে গেছে। ওর পেটটাও ভালো নেই—ছেলের দিকে তাকিয়ে স্থবিমল জিজ্ঞেস করল, রাজা তোমার কি খিদে পেয়েছে?

আমার খিদে পায় নাই—, রাজা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল।

ও-মা— আ— আ—, শোভনা মোড়া ছেড়ে উঠে গিয়ে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে রাজার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিল, কি মিষ্টি করে বলল গো—!

অনাদির প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। প্রায় ফুঁসছে। সোজা বলল, তোমার ছেলেকে তুমি নিয়ে যাও। আমরা রাখতে পারব না।

অনাদির রাগ দেখে স্থবিমল হাসছে, এই অনি। — শান।

া, না যথেষ্ট হয়েছে। শোনার কিছু নেই, অনাদি হাত নেড়ে বলল, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও—, তারপর একদম ফেটে পড়ে তোতলালো, তুই পেয়েছিস কি? —ভেবেছিস কি আমায়?

শোভনা তার বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে, আসলে স্থবিমল ছেলেকে কিছু বাইরের খাবার খাওয়াতে চায় না। অভ্যাস নেই। অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কোন্ বাবা-মা চায় তার সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ুক। স্থবিমলকে দোষ দেওয়া যায় না। শোভনা অনাদির রাগ, অভিমান জানে। মাঝামাঝি একটা সমঝোতায় আসার মতো ভেবেচিন্তে বলল, একেবারে কিছু খাবে না—তাই কি হয়? ডিম সিদ্ধ, দুটো মিষ্টি খেতে তো দোষ নেই?

সুবিমল যেন কূল পেল, হ্যাঁ— হ্যাঁ—। ডিম নয় মিষ্টি দেবেন। — ছানার মিষ্টি। ক্ষীর বোধহয় সহ্য করতে পারবে না।

অনাদি বোধহয় একটু জুড়িয়েছে। মুখ গোঁজ করে বসে আছে। ব্যাপারটায় যে তার সমর্থন নেই চোখেমুখে পরিষ্কার।

এই অনি—, সুবিমল ঠোঁটে হাসি নিয়ে ডাকল, কি হচ্ছে কি বুড়ো বয়সে? তাছাড়া, রাগ করারই বা আছে কি? এ-বেলা হচ্ছে না। ও-বেলা তো তোর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে কোলকাতা ফিরবো, একটু থেমে বলল, কি রে?— খাওয়াবি না?

অনাদি চোখের কোণে সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, দরকার নেই।

আচ্ছা পাগল তো—, সুবিমল হঠাৎ বলল, এই ইলিশ খাওয়াতে পারবি? —গঙ্গার ইলিশ? কত যুগ খাইনি। এই সময়ই তো পাওয়া যায়— না রে?

অনাদি বেশ বুঝতে পারছে দ্রুত গলে যাচ্ছে সে। খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর আবার গঙ্গার ইলিশ খাওয়ার কথা। কষ্টে উৎসাহ দমন করে নির্লিপ্ত স্বরে ছোট্ট করে জবাব দিল, হুঃ।

কাতর স্বরে সুবিমল বলল, খাওয়া না ভাই— শোভনার দিকে তাকাল, বেশ জম্পেস করে রাঁধুন তো। পেটের যা হয় হোক। দুদিন না-হয় বিছানায় শুয়ে থাকবো।

অনাদি এবার সোজা দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে তাকাল, ঠিক তো?

ঠিক নয় তো কি? খাইয়ে দেখ। —ভাত দিয়ে কুল-করতে পারনি না, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অ্যাটাচি নিয়ে সুবিমল একেবারে উঠে দাঁড়াল, অনেক দেরি হয়ে গেল। —উঠি, অনাদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, মোড়ে রিকশা পাওয়া যাবে?

অনাদি উঠে দাঁড়াল, চল— আমি মোড় পর্যন্ত যাচ্ছি।

যাবার আগে সুবিমল রাজাকে বলল, একদম জ্বালাতন করবে না। দাদা দিদি বাড়ি এলে প্রণাম করবে। গল্প করবে ওদের সঙ্গে।

শোভনা রাজার চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইস—! ওকে ছাড়ছি আমি? সারা দুপুর আমেরিকার গল্প শুনবো।

শোভনা যা ভেবেছিল— হল না।

ভাষার ব্যবধান। বাংলায় জিজ্ঞেস করে শোভনা। রাজা সময় নিয়ে প্রশ্নটা বুঝে জবাব দেয় ইংরেজিতে। সে ইংরেজি অন্য রকম। একটা নাকি সুর আছে।

শোভনার কাছে বাংলা ভাষা ছাড়া ইংরেজি, উর্দু, সংস্কৃত— সব সমান। ভাষা বুঝতে পারে না বলে হিন্দি সিনেমা দেখে না। আবেগের চটকা-চটকি আছে বেছে বেছে সেই সব বাংলা সিনেমা দেখবে। ফিরে আসে যখন দুটো চোখ জবা-ফুলের মতো লাল। তাই নিয়ে ভাই-বোনের মাকে সাঁড়াশি আক্রমণ। অনাদি ভালোমানুষের মতো টুকটাক মন্তব্য করে ওদের উৎসাহ উসকে দেয়। তার ওপর আবার ভাই-বোন বাড়ি ফিরেছে। সুবিমল বেরিয়ে যাবার পর পরই গানের স্কুল সেরে বাড়ি ফিরেছে পাপড়ি। রবিবারের আড্ডা সেরে একটা নাগাদ, দীপু। দু জনে এখন রাজার দখল নিয়েছে। পাশের ঘরে ওরা গল্প করছে। গল্প আর কি! দু জনেই তো ইংরাজি কথোপকথনে সাহেব-বাচ্চা। বাক্যের মধ্যে ইংরিজি শব্দ গুঁজে কাজ চালাচ্ছে।

অনাদি জর্দা দেওয়া পান চিবোতে-চিবোতে পাশ-বালিশ আঁকড়ে খাটে শুয়ে আছে। চোখে ভাতঘুম। জর্দার আবেশ। কিন্তু সুবিমলের হঠাৎ এসে পড়ার উত্তেজনা মন থেকে যাচ্ছে না। —জাগিয়ে দিচ্ছে। ঘুমের চটকা ভেঙে যাচ্ছে।

বন্ধুকে তো খুব আদর দেখিয়ে গঙ্গার ইলিশ খাওয়াবে বলা হল— পাবে?

শোভনা মেঝেতে পশমের বোনা নিয়ে বসেছে। দুপুরে ও একদম শোয় না। পা-ছড়িয়ে বসে নাকের ওপর চশমা লাগিয়ে সেলাই-ফোঁড়াই, বোনা-টোনা করে। অনাদির উশখুশ দেখে বুঝেছিল ঘুমোয় নি। জিজ্ঞেস করল।

বাজারে যখন উঠছে তখন নিশ্চয় গঙ্গারঘাটে গেলে পাওয়া যাবে—, অনাদির স্বর তন্দ্রা জড়ানো।

বাজারে কত করে গঙ্গার ইলিশ যাচ্ছে জানো, জিজ্ঞেস করে শোভনা নিজেই আবার উত্তর দিল, চল্লিশ টাকা কিলো।

অনাদি ছোটো করে উত্তর দিল, হুঁ।

টাকা আছে?

অনাদি জবাব দিল না।

আমার কাছে কিন্তু টাকা নেই— শোভনা সাফ্ জানিয়ে দিল, পঞ্চাশ টাকার একটা আর দু'টাকার দুটো নোট পড়ে আছে—, থেমে থেমে বলল, মাসের এখনো পাঁচদিন বাকি।

ঘুম চোখের পাতা থেকে একদমে ছুট লাগাল।

চিৎ হয়ে শুল অনাদি। ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে। — তার মানিব্যাগ হাতড়ালে আটন টাকার বেশি হবে না। শোভনা কখনো

তার অফিসের পোর্টফোলিও ব্যাগে হাত দেয় না। ভেতরের খাপে কুড়ি টাকার একটা নোট আছে। মোট আঠাশ-উনত্রিশ। কিন্তু পুরো টাকাটা খরচ করা যাচ্ছে না। পাঁচদিন অফিস করতে হবে। বাসের ভাড়া, একটু কিছু টিফিন। ভেবে দেখল, বাড়িতে একদিন গঙ্গার ইলিশ আসছে। শুধু সুবিমল আর রাজার জন্যে আনবে আর বাড়ির সবাই মাছ ভাজার গন্ধ শুঁকবে—তা হয় না। কিলোটাক আনলে মাখোরাখো করে হয় এক রকম। বছরে যখন একবারই খাওয়া—।

অনাদি জানে, শোভনার একটা জরুরি তহবিল আছে। নেহাৎ আপৎকালীন অবস্থায় না-পড়লে তাতে হাত দেয় না। অনাদি বলল, তুমি কুড়িটা টাকা ধার দিও তাহলেই হবে।

আমি কোথায় পাব? —মাসের শেষ, রেগে উঠল শোভনা।

শোভনাকে বধ করার অস্ত্র জানে অনাদি। কণ্ঠস্বরে পরম নির্ভরতা এনে বলল, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার— ঝাড়লেই বেরুবে।

আহা—, শোভনা অপাঙ্গে অনাদির দিকে তাকাল, পোড়া-কপাল লক্ষ্মীর। যার এ-রকম ভোঁদামার্কা নারায়ণ সে আবার লক্ষ্মী।

অনাদি বেশ বুঝতে পারছে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পায়ে পা ঘষতে-ঘষতে অন্য প্রসঙ্গে এল, বিমলেটা এতদিন স্টেটসে রয়েছে কিন্তু দেখেছ—এখনো সেই বাঙালিটি রয়ে গেছে। কেমন ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে! কোঁচাটি পর্যন্ত পকেটে গোঁজা। ছেলেকে কেমন সহবৎ শিক্ষা দিয়েছে বলো? —কেমন পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতে শিখিয়েছে!

শোভনা ছোটো করে সাড়া দিল, হুঁ।

আর একটা জিনিস লক্ষ করেছ?

কি?

এতক্ষণ কথাবার্তা হল একটা ইংরিজি বলল নি। —ছেলেকেও যা বলেছে সব বাংলায়।

না তা বলে নি— শোভনা বলল, সাহেবদের জিবে উচ্চারণ হবে না বলে বন্ধুর দেওয়া ছেলের নাম বদলে রেখেছে শুধু।

তখন মনের মধ্যে ঠুং করে যে ঘা লেগেছিল এখন মনে হল কে যেন বিশাল একটা ঘণ্টায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বদ্ধ ঘরের দেয়ালে লেগে গুম গুম করে উঠল। অনাদি স্ত্রীর দিকে তাকাল। শোভনা ঘাড় নীচু করে পশম বুনছে। দুটো হাত ব্যস্ত। অনাদি বন্ধুর পক্ষ নিল তা আর কী

করা যাবে। —যে দেশে থাকতে হবে সে দেশের মতো করে তো মানিয়ে চলতে হবে।

বিকেলে চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে শোভনা তাগাদা দিতে শুরু করল অনাদিকে, যাও। মাছ নিয়ে এসো। কখন কাটবো? কখন রান্না হবে? —তোমার বন্ধু তো এসেই তাড়া লাগাবে।

দীপু, পাপড়ি কারো সঙ্গেই সুবিমলের দেখা হল না।

দীপুর ফুটবল ম্যাচ আছে। সেমি-ফাইনালের খেলা। ছেলেটার খেলায় নাম হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্টে খেলার সুযোগ পেয়েছে। —অনাদি বাধা দিতে পারল না। পাপড়ির স্কুলে আজ 'শারদবন্দনা'। ও গান গাইবে। ছটায় শো। চারটে পর্যন্ত সুবিমলের জন্যে ঘর বার করে চলে গেল। নিজের স্কুলের ফাংশনে। নিজেদেরই সব করতে হবে। একটু আগে না গেলে চলবে না।

রাজা একা পড়ে গেল। —কখন যে সুবিমল আসে!

রাজাবাবু—, অনাদি বলল, নদী দেখতে যাবে? —গ্যানজেস রিভার? নদীতে নৌকায় করে মাছ ধরে— কিনে আনবো— হিল্‌সা ফিস্।

ও— ও— ও—, আই উইল লাভ ইট্ আঙ্কল, রাজার চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে।

টাকা পয়সা গুছিয়ে রাজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনাদি।

বাড়ি থেকে গঙ্গা মিনিট পাঁচেবের পথ।

মোড় ঘুরতেই থমকে গেল। রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দুটো কুকুর লড়ে গেছে। ভাদ্র মাসের লড়ালড়ি। সেই দৃশ্য ঘিরে ক'টা বাচ্চা ছেলের উল্লাস। দূর থেকে ইট মারছে কুকুর দুটোকে। পথচারীরা সাবধানে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কামড়ে দিলেই পেটে চোদ্দটা ইনজেকশন। কুঁইকুঁই আওয়াজ করতে করতে একটা কুকুর এদিকে যায় তো আর একটা ওদিকে টানে। অনাদি আড়চোখে রাজার মুখের দিকে তাকাল। রাজা অবাক হয়ে ছেলেগুলোকে দেখছে। তাড়াতাড়ি রাস্তাটুকু পেরুতে পারলে বাঁচে অনাদি। রাজর কাঁধে হাত রেখে আকর্ষণ করল, চলে এসো রাজা—।

জায়গাটা ছাড়িয়ে এসে রাজা বলল, আঙ্কল, হোয়াই দা কিডিস্ আর হিটিং দা ডগিস?

কি জবাব দেয় অনাদি। বলল, নটি বয়েস—ইউ নো। ভেরি নটি—, তাতেও গায়ের ঝাল গেল না। বলল, লিট্‌ল্ ডেভিলস্—।

সরু রাস্তা। পিচের চটা উঠে জায়গায় জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে।

খোবলার মধ্যে কাদা জল। দু পাশে খোলা নর্দমা। তাতে পাঁক ভড়ভড় করছে। গঙ্গার ধারের এই সব পুরানো মফঃস্বল শহরে যেমন হয়। গঙ্গার ধার দিয়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। দুপাশে পুরোনো বাড়ি। কোনো ছিরি ছাঁদ নেই। ঠিক রাস্তার ধারটিতেই খাটা পায়খানা। একটারও দরজা নেই। তার মধ্যেই আবার হঠাৎ-হঠাৎ হাল ফ্যাশানের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। রাজাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আজই যেন এ সব কুশ্রীতা বড় বেশি করে চোখে পড়ছে অনাদির। স্টেটসে কোথায় থাকে। আর ইণ্ডিয়ার রাস্তার কি হাল বাচ্ছে! অনাদি ভাবল, রাজাকে না আনলেই ভালো হত। —তারই বোকামি। ঠিক সামনেই দুটো বাচ্চা ছেলে নর্দমার ধারে উবু হয়ে বসে ব্যাপার সারছে। আবার গানও গাইছে, সনম্ তেরি কসম্—। রাজা পথ চলতে চলতে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

আঙ্কল—, রাজা বলল, ডু ইউ নো আই ওয়াজ বরন হিয়ার? —ইন্ দিস টাউন? ড্যাড্ অ্যাণ্ড মাম্মি টোল্ড মি।

অনাদি সিঁটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। —কি জবাব দেবে?

অনাদিকে বাঁচাতেই যেন ঈশ্বর সহায় হলেন। দু দিক থেকে দুটো সাইকেল রিক্সা আসছে। ভ্যাক্ ভ্যাক্ হর্ন বাজাচ্ছে।

রাজা এদিকে এসো, রিকশা দুটোকে পাশ দিতেই যেন অনাদি পাশে একটা বাড়ির সিঁড়ির ওপর উঠে এল। রাজার মনোযোগ অন্যদিকে চালান করতে চাইল।

গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়াল অনাদি। প্রাচীন ঘাট। প্রায় একশো ফুট চওড়া। ইট বাঁধানো অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে। পাশে একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ, একটা নিম। গাছের তলায় শিবলিঙ্গ। পাশে কালী মন্দির। সিঁড়ির দু ধারে দুটো সুন্দর তুলসীমঞ্চ ছিল। অনাদি ছোটো বেলায় দেখেছে। তার একটা ঘাড় ভেঙে পড়ে আছে। সিঁড়িতে যে শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলক-গুলো বসানো ছিল— সেগুলো উধাও।

সামনে দিয়ে গঙ্গার গেরুয়া জল তরতর বহে যাচ্ছে। এখন প্রচুর জল গঙ্গায়। অনাদি বুঝল, ভাঁটা যাচ্ছে। জলের দাগ দেখে বুঝল, জোয়ারে জল উঠে চারটে সিঁড়ি ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভাঁটায় জল নেমে যেতে সামনের মাঠ পিঠ জাগিয়েছে। আকাশে মেঘ রয়েছে। গঙ্গার জলে মেঘের ছায়া। আট-দশটা মাছধরা নৌকা খানিক দূরে মাঠের নিচে পাড়ে নোঙর করে রয়েছে।

রাজাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে নীচের পৈঠেতে এসে দাঁড়াল

অনাদি। খানিকটা অসহায়ভাবে তাকাল মাছধরা নৌকাগুলোর দিকে। একটা থেকে আর একটার বেশ তফাত করে নৌকাগুলো নোঙর করা। এর মধ্যে কার নৌকায় মাছ আছে? কয়েকটা নৌকায় তোলা-উনুনে রান্না চেপেছে। রাজার দিকে তাকাল। রাজা অবাক দৃষ্টিতে দেখছে সব কিছু। জিজ্ঞেস করল, আঙ্কল —উয়ারা কেমোন কোরে মাছ ধোরে? বাই দি ফিশিং রডস্?

নো—নো। বাই নেটস্। বিগ্ নেটস্— ইউ নো, অনাদি বলল। রাজা তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি দেখি মাছ পাওয়া যায় কিনা।

আঙ্কল মে আই গো উইথ ইউ?

না— না। এই কাদায় কোথায় যাবে? তুমি এখানেই দাঁড়াও।

অনাদি চটি ছেড়ে লুঙ্গি গুটিয়ে সাবধানে কাদায় নেমে পড়ল।

পেছন থেকে রাজা হাততালি দিয়ে উঠল, ইউ লুক ফানি আঙ্কল।

পায়ের ডিম পর্যন্ত ডোবা কাদা-জলের মধ্যে একটার পর একটা নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে অনাদি, কর্তা, আছে নাকি?

কেউ ঘাড় নাড়ছে।

কেউ বলছে, না গো—। গঙ্গায় নেই-ই এবার কিছু।

অনাদি স্রোত ঠেলে অন্য নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছে, ক্রমশ তার গলার স্বর কাতর হয়ে এসেছে।

একজন আধ-বুড়ো মাছমারা নৌকায় বসে বিড়ি টানছে। প্রায় সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ বারের মতো অনাদি বলল, আছে নাকি?

আছে।

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। গলার স্বরের ব্যগ্রতা লুকেবোর কোনো রকম চেষ্টা না করে অনাদি বলল, দাও, দাও।

চল্লিশ ট্যাকা কিলো পড়বে।

বাজারে চল্লিশ টাকা হলে ঘাটে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ টাকা কিলো হওয়া উচিত। অনাদির দরাদরি করার আর কোনো বাসনা নেই। জলকাদা থেকে উঠে হাতে ইলিশ ঝুলিয়ে বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে। বলল, তাই দেবো। কতটা? ওজন করা আছে?

এক কিলো দুশো।

অনাদি হিসাব করলো, আটচল্লিশ। বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাসের পাঁচদিন বাকি। অফিস যাবার খরচ বাঁচানো যাচ্ছে না। শোভনার কাছে হাত পাততে হবে। কে জানে ওর কাছে আছে কি না।

নৌকার মালিক পাটাতনের টুকরো বাখারি সরিয়ে উপুড় হয়ে মাছ বার করছে। অনাদি টাকা গুনছে। মাছ আছে শুনে উৎসাহে হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেছিল। জলে প'ড়ে লুঙ্গির তলার দিকটা ভিজে গেছে। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ আগে ধরা গো কর্তা ?

এই তো আধ ঘণ্টা আগে জাল গোটালাম। ছেলে ওপরে টিউকলে জল আনতি গেচে— নইলে এতক্ষণ বাজারে ওঠতো। —আপনার নাক্ ভালো।

চোখ জুড়িয়ে গেল অনাদির। নৌকার পাটাতনের তলার অন্ধকার থেকে সদ্য পালিশ-করা রূপোর পাত উঠে আসছে। অন্তিম শ্বাস হয়ে একফোঁটা লাল রক্ত কান্কোর তলা থেকে বেরিয়ে গা-গড়িয়ে নেমে এসেছে। আহা—! কিবা রূপ!

একটু দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে না কর্তা ?

বেশি দাম পেয়ে বুড়ো খুশি। বলল, দেচ্চি—। হাতে ঝুইলে বাড়ি নে যাবেন তো ? সব ঠিক করে দেচ্চি।

কাদা-ভেঙে হাতে ইলিশ ঝুলিয়ে ঘাটের দিকে আসছে অনাদি। রাজার নজর পড়ল। হাততালি দিয়ে চিৎকার করে বলল, ও আঙ্কল—! ইউ গট্ দা ফিশ!

অনাদি একমুখ আনন্দ, তৃপ্তি নিয়ে ঘাটে উঠে এল। এখন রাস্তার কলে পা ধুতে হবে। চটি পরতে হবে।

প্লীইজ্, আঙ্কল, গিভ ইট টু মি—, রাজার স্বরে অনুনয়, আই উইল টেক দা ফিশ টু আন্টি।

অনাদি উদারভাবে মাছটা রাজার দিকে বাড়িয়ে দিল, হোল্ড ইট।

রাজা সন্তর্পণে দড়ির আংটায় আঙুল গলিয়ে মাছটা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল, ইটস্ গ্রে-এ-ট্!

রাজার দু চোখের বিস্ময় সহর্ষ আলোর মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সুবিমল এল সন্ধ্যা ছ'টার পর।

অনাদি দরজা খুলে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি রে এত দেরি করলি ? কোনো গোলমাল হয় নি তো ?

সুবিমল চেয়ারে বসে হাঁফ ছাড়ল, নাঃ। সব ভালোয়-ভালোয় মিটে গেল। সব পাট চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

কি একটা ছিল সুবিমলের কথায়, কথার সুরে অনাদির বুকের ভেতর গুড়গুড় করে উঠল।

চা খাবি তো ? —ইলিশ মাছের ডিম ভাজা দিয়ে চা খা।

দারুণ উৎসাহিত গলায় সুবিমল বলল, ইলিশ পেয়েছিস ? —গঙ্গার ?

অনাদি প্রায় কপালের মাঝখানে ভ্রু তুলে বলল, একদম ফ্রেশ্। পাঁচটা নাগাদ ধরা পড়েছে।

—কেন, গন্ধ পাচ্ছিস না ?

সুবিমল দীর্ঘ করে নিশ্বাস টানলো, পাচ্ছি। এবার পাচ্ছি। তাহলে আর চা খেয়ে খিদে নষ্ট করি কেন ?

হ্যাঁ রে—। খেতে দিতে বলবো ?

একটু পরে। রাজা জ্বালাতন করে নি তো তোদের ?

জ্বালাতন—, অনাদি গোপন খবর দেবার মতো করে বলল, দেখগে—। সে এখন রান্নাঘরে বসে আন্টির সঙ্গে বাংলায় গল্প করছে।

অন্য রকম স্বরে সুবিমল বলল, অনি—, বোস। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

কি ব্যাপার—, উদগ্র কৌতূহলে অনাদি চেয়ারে বসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

সুবিমল বলল, সব পাট তো চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

সেই থেকে তো এই একই কথা বলছিস। —কি পাট ? কিসের পাট চুকিয়ে দিলি ?

সুবিমল মাথা হেঁট করে বসে আছে। আস্তে আস্তে বলল, দেশের সঙ্গে সম্পর্কের—।

কি-ই-ই, অনাদি কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

যা-কিছু স্থাবর সম্পত্তি আমার অংশে ছিল। সব ভাই-বোনকে সমান ভাগে দিয়ে এলাম।

অনাদি হতভম্ব।

অস্থাবর যা আছে কোনো মিসন-টিসনে দিয়ে দেবো। শ্বশুরমাশাই সব ব্যবস্থা করবেন। —কথা হয়ে গেছে।

অনাদির মাথার মধ্যে একটা কুটিল সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। কোনো উত্তেজনা প্রকাশ না করে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, তারপর, তুই দেশে ফিরলে কী করবি ? —কোথায় থাকবি ?

সুবিমল কথা বলছে না। এক দৃষ্টিতে নিজের করতলের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি আর এ দেশে ফিরবো নারে অনি।

একটা কথায় সব কিছু মিটে গেল। সব সন্দেহের অবসান।

অনাদি সময় নিয়ে বলব, অনিরও কি তাই ইচ্ছে?

বলতে পারিনি।

ঘরে নৈঃশব্দ জমাট হয়ে উঠেছে।

দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকোলি তাহলে?

না না— তা ভাবছিস কেন, সুবিমল যেন আশ্বস্ত করতে চাইল, আসব। আসব বইকি— মাঝে মাঝে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ি রয়েছেন।

না চাইলেও গলা বিদ্রূপে ধারালো হয়ে উঠেছে। অনাদি বলল, তাই তো। মস্ত একটা দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে থাকছে এখনো। ওরা পটল না-তুললে তো সব সম্পর্ক কাটানো যাচ্ছে না।

অনি—, সুবিমলের স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল, আমায় ভুল বুঝিস না।

না না এতে ভুল বোঝার কি আছে? পাগল—, তা কখনো পারি!

অনি আবেগ দিয়ে সব বিচার করা ঠিক নয়। বাস্তব দিকগুলোও দেখতে হবে—, সুবিমল যুক্তির ওপর খাড়া দাঁড়াতে চাইছে, এতদিন বাদে দেশে এসে কী দেখছি? ভাবি দেশটা চলছে কি করে? ভবিষ্যৎ কী এ-দেশের?

অনাদি বুঝে উঠতে পারছে না তার মধ্যে কী হচ্ছে। —ঘৃণা? বিদ্বেষ? ক্রোধ? সামনের চেয়ারে বসে আছে সুবিমল।

সুন্দর চেহারা। আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর থেকে স্বাস্থ্য ফুটে বেরুচ্ছে। স্বাচ্ছল্যের বোধ হয় একটা জ্যোতি থাকে। সমস্ত শরীর দিয়ে সেই জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

অনাদির কুৎসিত লাগছে। মনে হচ্ছে, ওই মসৃণ করে কামানো গালে ঠাস করে একটা চড় মারে। আর এক মুহূর্ত এই কুশ্রী সৌন্দর্যের সামনে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছে সুবিমল। অনাদি উঠে দাঁড়াল, সুবিমল, গাড়ির সময়ের আর খুব দেরি নেই। রান্নাও হয়ে গেছে। —খাবার দিতে বলি।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল অনাদি।

দরজার কাছে একটা নীচু টুলে বসে রাজা। শোভনা টুকটাক হাতের কাজ করতে করতে বকবক করে যাচ্ছে রাজার সঙ্গে। শোভনা বাক্সে-রাখা তোলা-বাসন বার করেছে। ধুয়ে-মুছে গুছিয়ে রেখেছে। ঝক্‌ঝকে কাঁসার থালা। ছোটো কাঁসার রেকাবিতে ইলিশ মাছের ডিম-ভাজা। ছোটো ছোটো কাঁসার বাটিতে এক-একটায় একটা পদ। জিরে দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল, ভাপা-

ইলিশ, পাথরের বাটিতে ইলিশ মাছের টক। ভাতের হাঁড়ি গরম জলের গামলার মধ্যে বসানো। ক্লান্ত চোখে অনাদি দেখল এসব। বলল, ওদের খেতে দাও। ট্রেন ধরতে হবে।

শোভনা বলল, আমি তো থালা সাজিয়ে বসে আছি—, তারপর মনে পড়তে বলল, হ্যাঁগো— তোমার বন্ধু কি ইলিশ মাছের তেল খাবে?

রাজার মাথাটা হাতের কাছে। অনাদি রাজার মাথায় হাত রাখল। চুলে বিলি কাটছে। আঙুলগুলো যেন স্পর্শবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

শোভনা এতক্ষণে যেন টের পেল। অনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েচে তোমার?

কি আবার হবে—, অনাদির গলার স্বর আটকে আসছে। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে প্রায় ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি তুলে বাঁচল।

ট্রেনে ভালো বসার জায়গা পেয়েছে সুবিমল। জানলার ধারে। যে মুখে ট্রেন ছুটবে সেই দিকে মুখ করে বসিয়েছে অনাদি। —হাওয়া পাবে। বেছে বেছে যে কামরায় তুলেছে অনাদি সে কামরায় সব আলো, পাখা হয়তো নেই। কিন্তু সুবিমলরা যে দিকটায় বসেছে সেদিকটায় আছে। সুবিমলদের মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে। রবিবার। তার ওপর রাতের ট্রেন। বিশেষ ভিড় নেই। রাজা বসেছে ঠিক জানলার ধারটিতে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

অনাদি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সুবিমলের চোখে যাতে চোখ পড়ে না-যায় সেই জন্যে সুকৌশলে কথার উত্তর দিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ গলে গলে এখন একটা ডেলা পাকানো ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। খুব নরম। অনাদির ভেতরটা অসম্ভব মুখর, বিমলে—, আর একবার ভেবে দেখ। আবেগের না হয় মূল্য নেই। তোর মায়া নেই? জন্মভূমি ত্যাগ করবি ভাই?

এমু কোচের গার্ড ঘণ্টা বাজাল।

সুবিমল অনাদির মুখের দিকে তাকাল, চলি রে—। রাজা কাকাকে বাই করে দাও।

বাই আঙ্কেল—, রাজা তাকাল, আই মাস্ট গিভ ইউ মাই থ্যাঙ্ক্‌স আঙ্কল।

কেন রাজাবাবু? —থ্যাঙ্কস্ কেন?

ফর শোইং মি দা রিভার গান্‌গা…দা স্ট্রে-ন্‌-জ ইয়ালো ওয়াটার…দা গ্রে ক্লাউডস্… দা ফিশিং বোটস… অ্যাণ্ড দা গ্রেট ফিশ হিল্‌সা।

ট্রেন নড়ে উঠেছে।

চকিতে অনাদির মনের পর্দায় সেই ছবি—কৃষ্ণপক্ষের রাত…তারা বিনবিন আকাশ…দু পাশে ধানা মাঠ ধু-ধু…স্বপ্নের শান্ত বেদনার আলো—।

ট্রেন চলে গেছে।

সামনে অন্ধকারে জোড়া জোড়া লাইন। প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনাদির মনে হল, সে দু হাতে মুখ ঢেকে আনন্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।

রাজার গলার স্বরের এ-আবিষ্টতা তার বড়ো চেনা। সে পেরেছে। রাজার মনে তার জন্মভূমির স্মৃতির বীজ বুনে দিতে পেরেছে।

নিস্তার নেই রাজার। জন্মভূমির স্মৃতির এই ছবি তাকে হানা দিয়ে ফিরবে সারাজীবন।

মানবাত্মা

বলা-কওয়া নেই, ছোটো একটা লাফ দিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়লো তারাপদ। দু'ব্যাটারির টর্চ হাতে ধরা। স্থইচ টিপতেও আলো জ্বললো না। অথচ একটু আগেও বেশ জলছিলো। অস্ফুটে টর্চের বাপান্ত করে টর্চ শুদ্ধ হাতে তারাপদ বারকয়েক ঝাঁকানি লাগালো। বাচ্চার দুধ তোলার মতো নিস্তেজ একটু আলো উঠে এলো টর্চের মুখে। সেই ফোকাস বিনোদের পায়ের কাছে অগভীর শুকনো নালার ওপর ফেলে তারাপদ ডাকলো,— আয়। চলে আয়।

বিনোদ বেশ ঘাবড়ে গেছে। তারাপদ কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে? এ-রকম একটা জায়গায় টেনে আনবে একবার অনুমান করতে পারলে সে আবার কথা ফিরে চিন্তা করত অন্তত। যদিও জায়গাটা পাখিওড়া দূরত্বের হিসাবে ধরলে তার বাড়ি থেকে মাইল তিনেকের মধ্যে। তার বাড়ি পৌরসভা এলাকায়। এদিকটায় পঞ্চায়েত। মাঝখানে শিয়ালদা-রাণাঘাট সেকশনের রেললাইন। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো তাকালে গাছপালার মাথার ওপরের আকাশে শহরের আলোর উদ্ভাস, রেলের ইয়ার্ডের সার্চলাইট, চটকলের চিমনির ওপর লাল বাতি চোখে পড়ে।...দুপাশে দুটো চটকল। পশ্চিমে গঙ্গা। রেল লাইন ও গঙ্গার মাঝে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মাইল দুই ফালি এলাকা পৌরসভার আওতায়। সেখানে গায়ে গায়ে বাড়ি, দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সিনেমা হল। গিসগিস করছে মানুষ। রাস্তায় বাস, লরি, ঠ্যালাগাড়ি. সাইকেল রিক্স। একসঙ্গে দশটা অ্যামপ্লিফায়ারের হাঁকডাক। বোমা পটকার আওয়াজ। আর এখানে ঝিঁঝিঁর ডাক। জোনাকি ঝোপেঝাড়ে। কাঁচাপাকা বাড়ি দূরে দূরে। হারিকেন, লম্ফর আলো। কোনো বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের স্বর মৃদুভাবে ভেসে আসছে। কাঁচা রাস্তায় গোড়ালি-ডোবা ধুলো। তার ওপর আবার অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার চারদিকে।

বয়স প্রায় সাতচল্লিশ ছুঁয়েছে। বিনোদ বেশ মনে করতে পারে, ছাত্র-জীবনে ক্লাবের ফুটবল টিমের হয়ে দু'বার, চাকরির সুপারিশের উমেদার হয়ে

এদিককার বাসিন্দা এক ভদ্রলোকের কাছে বারকয়েক, এসেছে রেল লাইনের এদিকে। তা এতটা ভেতরে কোন দিনই নয়। আসলে দরকার পড়ে না। প্রয়োজনের সব কিছুই তো রেল লাইনের পশ্চিমে।

কি রে, আয় —তারাপদ তাড়া দিল।

সামনে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে জায়গাটাকে বিনোদের খেলার মাঠ মনে হল। বেশ বড়। তারাপদ যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটা পায়ে চলা সরু পথ খানিকদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর। তারপর অন্ধকারে ঢুকে গেছে। করুণভাবে বিনোদ বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, মাইরি তারাদা?

এই তো এসে গেছি, —নিজের কথায় বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে তারাপদ টর্চের মুখ ঘুরিয়ে মাঠের ওপারে তাক করলো। মাটির দিক থেকে মুখ তুলতে ঝলসে উঠলো টর্চ। জোরালো আলোর রেখা অন্ধকার চিরে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে পড়লো গাছপালার ওপর। টর্চের কেরামতি দেখে তারাপদ নিজেই মোহিত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাছপালার ওপর আলো ফেলল কিছুক্ষণ। বলল, ফোকাস দেখেছিস? একেবারে পিন পয়েন্ট। খাঁটি ফরেন মাল—বুঝেচিস? শুধু মাঝে মাঝে শালা কী যে হয় যন্তোরটার—, তারপর রাস্তায় দাঁড়ানো বিনোদকে যেন আশ্বাস যোগাচ্ছে এই ভাবে বলল, ওইতো কুনেদার আম বাগান। রাস্তার দিকে দক্ষিণ চেপে বাড়ি। আমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে গিয়ে উঠবো একেবারে আমবাগানের উত্তরে। গলার স্বর বদলে বলল, অবশ্য বাড়ির সঙ্গে এখন আর কোনো রিলেশান নেই কুনেদার। ঘরেই পঞ্চমুণ্ডের আসন। সাধনা নিয়ে থাকে। স্ব-পাক আহার। বাড়ির থেকে একদম সেপারেট।

এ সবই তারাপদর কাছ থেকে বিনোদের জানা।

তারাপদ যাঁর কাছে তাকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর পোশাকি নাম কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়। রেলের গার্ড ছিলেন। অবসর নিয়েছেন বছর-দশেক। বরাবরই সাধনামনস্ক মানুষ। চাকরি-জীবনে রেলের পাশ নিয়ে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে চষে ফেলেছেন গোটা ভারতবর্ষ। বিস্তর সাধু সঙ্গ করেছেন। ঘেঁটে-চটকে দেখেছেন সাধুদের। মনে ধরেনি কাউকেই। অবসর নেবার দুবছর আগে কামাখ্যায় গিয়ে হঠাৎ দর্শন পেলেন তাঁর। দীক্ষা-টিক্ষা নিয়ে পুরোপুরি সাধক এখন। সাত বছর সাধনার পর কামাখ্যা থেকে গুরু নিজে এসে ঘরের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন। তারাপদর ধারণা অনুযায়ী তন্ত্রের লাইন দিয়ে মহাশক্তির সাধনা।

আয়, আয়—তারাপদ তাড়া লাগালো, একবার আত্মা-নামানো স্টার্ট হয়ে

গেলে কুনেদা আর কাউকে ঢুকতে দেয় না। কনসেনট্রেশান ব্রেক্‌ করে। আত্মরাও ঠিক লাইক করে না।

টর্চের ফোকাস দেখে বিনোদ প্রায় মরিয়া হয়ে লাফ দিয়ে মাঠে নামলো। তারাপদর পেছন-পেছন চলতে চলতে মনের অসন্তোষ চেপে রাখতে পারলো না, কখন তোমার বাড়ি এসেছি বলতো? তুমি শালা ক্যাচালি শুরু করলে—যাবি, যাবি। কুনেদার কাছে তো যাবোই। চা খা, মুড়ি খা—আচারের তেল দিয়ে মাখা, তোর বউদির হাতে-ভাজা গরম গরম পোস্ত ছড়ানো চ্যাটালো বেগুনি খা। —ফালতু ফালতু দেরি করলে!

বলতে বলতে গলায় ঢেঁকুর উঠে এলো। আলজিভের কাছে টোকো ভাব। চেনা সিমটম। বুঝতে অসুবিধা হয় না, অম্বল শুরু হয়েছে। বাড়ি যাবার সময় ডাক্তারখানা খোলা পেলে হয়। অ্যান্টাসিড বড়ি নিতে হবে।

তিন কদম আগে চলেছে তারাপদ। ডান হাতে টর্চ। মাঝে মাঝে সুইচ টিপে আলো ফেলে বিনোদকে পথ দেখাচ্ছে। বাঁ হাতে সবুজ রঙের লুঙ্গি খানিক তুলে ধরা। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। হাওয়াই শার্ট কাঁধের ওপর গামছার মতো ফেলে রেখেছে। পায়ে গোড়ালি ক্ষয়া রবারের জনতা চপ্পল। ফটর-ফটর শব্দ বাজছে চলতে। কাঁচায় পাকায় মেশানো কোঁকড়া চুল ঘাড় ঢেকে হাফ-বাবরি। ·· বিনোদের চাকরি-জীবনের প্রথম দিনটি থেকে তারাপদর সঙ্গে পরিচয়। স্টেশনের কাছে বাস গুমটির ধারে তারাপদর জয়কালী সাইকেল হাসপাতাল। সাইকেল সারাইয়ের দোকান। দোকানের পেছনে খানিকটা জায়গা উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে শক্ত করে ঘেরা। যেখানে সাইকেল রাখার ব্যবস্থা। ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা অনেকে বাড়ি থেকে সাইকেলে এসে দোকানের জিম্মায় সাইকেল রেখে ট্রেন কি বাস ধরে। আবার বাড়ি ফেরার সময় নিজের সাইকেলটি বেছে নিয়ে বাড়ি ফেরে। মাসকাবারি ব্যবস্থা। এসব সাইকেলের সারাই-টারাইয়ের কাজ আপনা-আপনি এসে যায় দোকানের দায়িত্বে। এই সঙ্গে আরও একটা ব্যবসা আছে তারাপদর। তার মালিকানায় দশটা সাইকেল রিক্সা চলে শহরের রাস্তায়। ·· এমনিতে ওপর থেকে তারাপদকে দেখে বোঝার উপায় নেই। মাথায় খাটো, তামাটে গায়ের রঙ, শক্তসমর্থ শরীর। নিয়ম করে দাড়ি কামায় না। পোশাক পরিচ্ছদ সব সময় তেমন পরিষ্কার নয়। এই রকম একটি লোক মনেপ্রাণে কালীভক্ত। বোঝা যায়, দোকানের দেয়ালে টাঙানো মা-কালীর হরেক রূপের ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখলে আর সাইকেল রিক্সাগুলোর নাম জানলে। কোনোটায় নাম শ্যামাসুন্দরী, কোনোটার নাম রক্ষেকালী,

কোনোটার আবার আত্মা—এই রকম। তার ওপর দোকানের নাম তো আছেই।

উনিশশো পঁয়ষট্টির বাইশে ফেব্রুয়ারী বিনোদের চাকরিতে জয়েন করার দিন। পাঁচ বছর বেকার-জীবন যাপনের পর কপালের মাঝখানে দইয়ের ঠাণ্ডা ফোঁটা, পেছনে অস্ফুটে দুর্গানাম শুনে সেদিনটা সাইকেল রিক্সা চেপে স্টেশনে এসে ছিল বিনোদ। বিদ্যুৎ পর্ষদের চাকরি। বাড়ির কাছেই, ব্যারাকপুরে। কিন্তু রোজ তো আর রিক্সার ভাড়া গুণে অফিস করতে স্টেশনে আসা যায় না। সে পদের চাকরি নয়। বাড়িতে সাইকেল রয়েছে একটা। সেদিনই অফিস থেকে ফেরার পথে তারাপদর সঙ্গে সাইকেল রাখার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল বিনোদ।

তারপর এতদিনের ঘনিষ্ঠতায় তারাপদ ঘরের লোক এখন। প্রথম দিকে রেবা ঠিক পছন্দ করেনি তারাপদকে। প্রায়ই বলতো, কি সব বন্ধু তোমার? আধময়লা লুঙ্গি পরে কেউ ভদ্রলোকের বাড়ি আসে? চায়ের কাপ তুমি নিয়ে যেও। আমি দিয়ে আসতে পারবো না। আর এখন তো তারাপদর সঙ্গে রেবার ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্ক। গ্রামের দিকে বাড়ি হলেও জমি-জিরেতের দিকে কোনোকালেই আগ্রহ নেই তারাপদর। দু-বিঘা ভদ্রাসনের মধ্যেই কিছু গাছ-গাছালি, দশ কাঠার পুকুর। পাতানো সম্পর্কের দৌলতে গাছের সজনেডাটা, নারকেল, মাঝে মধ্যে পুকুরের মাছ, পৌষ সংক্রান্তির পিঠে-পুলি ভ্রাতা নিজে বাড়ি বয়ে দিয়ে যান ভগিনীকে। রেবাও বাড়িতে কিছু ভালমন্দ রাঁধলে নিমন্ত্রণ করে সামনে বসে খাওয়ায় ভ্রাতাকে। রেবা পশমের রঙ পছন্দ করে দেয়। পশম কিনে দেয় তারাপদ। তারাপদর ছেলে-মেয়েদের সোয়েটার বুনে দেয় রেবা। এখানকার দুটো সিনেমা হলের পর্দায় তারাপদর দোকানের বিজ্ঞাপনের স্লাইড পড়ে। সিনেমার পাশ পায়। পাল্টা হিসাবে হয়ত সিনেমার পাশ পাঠিয়ে দেয় রেবাকে।—একটা অদৃশ্য গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক হয়ে দেখে যাওয়া ছাড়া এর মধ্যে বিনোদের অন্য ভূমিকা নেই।

বিনোদের সঙ্গে তারাপদর সম্পর্ক অন্য জায়গায়।

বরাবরই নিজের এবং নিজের পারিবারিক জীবন বাড়ি তৈরির নকশার মতো একটা ছকে ফেলে গড়তে পক্ষপাতী বিনোদ। বাঁধা রোজগার, উপায়ই বা কি! পঁচিশ বছর বয়সে চাকরি। ছোট বোনের বিয়ের পর উনত্রিশে বাপ-মার পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে উদ্বাহবন্ধন। উনিশশো বাহাত্তরে প্রথম সন্তান। ভেবেছিল, যাক্‌ গে। যা হবার হয়েছে। আজকাল ছেলে আর মেয়েতে

তফাৎ আছে নাকি কিছু? বরং মেয়ে অনেক সেফ। গুণ্ডা মস্তানে দাঁড়াবে না। ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে আসে হাসপাতালে গিয়ে।…শুনে রেবার মুখ খুনীর মতো হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম চরম অবাধ্যতা দেখিয়েছিল রেবা। একটা স্যুটকেসে নিজের আর মেয়ের জামাকাপড় গুজিয়ে সোজা বাপের বাড়ি বনগাঁ। ছক বদলাতে হয়েছিল বিনোদকে। রেবার সঙ্গে সমঝোতায় এসে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত এনেছিল পাঁচদিনের মাথায়। সংশোধিত ছক মেলাতে গেলে পঁচাত্তর সালে ব্যাপারটা গিয়ে পড়ে। এবার ছেলে। রেবা দারুণ খুশি। যেন হাওয়ায় পা-দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝুঁকি না-নিয়ে বিনোদ নিজেই হাসপাতালে উপস্থিত একদিন। কাকপক্ষীকে জানতে দেয়নি। রেবার কাছে লুকিয়ে রাখা যায়নি। যায়ও না। রেবা গম্ভীর। বলেছিল, লোকের চোখে নিজের বউকে হেনস্তা করে খুব মহত্ব দেখানো হলো, না? কথাগুলো শিশির মাখানো। বিনোদ যত বোঝায়, এটা তো দশজনের ব্যাপার নয়। আমাদের দুজনের। দুজনের একজনের করালেই হলো। পুরুষরা করালে জটিলতার সম্ভাবনা কম। রেবার জেদ, তোমায় টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেবো—তাই ভেবেছো বুঝি তুমি? নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে জানি। হাসপাতালের রাস্তা আমিও চিনি। রেবা যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী। ছেলে হবার পর তার ওপর গর্জনতেলের পোঁচ পড়েছে। বড় বড় চোখ পাকিয়ে যখন নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখন বিনোদের বেশ ভয় লাগে। রেবার তুলনায় বিনোদ বেশ খাটো। স্বাস্থ্য কোন কালেই ভাল না। বায়ুর রুগী। সেই জন্যেই কিনা কে জানে, মাথার চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। ফরসা রঙ এখন ফ্যাকাসে দেখায়। নিজে কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে এই ধরনের একটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে তারাপদর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল বিনোদকে। চোখ বুজিয়ে শুনে অনেকক্ষণ ভেবে তারাপদ বলেছিল, শোন। এই ব্যাপারটায় আর ডিশকাসনে যাবি না বউয়ের সঙ্গে। জেদ হেভী হয়ে যাবে। যা করবার আমি তোর বউদিকে দিয়ে করাবো। রেবার কাছে তারাপদর বউ বেশ কয়েকবার এসে কি বোঝালো। রেবা শান্ত। বিনোদ কৃতজ্ঞ।

আটাত্তর সালের একদিন। রাত ন'টা বাজে। দোকানের কর্মচারী দুজন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ঘর গোছগাছ করছে। লোড-শেডিং। হ্যাজাক জ্বলছে। কাউণ্টারের ওপাশে তারাপদ। বিনোদ খদ্দেরদের টিনের চেয়ারে বসে বলেছিল, ভাবছি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু লোন নিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লাগিয়ে দেবো। মাসে মাসে কিছু আসবে।

খবরদার বিনু—তারাপদ থাপ্পড় মারার জন্মেই যা হাতটা ওঠায়নি, বছরে ছত্রিশ পার্সেণ্ট সুদ দিয়ে কি ব্যবসা হয় রে? ওসব ধাপ্পা শেষ হলো বলে। খবরদার ওসবে যাসনি।

আর যে চালাতে পারছি না, তারাদা। মেয়ের বিয়ের ভাবনা, ছেলের এডুকেশান! —হালে পানি পাচ্ছি না।

খুব চলবে। সব খুইয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়ালে বুঝি সব ভালো চলবে?

তারাপদর দূরদৃষ্টি যে কতো প্রখর পরের বছরই বুঝেছিল বিনোদ।

ছোটখাট সমস্যা।

কি করি বল তো তারাদা? এ বছর বদলি বোধহয় আর ঠেকানো গেল না। আট বছর এক জায়গায় হয়ে গেল।

কোথায় ট্রান্সফার করবে শুনেছিস কিছু?

শুনছি তো কৃষ্ণনগর। তবে একটা ব্যাপার আছে, কৃষ্ণনগরে বাড়ি এমন একজন বদলি হচ্ছে বর্ধমানে। তার সঙ্গে মিউচুয়ালি বদলা-বদলি করা যায়। —কি করবো ভাবছি।

কেষ্টনগর লাইন—তারাপদকে খুব চিন্তিত দেখায়, বড় ট্রেচারাস্ লাইন। রোজই একটা-না-একটা কারণে গাড়ি বন্ধ। আর একবার ট্রেন বন্ধ হলে বাড়ি ফেরার কোনো কম্যুনিকেশান নেই। তুই বর্ধমানটাই দেখ। ট্রেন বন্ধ হলে বাসে করে এসে ফেরি পেরুবি।

কথাটা বিনোদের মনে ধরেছিল, এখন না হয় একটা বুদ্ধি দিলে। কিন্তু নর্থ বেঙ্গল? সেখানে তো একবার ঠেলবেই। তখন?

ক বছরের জন্যে?

তিনটে বছর তো ধরে রাখো।

তারাপদ বলে, কি আর করবি। ট্রান্সফারেবল্ জব্—যেতে তো হবেই। মেসেটেসে থাকবি। মাসে দু'একবার বাড়ি আসবি। এখানকার দেখাশোনার জন্যে আমি তো রয়েছি। তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

তারাদা, ছেলেটাকে তো এবার কোথাও দিতে হয়। কোথায় দিই বলো দিকিনি?

কেন? তোর বাড়ির কাছেই তো কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। কি নাম যেন স্কুলের?

বকুল-পারুল। হবে না। সিট নেই।

সুধা.দি.দিমণির স্কুল তো ?

হু

আমার ওপর ছেড়ে দে।

অনেকানেক সময় তারাপদ নিজেই বিনোদের শুভাশুভর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।...মেয়ের জন্মদিন। রাত্রে তারাপদর নিমন্ত্রণ। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে চেয়ারে পা-তুলে বসে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে চোখ বুজিয়ে তারাপদ জিজ্ঞেস করে, মেয়ের বয়স কতো হল রে বিনু ?

তেরোয় পা দিলো।

তাহলে তো আর খুব টাইম নেই।

কিসের টাইম ?

মুহূর্তের জন্য তারাপদ চোখ খুলে বিনোদকে দেখে নেয়। দাঁতে দেশলাই কাঠি ঢোকায়, বিয়ের কথা ভাবিস-টাবিস ?

তোমার জবাব নেই মাইরি। তেরো বছরের পড়লো সবে আর তোমার মাথায় বিয়ের ভাবনা !

হ্যাঁরে ইডিয়েট। তাই ভাবতে হয়। টেক মাই অ্যাডভাইস বিনু। আঠারো পার হলে আর একটা দিনও দেরি নয়। এখনই পাত্রের সন্ধান নিতে শুরু কর। এর মধ্যেই এঁড়ে তাড়াতে তাড়াতে জীবন হেল্ হয়ে যাবে।

এঁড়ে ? —এঁড়ে কি ?

ওই যে যারা ঘাড়-কান ঢেকে চুলের ঝালর ঝুলিয়ে মোড়ের মাথা আলো করে থাকে সারাদিন।

বিনোদের কাছে এই হচ্ছে তারাপদ। অসমবয়সী বন্ধু, শুভার্থী, উপদেষ্টা।

এ-হেন তারাপদও বিনোদের অবস্থা দেখে, কথা শুনে দিশাহারা একদিন। ছাতুর বস্তার মতো ধপ করে বসে পড়েছিল বিনোদের পাশে। একটা কথাও বলতে পারেনি।

ভাল করে ভোর হবার আগেই বিনোদ ছুটে এসেছিল তারাপদর বাড়ি। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। দু'চোখের তলায় রাত্রি জাগরণের, ত্রাসের গাঢ় কালি। মুখের রঙ শুকনো পাতার মতো। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

তারাপদ তখন রোয়াকের ওপর পায়চারি করতে-করতে দাঁতন ঘষছিল দাঁতে। এতো সকালে বিনোদকে আসতে দেখে বেশ অবাক।

বিনোদ তারাপদর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। গলার কাছে একটা ডেলা আটকে রয়েছে। একটু নাড়া পেলেই পিছলে বেরিয়ে আসবে।

কি রে? —এতো সকালে?

বিনোদ তখন রোয়াকের প্রান্তে লাল সিমেণ্টের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে। নত মুখ।

কি রে? এই বিনু? কিছু হয়েছে?

আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেনি বিনোদ। অসহায় ভেঙে-পড়া মানুষের মতো দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে ডুকরে উঠেছিল।

তারাপদ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, কি হয়েছে বলবি তো? ছেলেমেয়েরা? —রেবা?

বিনোদ ফোঁপানির ধাক্কায় কথা বলতে পারছে না। মুখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নাড়ে কেবল।

তাহলে? হয়েছেটা কি, —তারাপদ বিনোদের মাথায় হাত রেখেছিল।

বিনোদ সহসা দু'হাতের বেষ্টনে তারাপদর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল, আমায় বাঁচাও তারাদা। ওরা আমায় মেরে ফেলবে! আমার ফ্যামিলিকে শেষ করে দেবে।

তারাপদর বউ ভেতর থেকে ছুটে এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে এদিকে। দু'হাতে তারাপদর কোমর জড়িয়ে পাগলের মতো মাথা ঘষছে বিনোদ, আমায় বাঁচাও। আমায় বাঁচাও।

কারা মারবে তোকে, —তারাপদর স্বরে প্রচণ্ড বিস্ময়।

দরজায় দাঁড়ানো তারাপদর বউয়ের চোখে তখন সব না-বুঝেও কান্নার ছোঁয়াচ। আঁচল চোখের ওপর। তারাপদর চোখ পড়লো সেদিকে, তুমি কি ফ্যাচোর-ফ্যাচোর শুরু করলে? এক গেলাস দুধ গরম করে নিয়ে এসো। বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে এনো।

তারপর সময় নিয়ে বিনোদ আস্তে আস্তে যা বলেছিল: বিনোদের বাড়ির উত্তরে খান পঁচিশেক বাড়ির পর শহরের জল-নিকাশি খাল। খালের পাশ থেকে উত্তরে চটকলের বস্তির আরম্ভ। পুবদিকে দু ফার্লং দূরে বাস রাস্তা। রাস্তার পর রেলের ইয়ার্ড। ইয়ার্ডে চাল, গম, চিনি, কয়লা, লোহার চাদর ইত্যাদি বোঝাই ওয়াগান এসে থেমে থাকে। ইয়ার্ডের দখল নিয়ে দু-দলের মধ্যে হারা-হারি লড়াই—শহরের সকলের জানা। বিছানায় শুয়ে গুলি বোমার শব্দ শোনে। কানে শোনে কাল রাত্রে দুটো লাশ পড়েছে। তার তিনদিন পরে—চারটে। সকলেরই মতো কোনদিনই কৌতূহলী হয়ে খোঁজ-খবর করতে যায়নি বিনোদ। শুধু বোমা গোমার আওয়াজ শুনতে শুনতে একেকদিন মনে হয়েছে, আওয়াজ

যেন ইয়ার্ডের দিক থেকে বস্তি, বস্তি থেকে পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। শুনেছে, এখন দু দলের হাতে দুটো মেসিন। এক রকম শব্দ শোনা যায়। অন্য রকম শব্দ। শোনা কথার ওপর আস্থা রেখে বিনোদ বিজ্ঞের মতো রেবাকে বলে, কাল রাত্তিরে স্টেন চলছিল। আওয়াজ পেয়েছিলে? · বিনোদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে রাস্তা, তার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে রেলের ইয়ার্ড। একেকদিন মাঝরাতে অনেকগুলো পায়ের ধুপধাপ্ শব্দ শোনা যায়। কারা যেন দৌড়ে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে। খানিক পরেই পুলিশের বাঁশি—। পুলিশের জিপ ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। …রাস্তা থেকে বিনোদের বাড়ি ঢোকার মুখে গ্রিলের গেটে তালা পড়ে সন্ধ্যা থেকে। কেউ এলে তালা ধরে নেড়ে শব্দ করে উপস্থিতি জানায়। বাড়ি থাকলে বিনোদ নয়ত রেবা আগন্তুককে চিনে গেটের তালা খোলে। নইলে বাইরে থেকে কথাবার্তা। গ্রিলের ভেতরে কাঠের দরজার পাল্লায় বিনোদ শুতে যাবার আগে খিল লাগিয়ে দেয়। ইদানীং অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে দরজার কড়ায় একটা তালাও লাগিযে দিচ্ছে। …স্বামী-স্ত্রী সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে শীতের রাত হিসাবে বেশ দেরি হয়েছে। বিনোদ শুতে যাবার আগে থারীতি দরজায় খিল লাগিয়ে তালা দিতে গেছে। লাইট পোষ্টের বাল্ব কারা যেন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেয়। অন্ধকার রাস্তা। দালানের আলো দরজার বাইরে ফ্রেমের মধ্যে গ্রিলের জাফরি কেটেছে রাস্তায়। গ্রিলের গেটের তালা দেখা হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করতে যাবে বিনোদ, রাস্তা থেকে ছুটে এসে কে-যেন গেটের বাইরে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। বিনোদ পাথর। এই বুঝি তার গায়ে পাইপ গানের নল ঠেকিয়ে গেটের তালা খুলতে বলে। ছায়ার জাফরির মধ্যে বিনোদ দেখল, অল্প বয়সী একটা ছেলে। পরনে চাপা প্যান্ট, গোল গলা গাঢ় রঙের গেঞ্জি। দু'হাতের মুঠোয় গ্রিলের দুটো গরাদ চেপে ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করছে। অনেকটা গ্লাক—গ্লাক শব্দের মতো শোনাচ্ছে শব্দটা। প্রাণ কাঁপতে-কাঁপতে কি বলছে ছেলেটা শুনতে গিয়ে বিনোদ আবিষ্কার করলো, ঠিক কণ্ঠার ওপর ছেলেটার গলা হাঁ হয়ে রয়েছে। যেন কেউ ক্ষুরের পোচ্ দিয়ে গলাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়েছিল, পারেনি। প্রতিটা শব্দের সঙ্গে ক্ষত-মুখ দিয়ে ভলকে-ভলকে রক্ত উঠে ভিজিয়ে দিচ্ছে গেঞ্জির সামনেটা। কি বলতে চাইছে ছেলেটা বুঝতে পারছে না বিনোদ। বোঝার মতো অবস্থাও তখন তার নয়। অদ্ভুত গ্লাক্-গ্লাক্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই কান থেকে মাথায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না। চোখের ওপর বিভীষিকা। ছেলেটা সহসা শব্দ বন্ধ করলো। চকিত দৃষ্টিতে

রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছুটে চলে গেল গঙ্গার দিকে। ··বোধহয় বিশ পা-ও যায়নি। চারজন ছুটে গেল বিনোদের সামনে দিয়ে। একটু পরেই গোটা পাড়া কেঁপে উঠলো বোমার শব্দে। ঘটনার প্রবল আকস্মিকতায় বিনোদ স্থাণু। জড়ের মতো দাঁড়িয়ে দরজা ধরে। খুব নিশ্চিন্ত অলস পায়ে চারমূর্তি রাস্তা ধরে দরজার সামনে দিয়ে ফিরে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো। চারজোড়া চোখ হিসেবি দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলো তাকে। মুখের আধখানা রুমাল চাপা দিয়ে অন্ধকার থেকে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো একজন। বিনোদ পরিষ্কার শুনলো, খোচোড়ের কাছে গলা দিয়ে একটা টুঁ শব্দ বেরুলে ঝাড়সুদ্ধু বিদা করে দেবো।

সারারাত শুধু বমি করে ঘর ভাসিয়েছে বিনোদ। পোড়া বারুদ, কাঁচা রক্তের আঁশটে গন্ধ যেন মশারীর মতো ঢেকে রেখেছে তাকে। রেবা শীতের রাতে ঘরের সব কটা জানলা খুলে দিয়ে এক সঙ্গে একগোছা ধূপ জ্বেলেও বমি থামাতে পারেনি। চোখ বন্ধ করলেই ঠিল কণ্ঠার উপর একটা ক্ষত। গ্লাক-গ্লাক শব্দ। ভলকে ভলকে রক্ত ছুটে আসছে ক্ষত মুখে। চার জোড়া চোখের কুটিল, ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। ···বিনোদ বলেছিল, সারারাত একটা গলার কাশির শব্দও শুনিনি তারাদা! রাস্তার কুকুরগুলোও যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল কাল রাতে। ভোর হবার আগেই তোমার বাড়ি আসতে দোরগোড়ার জমাট রক্ত ডিঙিয়ে যখন রাস্তায় নামলাম তখন তাকাবো না ভেবেও পিছনে তাকিয়ে দেখি— রাস্তার ঠিক মাঝখানে আধখানা শরীর পড়ে। বাকি আধখানার মাংস-টাংস ঘুঁটে হয়ে আশপাশের বাড়ির দেয়ালে শুকোচ্ছে।

বলিস কি রে—, তারাপদ ধপ করে বসে পড়েছিল বিনোদের পাশে।

ত্রাস, উদ্বেগে অবসন্ন মস্তিষ্কের কোষে কোষে গরম দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডি তার ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। বিনোদের চোখে সারারাতের পর ঘুম নামতে চাইছিল। গলার স্বর গাঢ়, একজোড়া পুরুষ এবং নারীর স্বাভাবিক রক্তের প্রবৃত্তি আমার জন্মের ইতিহাস। আমার রক্তে তাদের কামনা-বাসনা, টিঁকে থাকার তাগিদ। আমার পিতৃপুরুষেরা কেউ কোনোদিন বড় মাপের মানুষ নয়। আমিও তাদের মতো একটা জেনারেশন রেখে চলে যাবো।—এই তো? তাহলে? তাহলে ওরা আমায় মারবে কেন তারাদা? আমার মতো মানুষ কি পৃথিবীতে আন্‌-ওয়ানটেড?

এসব গত শীতের ঘটনা।

সময়ের ধুলোর পরত পড়ে সে রাতের স্মৃতি এখন ঝাপসা অনেক। কিন্তু

মাঝে মাঝে বিনোদের ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় বোমার শব্দ গুটি গুটি পাড়ার সীমানায় পৌঁছে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, ওপাশের খাটে রেবা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুমিয়ে। বালিশের পাশ হাতড়ে টর্চ তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে বিনোদ। খুঁটিয়ে দেখে দরজা উচিত-মতো বন্ধ কি না। তালাটালা ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে কি না। ফিরে গিয়ে দেখে, শোবার ঘরের দরজায় রেবা। স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে।...পর পর দু'খানা ঘর। একটা শোবার। আর একটা বৈঠকখানা, ছেলে-মেয়েদের পড়ার ঘর। রেবা নিঃশব্দে শেকল খুলে সে ঘরে ঢোকে। পাযে পায়ে এগিয়ে যায় বিনোদ। রেবা যেন নিজের শরীরকে ব্লটিং-পেপারের মতো করে বিনোদের মন থেকে সে-রাতের স্মৃতি শুষে নিতে চায়।

দুঃসময় আর এক দুঃসময়কে যেন হাত ধরে ডেকে নিয়ে আসে। অফিসে জোর গুজব নর্থ-বেঙ্গলে বদলির। এখনো চিঠিপত্র আসেনি। হেড অফিস থেকে রোজই উড়ো-খবর আসছে। বিনোদ জানে এবার তার নিস্তার নেই। বদলির তালিকা থেকে তার নাম স্বয়ং ঈশ্বরও বাদ দিতে পারবে না।

ক্রমাগত ছক ভেঙে যাচ্ছে। বিনোদ যতই প্রয়োজনীয় রদ-বদল করে জীবনটাকে খাড়া রাখতে চাইছে, অনুভব করছে একটা অদৃশ্য শক্তি বার বারই নাড়িয়ে দিচ্ছে তার ভিত্তিভূমি। অগোচরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে রেখে যাচ্ছে, বিনোদ এবার কী করে! ঠোঁটে একটুখানি মুচকি হাসি।

নর্থ-বেঙ্গলে বদলি। রেবা থাকবে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতে। পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে কোন নিরাপদ পাড়ায় বাড়ি খুঁজবে বিনোদ? এ-শহরের কোন পাড়া থেকে বোমার শব্দ শোনা যায় না?

তারাপদ বিনোদকে পথ দেখাতে পারছে না। মুখে বলে বটে, ভেবে কি করবি? ঘুরে আয়। আমি তো রয়েছি। অতো চিন্তা করলে চলে না। আবার বলে, তোর টাইমটা ভালো যাচ্ছে না রে বিনু!

বিনোদ মনমরা হয়ে তারাপদর দোকানে হাজিরা দেয়। আগের মতো সব ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠাট্টা রসিকতায়, আলোচনায় মাততে পারে না। গল্পগুজব জমে না।

বিনু—, অন্যমনস্ক বিনোদকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল তারাপদ, তুই আত্মায় বিশ্বাস করিস?

আত্মা! —হঠাৎ?

তোর আইডিয়াটা কি বুঝতে চাইছিলাম।

কোনো আইডিয়া নেই—, নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে বিনোদ বলেছি।, ওসব বিস্তর কচকচির ব্যাপার।

পুরোপুরি অবিশ্বাস করিস না তাহলে?

বিনোদ না ভেবে বলেছিল, বলতে পারো।

আর ফিউচার টেলিং বিশ্বাস করিস?

তোমার ওই সব জ্যোতিষের ব্যাপার—বিনোদের গলায় বিদ্রূপ, খাঁচার টিয়া ঠোঁটে করে ভাগ্যের স্ট্যাটিসটিক্স জানিয়ে দেবে? পাথর, অভাবে গাছের শেকড় ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে?

আহা রাগছিস কেন—একটুও না রেগে শান্ত স্বরে তারাপদ বলেছিল, আত্মারা যদি তোর ভবিষ্যৎ বলে—তাহলে?

দুর! মরছি মাথার ঘায়ে—আর তুমি এখন আত্মা-ফাত্মা নিয়ে কচালি শুরু করলে! চা আনাও।

এই চা নিয়ে আয়—, হুকুম দিয়ে তারাপদ কাউন্টারে ওপর ঝুঁকে এসেছিল, তোর কথা চিন্তা করেই কিন্তু বলছি!

আমার কথা চিন্তা করে? বিনোদের গলার স্বরে বিস্ময়। কুটিল চোখে তারাপদর দিকে তাকিয়েছিল, মাদুলি-টাদুলি পরাবার মতলব? রেবা বুদ্ধি দিয়েছে?

আরে না না—, হাতে বরাভয়ের মুদ্রা দেখিয়ে তারাপদ বলেছিল, আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়? সামনের মঙ্গলবার অমাবস্যা। আমার বাড়ি চলে আসবি সন্ধের আগে। চা-টা খেয়ে নিয়ে যাব তোকে।

আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলো বিনোদ।

আহা একবার চোখে দেখতে দোষ কি! মঙ্গলবার চলে আয়।

চারপাশের সাবেকি আমলের বাগান। বড় বড় গাছ। গাছের তলায় পাথরের মতো জমাট অন্ধকার। বিরতিহীন ঝিঁঝির ডাক। জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা আটচালা। মাটির দেয়াল। চারপাশ ঘিরে মাটি-লেপা দাওয়া। বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের চাল। সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠার মুখে পায়ের চটি খুলে রাখলো তারাপদ। দেখাদেখি বিনোদও।

একেবারে অন্য ধরনের পরিবেশ। বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে বিনোদের। তারাপদ দাওয়ায় উঠে সামনের দরজায় দু'পাশের ফ্রেমের কাঠে হাতের ভর রেখে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। শরীরের অর্ধাংশ দরজার

বাইরে। গলার স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করে ডাকলো, কুনেদা—?

ঘরে হ্যারিকেন জলছে। সামনে তারাপদর শরীরের আড়াল। পেছন থেকে বিনোদ দেখল একটা বসা-মানুষের অতিকায় ছায়া দেয়াল জুড়ে। ছায়াটা একটু-আধটু দুলছে। যেন ছায়ার মানুষ বসে বসে কিছু একটা করছেন।

আয়,—ভরাট গলার স্বর।

সঙ্গে আমার এক বন্ধু রয়েছে। সেদিন তোমায় যার কথা বলেছিলাম।

ভেতরে নিয়ে আয়।

তারাপদ দরজার ভেতর থেকে অর্ধেক শরীর বাইরে এনে বাকি অর্ধেকের সঙ্গে জুড়ে ব্যালান্স করে ইশারায় জানালো, আয়।

কৌতূহল একটু একটু করে বেশ উগ্র হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে একটা শিরশিরে ভাবও টের পাচ্ছে বিনোদ। যেন এখুনি তার চোখের সামনে একটা অদৃষ্টপূর্ব অতীন্দ্রিয় জগৎ ভেসে উঠবে।

বেশ বড় ঘর। হ্যারিকেন জলছে। যতটা আলো হওয়া উচিত তার অনেকখানি চিমনির কালিতে ভেতরেই থেকে যাচ্ছে। একটা প্রদীপ জলছে ঘরের কোণে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটা কালো রঙের মূর্তি রয়েছে প্রদীপের সামনে। অনেকগুলি জবা ফুলের মালায় মূর্তি ঢাকা পড়েছে। একটু দূরে মূর্তির দিকের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছায়ার মানুষ। মাটির ওপর উবু দিয়ে বসে অখণ্ড মনোযোগে কিছু একটা করছেন। বলে দিতে হয় না, এই হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়। —তন্ত্রমতের লাইনে মহাশক্তির সাধক।

তারাপদ ততক্ষণে মূর্তির সামনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করছে। একটু পরে ওই অবস্থায় বসে-বসেই লুঙ্গির ট্যাক থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে মূর্তির পায়ে ঠেকিয়ে উঠে কুনেদার পাশে এসে বসলো আবার হাঁটু ভেঙে। কাগজের মোড়ক কুনেদার সামনে রেখে দুটো পা খুঁজে নিয়ে পায়ের ধূলো মাথায় ঠেকালো।

কুনেদা হাতের কাজ ফেলে মোড়ক খুলে দেখছেন।

তারাপদ হাত নেড়ে ইশারা করছে বিনোদকে। বোঝাচ্ছে, এতক্ষণ ধরে সে যা-যা করেছে তাই অনুসরণ করতে। অর্থাৎ প্রথমে মূর্তিপ্রণাম, তারপর কুনেদাকে। ইচ্ছে বিশেষ না-থাকলেও গুটি গুটি সব কিছুই করতে হলো বিনোদকে। তারাপদর মতো কুনেদার পাশে বসতে দেখতে পেলো কুনেদার খানিকটা।—পাকা দাড়ি-গোঁফ, ঘন পাকা ভ্রূ। ভ্রূ ঝুলে পড়েছে চোখের

ওপর। দুটি উজ্জ্বল চোখ। বুকের সাদা লোমের ওপর রুদ্রাক্ষের মালা, সাদা পৈতে ডুবে রয়েছে বুকের লোমের মধ্যে।

তেরো নম্বর—? কোথায় পেলিরে তারাপদ—কুনেদা মোড়ক খুলে প্রথমে হ্যারিকেনের আলোয় মেলে ধরে দেখে তারপর নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে জিজ্ঞেস করলেন। গলার স্বরে অবিমিশ্র খুশি।

চটকলের এক নেপালী দারোয়ান আমার খদ্দের! সে-ই দেশ থেকে আসার সময় এনেছে। —ডাইরেক্ট ফ্রম ফিল্ড।

বোঝা যায় জিনিসটা কুনেদার পছন্দ হওয়াটাই তারাপদর পরম প্রাপ্তি।

মহাশক্তি বড়ো খুশি হবে রে আজ!

তোমার আশীর্বাদ কুনেদা! আমি আর কি—, তারাপদর স্বর বুজে এলো।

কুনেদার পাশে বসে এখন সামনেটা দেখতে পাচ্ছে বিনোদ। একটা খবরের কাগজের ওপর এক-টুকরো কাঠ। কাঠের ওপর শুকনো, পাকানো গাছের পাতার মতো কিছু পরম নিষ্ঠায় ধারালো ছুরি দিয়ে মিহি করে কেটে চলেছেন কুনেদা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, জিনিসটা কি! ঝাঁঝাল গন্ধ।—পঞ্চমা. শুদ্ধ বাংলায়—গাঁজা।

কুনেদা বললেন, তোরা বোস। গণেশ, নন্দ—ওদের আসার সময় হোলো।

তারাপদ বিনোদ উঠে গিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছে। সামনে, পিছন ফিরে কুনেদা। কোনার ছায়ান্ধকারে মহাশক্তি। নাকে ঝাঁঝালো গন্ধটা লেগে থেকে অস্বস্তি ঘটাচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক চাপা দিয়ে দুবার খিচিৎ-খিচিৎ করে হেঁচে ফেলল বিনোদ।

আর কেউ আসবে—বিনোদ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো তারাপদকে।

গণেশ আর নন্দ ঘোষ—তারাপদও ফিসফিস করে জবাব দিল, গণেশকে তুই দেখেছিস। হাসপাতালের পাশে ডাব মাটির কুজো, তালপাতার পাখার দোকান।

বিনোদের মনে পড়লো। পরিচয় নেই। মিশকালো গায়ের রঙ, মোটা সোটা চেহারা, বেশ ভুঁড়ি আছে। লোকটার অদ্ভুত অভ্যাস, পরনের গেঞ্জি সব সময় বুকের নিচে গুটয়ে তোলা থাকে। লোকটার মুখের চেহারা মনে পড়ার আগে অভ্যাসটার কথা চোখে ভাসে।

নন্দ ঘোষ হচ্ছে—, তারাপদ আগের মতো নিচু স্বরে বলল, অঞ্চল-পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ। বিঘে ত্রিশেক জমি আছে। শ্যালো-ট্যালো বসিয়েছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে দশ হাজার টাকা গোল হয়ে গেছে।

ইশারায় ঘরে মাঝখানে একটা বিশেষ স্থান দেখালো তারাপদ, ওই পঞ্চমুণ্ডির আসন।

হাতজোড় করে আসনকে নমস্কার করলো।

বিনোদ দেখল, মেঝে থেকে ইঞ্চি চারেক উঁচু আড়াই ফুট বাই দু-ফুট একটা জায়গা মাটি দিয়ে পরিষ্কার নিকানো।

প্রায় ফিসফিস করে কথাগুলো বলেছিল তারপদ। কিন্তু কুনেদা কি করে শুনতে পেলেন। জলদ গম্ভীর স্বর শুনলো বিনোদ, দেড় বৎসর ধরে পাঁচটি মহাশ্মশানে অহোরাত্র চিতার ধারে বসে সংগ্রহ। দ্বিতীয় বার রজস্বলা হয়নি। অপঘাতে মৃত্যু—এমন কুমারী নারীর পাঁচটি মুণ্ড।

বাইরে থেকে শকুন ছানার কান্না ভেসে এলো। কাছাকাছি বোধহয় তাল গাছ আছে। শুকনো পাতার খড়মড় শব্দ। বিনোদ দেখলো, হাতের কাজ থামিয়ে কুনেদা এক মনে কি শুনছেন। ভরাট গলায় হাঁক দিলেন, মা—মা—!

বিনোদের এবার সত্যিই গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো।

পায়ের শব্দ দাওয়ায়। ঘরে ঢুকলো একজন। বিনোদ মুহূর্ত চিনলো, গনেশ। বুকের ওপর গুটিয়ে তোলা গেঞ্জি। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ। বেশ ভারি কিছু রয়েছে ব্যাগে। তারাপদর মতো একই ভঙ্গিতে মূর্তি প্রণাম করলো গণেশ। মূর্তির পায়ে ব্যাগটা ছোঁয়ালো। ব্যাগের ভেতর থেকে দুটো বোতল বার করে পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো কুনেদাকে।

তারাপদ ফিসফিস করে বলল, চোলাই এখন কারণ হয়ে গেলো।

ঢাল—, এক পলক দেখে আদেশ দিলেন কুনেদা।

গণেশ পেছন ফিরে তারাপদর দিকে তাকিয়ে হাসলো, কতক্ষণ?

আধ ঘণ্টা হলো—, তারাপদও হাসলো। বিনোদকে দেখিয়ে বলল, বন্ধু। নিয়ে এলাম।

ভালো করেছেন—, গণেশ বিনোদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি ছুঁড়ে দিল।

বিনোদ দেখলো, গণেশ একটা মাথার খুলি বার করেছে। বোতল খুলে কারণ ঢেলে খুব যত্ন করে রাখলো কুনেদার হাতের পাশে। কোথা থেকে একটা ছোট গেলাস বার করে সেটিও কারণে প্রায় পূর্ণ করে বাড়িয়ে ধরলো কুনেদার দিকে, উচ্ছুগ্যু করে দাও বাবা। খুব ঝামেলি গেছে সারাদিন। আর পারছি না।

তর সইছে না, না কুনেদা রেগে উঠেছেন, হাতে একটা কাজ করছি দেখছিস। এসব তো আমাকেই করতে হয়।'

কি করবো বাবা,—গণেশ ম্লান ভাবে বলল, আমার হাতের শুখা যে পছন্দ হয় না তোমার।

ঘরে ঢুকলো নন্দ ঘোষ। রোগা কেঠো চেহারা। মাথায় টাক। রোদপোড়া তামাটে গায়ের রঙ। হাঁটুর ওপর তুলে পরা ময়লা ধুতি। কাধের ওপর আলগোছে ফেলা ফতুয়া। ঘরে ঢুকেই তড়বড় করে এগিয়ে গেলো মূর্তির সামনে। কাঁধের ফতুয়ার পকেট হাতড়ে কাগজের মোড়ক বার করে কোনরকমে মূর্তির পায়ে ঠেকিয়ে রাখলো কুনেদার পায়ের কাছে।

কুনেদা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, একটুও মেদ নেই শরীরের কোথাও। এই বয়েসেও শরীরের চামড়া তেমন কুঁচকোয়নি। সটান দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে গাঢ় লাল রঙের খাটো ধুতি। একহাতে বুকের কাছে তুলে ধরা মড়ার মাথার বাটিতে কারণ। নন্দ ঘোষের দেওয়া মোড়কের গন্ধ শুঁকে হাঁকলেন, নন্দ—।

বাবা—নন্দ ঘোষের গলার স্বর ভয়-পাওয়া।

পাপী। মহাশক্তির সঙ্গে তঞ্চকতা?

নন্দ ঘোষ কুনেদার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে।

বাইশ নম্বরের ওপর মহাশক্তি গ্রহণ করেন না—একথা জানিস না তুই?

ক্ষ্যামা করে দাও বাবা—, নন্দ ঘোষ কুনেদার পায়ের ওপড় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার দোষ নেই বাবা। খরা-তেরানের মিটিন্ ছিল পঞ্চায়েত অপিসে। নাতিকে পয়া দিচ্লাম। নাতি পয়া মেরে চ। আজ বাড়ি গে শ্লা নাতিকে—।

মনে রাখিস, কুনেদা ক্ষমা করলেন, শুখা বানা। তারাপদর আনা নেপালীটা বানা আজ।

হুশ করে এক ঝলক হাওয়া ঢুকলো ঘরে। হ্যারিকেনের আলো চিমনির মধ্যে অনেকখানি কালি উগ্‌রে দিল। প্রদীপের শিখা নিবু-নিবু। দেয়ালের ছায়াগুলো এলোমেলো। ঘরের পাশেই একটা শেয়াল ডেকে উঠলো। সাড়া পড়ে গেল দূর-দুরান্তে। হাতে খুলি নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কুনেদা, মা—মা—। এতো চঞ্চলা কেন মা তুই আজ?

বিনোদের গলার ভেতরটা হঠাৎ বড় শুকনো লাগলো। দরজার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কারা যেন ফিসফিস করে জটলা করছে।

বিনোদ আর তারাপদ যেন দর্শকের আসনে বসে।

সমতল মঞ্চের মাঝখানে কুনেদা পঞ্চমুণ্ডের আসন সামনে রেখে বসেছেন। পেছনে আবছা অন্ধকারে মহাশক্তির মূর্তি। ডানদিকে গণেশ। বাঁয়ে নন্দ ঘোষ। কুনেদার হাতের নাগালের মধ্যে কারণের বোতল, খুলির বাটি। পঞ্চমুণ্ডের আসনের ওপর একটা পাতলা কাঠের বোর্ড। বোর্ড জুড়ে লাল রঙে আঁকা দুটি ছোট–বড় বৃত্ত। দুটো বৃত্তের পরিধির লাইনের মাঝখানে অনেকগুলো এক মাপের খোপ। প্রত্যেকটি খোপের মধ্যে ইংরেজির এক–একটি অক্ষর। এ থেকে জেড পর্যন্ত। দুটি পাশাপাশি সরল রেখা বৃত্ত চিরে পরিধির লাইনের সঙ্গে মিশেছে। দু-দিকে যে দুটি খোপ তৈরি হয়েছে তার একটিতে লাল রঙে লেখা, নো। বিপরীত দিকেরটিতে সাদা রঙে, ইয়েস। মাঝখানে এক ইঞ্চি ব্যাসের আর একটি বৃত্ত। সেখানে মহাশক্তির পায়ের কাছ থেকে আনা সিঁদুর মাখানো একটি টাকা। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মাথার ছাপওলা। খাঁটি চাঁদির। বোর্ডের ওপর সামান্য শরীর ঝুঁকিয়ে তিনটি ডানহাতের মধ্যমার তলায় শুয়ে রয়েছেন মহারানী ভিক্টোরিয়া।—বিনোদের দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্চসজ্জা, মঞ্চে কুশীলবদের অবস্থিতি এইরকম।

হ্যারিকেনের চিমনির ভূষো আরও গাঢ়। ঘরের বাতাস গুখার ধোঁয়া এবং কারণের ঝাঁঝে ভারি।

বাইরে ঝিঁঝির ডাক, আবহসঙ্গীত।

কার আত্মাকে প্রথম ডাকা হবে আজ—, কুনেদা মতামত চাইলেন সকলের।

ঘরে হঠাৎ নীরবতা।

নন্দ ঘোষ বলল, আমার পেখোম্ ইস্তিরিকে ডাকলে হোত না?

খবরদার নন্দ—, কুনেদা গর্জে উঠলেন, খুব ঝামেলির মেয়েছেলে! সেদিন ডেকে আনলি, কি দাপান দাপালে! যাবার সময় হ্যারিকেন উল্টে তোকে মাটিতে চিত করে শুইয়ে গেলো—মনে নেই?

মনে আবার নেই—, নন্দ ঘোষের চোখে ত্রাসের ছায়া, মনে হলো বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরেচে।—সেকেন বে'টা করায় খুউব রাগ। সেদিন তুমি আত্মা না সামলালি আমার কাঁচায় আগুন নেগে যেতো!

কুনেদা বললেন, তবে?

তবু দুটো কতাবাত্তা বলতে ইসচে করে। কেমন আচে সেকেনে জানতে ইসচে করে—, নন্দ ঘোষের গলার স্বর বড় কাতর শোনালো।

কুনেদা বললেন, এমন একজনের আত্মার কথা চিন্তা করতে হবে যে আমরা

এখানে যারা আছি—সকলের চেনা। তোর বউকে আমরা না হয় চিনি কিন্তু ওই ছোকরা তো চেনে না।

বিনোদ হঠাৎ বলে ফেললো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আনলে হয় না? সকলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখছি। মুখ মনে করতে পারবো।

কুনেদার ঘন ভ্রূর তলা দিয়ে সস্নেহ দৃষ্টি একবার তার মুখের ওপর দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে গেলো, লক্ষ্য করলো বিনোদ।

ভালো বলেছে ছোকরা—, কুনেদা বললেন, খুব উঁচু দরের আত্মা। উনি কি আসতে চাইবেন? দেখা যাক, মহাশক্তি কি করে। মা—মা!

এ গোল্ডেন সোল্—তারাপদ সাগ্রহে সমর্থন জানালো।

গণেশ মিনমিন করে বলে ফেললো, আমরা না হয় সকলে রবি ঠাকুরের ছবি দেখেছি। কিন্তু নন্দ দা কি···

না, আমি দেকিনি। তুমিই দেকেচো খালি—, নন্দ ঘোষ রেগে উঠলো, রবি ঠাকুরের জন্মোদিনে লাইব্রেরীর মিটিনে কাকে বসতে চেয়ার দিয়েছেলো? তুই তো ডাইরে-ডাইড়ে দেকচিলি—। আমার নাতিন এসো বোশেখ মাস, এসো বেশোখ মাস বলে হারমণি বাজিয়ে গান গায়নি জন্মোদিনের মিটিনে?

না রে গণেশ, কুনেদা হাল ধরলেন, তুই নন্দকে যতটা ইয়ে ভাবিস নন্দ ততটা নয়। নাও সকলে রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবো।

বাইরে একটা রাতচরা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে গেলো। পাঁচজন ভাবছে—ছবির রবীন্দ্রনাথকে।

উনি এসেছেন—কুনেদার স্বর সম্ভ্রমে মৃদু।

সারা শরীর হঠাৎ শিউরে উঠলো। বিনোদ দেখল, তিনজনে পঞ্চমুণ্ডের আসনের ওপর আরো খানিক ঝুঁকে পড়েছে। পাঁচজোড়া চোখের দৃষ্টি তিনটি মধ্যমার তলায় চাঁদির টাকার দিকে।

খুব ক্ষীণ স্পন্দন—, নাড়ি পরীক্ষা করে ফল ঘোষণা করার মতো করে কুনেদা বললেন, বৃদ্ধ মানুষ! অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে। ইনি তো সপ্তম স্বর্গের আত্মা।

রবি ঠাকুর আপনি কি এসেছেন? গণেশ এমন করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো যেন কালা-মানুষকে জিজ্ঞেস করছে। গণেশ আবার বলল, আপনি যদি রবি ঠাকুর হন, তাহলে আপনার নামের প্রথম অক্ষরের দিকে যান।

বিনোদ দেখলো, তিনটি আঙুলের তলায় চাপা সিঁদুর মাখানো টাকা খু.

ধীরে ধীরে ইংরাজি আর অক্ষরের দিকে গিয়ে মাঝখানে ফিরে এলো একই ভঙ্গিতে।

রবীন্দ্রনাথই এসেছেন—কুনেদা জানালেন, কার কি প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করে নাও। বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। পৃথিবীতে এসে খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

নক্সির ঝাঁপির দশ হাজার কি ফেরত পাবো রবি ঠাকুর, নন্দ ঘোষ প্রায় ডুকরে উঠলো, সুদের দরকার নেই। আসল পেলিই হবে।

টাকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃত্তের মাঝখানে।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর কুনেদা বললেন, রবীন্দ্রনাথকে এসব জিজ্ঞেস করাই ভুল। গান, পদ্য লেখার লাইনের লোক—উনি কি কখনো টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করতেন? নাও আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করো।

তারাপদ সকলের দৃষ্টির আড়ালে খোঁচাচ্ছে বিনোদকে।

কি?

জিজ্ঞেস কর!

কি জিজ্ঞেস করবো?

তোর ফিউচার প্রবলেম?

ভেতরে ভেতরে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে গিয়ে বিনোদ অনুভব করলো তার চোখের সামনে অন্য একটা মুখ ভেসে উঠেছে। সে মুখ রবীন্দ্রনাথের নয়।

বিনোদ খোঁচা খেলো, কি হল?

আমতা আমতা করে বিনোদ বলল, রবীন্দ্রনাথ তো কখনো চাকরি-বাকরি করেননি। চাকরির প্রবলেমটা ঠিক বুঝবেন না। অন্য আত্মাকে জিজ্ঞেস করে নেবো।

বিনোদ বেশ বুঝতে পারলো, তারাপদ খুবই ক্ষুণ্ণ, কিন্তু তার যুক্তি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছে না মন থেকে।

আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিচ্ছি। বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন। তার ওপর অনেক দুর যেতে হবে ওঁকে।

গণেশ বলে উঠলো, একেবারে শুধু শুধু ছেড়ে দেবে? কাউকে পাঠিয়ে দিতে বললে হতো না? আত্মাদের সঙ্গে একটা লাইন হয়েছে—যদি কেটে যায়?

মন্দ বলিস নি—, কুনেদা চিন্তিত ভাবে বললেন, তাহলে ওনার কাছাকাছি থাকেন এমন আত্মাকে পাঠাতে বলতে হয়। নিচু স্তরের হেজিপেজি আত্মাদের পাঠাতে বললে তো হবে না। —কাকে পাঠাতে বলি বল দিকিনি?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ—, নন্দ ঘোষ বলে উঠলো, আজ সব ভালো ভালো আত্মাদের আনা হোক।

বিনোদের কথা মনে করে গাঁইগুঁই করলো তারাপদ, একজন বেশ বোঝদার আত্মাকে আনলে হোত না? প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বোঝেন-টোঝেন —এমন আত্মা।

নাঃ, রামকৃষ্ণ ঠাকুরই ভালো—নন্দ ঘোষ বলল, আজ মনটা বড়ো আকাশ পানে ছিটকে-ছিটকে বেড়াচ্ছে। —ন্যাপালি দ্রোব্যটার ধক আচে।

ঠাকুর এসেছেন, কুনেদার গলার স্বর।

তিনজনের মধ্যমার তলায় চাপা মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেন একটু বেশি চঞ্চলা।

কুনেদা সেদিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন, ঠাকুরের আমার স্বভাবটি ঠিক তেমনিই আছে। —তেমনি ছটফটে।

ঠাকুর আমার নক্কির ঝাঁপির টাকাটা—?

তুমি থামতো নন্দদা! গণেশ প্রায় ধমকে উঠলো, যার কাছে টাকা মাটি মাটি টাকা—তাকে তুমি জিজ্ঞেস করছো লক্ষীর ঝাঁপির কথা।

অনেকগুলো টাকা রে গণশা—, নন্দ ঘোষ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আমি ঠাকুরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, গণেশ ঝুঁকে পড়লো বোর্ডের ওপর।

কর—,কুনেদা সাবধান করলেন, কিন্তু কামিনীকাঞ্চন বাদ। —রেগে যাবেন খুব।

ঠাকুর, আমার ছেলেটা কি এবার পাশ করতে পারবে?

চাঁদির টাকা নোর ঘরে গিয়ে আবার মাঝখানে বৃত্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গণেশ, তখনই জানতাম! চুলের বাহার করে ইস্টিশানে মেয়ে দেখে বেড়ালে কি পাশ করা যায়!

আর কারো কোন প্রশ্ন আছে?

তারাপদ আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে বিনোদকে।

বিনোদ নড়েচড়ে বসে, গলা সাফ করে জিজ্ঞেস করতে যাবে, চোখের সামনে সেই মুখ।

ঠাকুরকে ছেড়ে দিও না বাবা, নন্দ ঘোষ বলল, আমার একটা ছোট্ট পোশ্নো আচে।

কুনেদা বললেন, তাড়াতাড়ি কর।

স্বরে কাকুতি এনে নন্দ ঘোষ বলল, ঠাকুর তুমি অন্তোয্যামি! আমরা কি আর এক-দম্ ন্যাপালি চড়িয়ে নেবো?

তিনজনের মধ্যমার তলায় মহারানী ভিক্টোরিয়া যেন গাউন গুটিয়ে দৌড়ে গেলেন ইয়েস লেখা ঘরের দিকে।

তারাপদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, আমরা এবার যাই কুনেদা?

যাবি—, কুনেদা লাল চোখ মেলে তাকালেন, আর একটু থাকলে পারতিস। এবার একজন তেজী আত্মা আনতাম।—বিবেকানন্দ।

আমায় বাড়ি ফিরতে হবে—বিনোদকে দেখিয়ে বলল, ওকেও যেতে হবে অনেকটা। দিনকাল বোঝো তো!

তবে যা। আবার আসিস। তুমিও এসো হে ছোক্‌রা।

আমবাগানের মধ্যে বিনোদ তারাপদকে জিজ্ঞেস করলো, চলে এলে যে তারাপদদা?

আর থেকে কি হবে—, তারাপদর গলার স্বরে বিরক্তি, আর এক ছিলিম চড়ালে নন্দ ঘোষ দেয়ালে ঠেসান দিয়ে গুম্ হয়ে বসে মাঝে মাঝে দশ হাজার টাকা দামের দার্ঘশ্বাস ছাড়বে।...গণেশটা আবার কারণ ভালোই টেনেছে। ছেলেকে গালমন্দ করবে। বাড়ি গিয়ে বোধহয় আজ মেরেই ফেলবে ছেলেটাকে। কুনেদা—পঞ্চমুণ্ডের আসনের ওপর থেকে বোর্ড-টোর্ড ছুঁড়ে ফেলে নিজে ঠেলে উঠে বসে মা—মা—বলে ছত্রিশ নাড়ি পেঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়বে।—দূর!

মাঠে নেমে হন হন করে এগিয়ে চলেছে তারাপদ। বিনোদ পেছনে।

অতো তাড়াতাড়ি হাটছ কেন?

আমায় এখন দোকানে যেতে হবে। —তোমার মতো তো আর নয় সবাই।

বিনোদ বলল, খুব রাগ হয়েছে আমার ওপর—না তারাদা?

হবে না—তারাপদর গলায় ঝাঁঝ, এতো কাঠখড় পুড়িয়ে তোকে আমি এখানে নিয়ে এলাম কি করতে?

ম্লান মুখে বিনোদ বলল, ভবিষ্যৎ জানতে।

জেনেছিস? —একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিস?

বিনোদ নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

আকাশ জুড়ে প্রিয় আত্মারা করুণ চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। চতুর্দিকে ঘিরে অমাবস্যার অন্ধকার নিরেট পাথরের মতো।

বিনোদ কি করে তারাপদকে বোঝায়, সে চেষ্টা করছিল। খুব চেষ্টা করে-ছিল। নিজের ভবিষ্যৎ জানতে কার না ইচ্ছে হয়। যখনই জিজ্ঞেস করতে গেছে, মুখোমুখি একটি মুখ। দুজনের মাঝখানে তালা বন্ধ গ্রিলের গেট। কণ্ঠার ঠিক নিচে গভীর ক্ষত। ভলকে-ভলকে রক্ত উঠে আসছে। গ্রাক-গ্র কৃ শব্দ। সেই শব্দের অর্থ, দুচোখের দৃষ্টির আর্তি কি সে রাতে সত্যিই বুঝতে পারেনি বিনোদ?—আশ্রয় চেয়েছিল এক মানবাত্মা। বিশ্বাস করতে পারেনি বিনোদ।

বিনোদ যতবারই নিজের ভবিষ্যৎ জানতে গেছে, সেই আত্মা তার সামনে সব কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বিনোদ মনে মনে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে বলেছে, ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

সম্পর্ক

এই নিয়ে তিনটে আপ ট্রেন চলে গেল একের পর এক।

রতন ঘড়ি দেখল। পৌনে আটটার ট্রেন বারো মিনিট লেটে যাচ্ছে। পরের গাড়ি সময় মতো এলে পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে পড়া উচিত। একশো ছাব্বিশ নম্বর আপ— সুপার ফাস্ট্। না-থেমে ধুলোর ঘুর্ণি তুলে ছুটে যায়। দাপে থরথর আশপাশের মাটি কাঁপে। ন'টায় পরের লোকাল।

প্লাটফর্মের প্রান্তে লেভেল-ক্রসিং।

ট্রেন আসার খবর হতে টং-টং ঘণ্টা বাজিয়ে লেভেল-ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ হয়েছিল। গেটের লাল আলো দপদপ করে জ্বলছে প্রায় চোখের ওপর। পাটের গাঁট বোঝাই একটা ট্রাক, পিঠে উঁচু করে সাজানো উলুখড়ের বোঝা নিয়ে দুটো গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। পূর্ব দিকে মাইল দুয়েক দূরে ঘোষমারির বিল। নদী-খালে ইছামতীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ হয় বর্ষায়। বিলের পাড় ধরে এক সময় ছিল বিস্তীর্ণ উলুবন। বেলুনের মতো ফুলতে-ফুলতে বসতি বিলের পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। উলুবন ছোটো হয়ে আসছে। বিচুলি কিনে ঘর ছাইবার সঙ্গতি নেই যাদের— সামনের বর্ষায় মাথা বাঁচাতে তারা উলুখড় কিনে রাখছে সময় মতো।

ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে যেতে গেট উঠল। চাপা গর্জন করে ট্রাকটা হেলতে-দুলতে লাইন টপকাচ্ছে। ধোঁয়া। পোড়া ডিজেলের গন্ধ। সাস্‌পেনসার, গাঁটবাঁধা দড়ির শব্দ হচ্ছে মচ্‌মচ্। পেছনের গরুর গাড়ি দুটোর বলদের পিঠে পাঁচনের বাড়ি পড়ল।

গেটের আলো পেঁচার চোখের মতো চোখ পাল্টে এখন সবুজ।

ধুলো, শুকনো পাতার ঘুর্ণি তুলে চৈত্রের দম্‌কা বাতাস রাস্তা ধরে ছুটে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। নীলকণ্ঠর চায়ের দোকানের পাশে মুচকুন্দ গাছে ফুল ফুটেছে অজস্র। হালকা মিষ্টি সুবাস বাতাসে। হাওয়ার ঝাপটায় টালির ছাদে ফুল, পাতা খসে পড়ার শব্দ। দু-একদিনের মধ্যেই বোধ হয় পূর্ণিমা। সন্ধ্যা থেকেই চাঁদের আলো। দোকানের একমাত্র বাল্বটা ধোঁয়া-ঝুলের মোড়কে প্রায়

ছানিপড়া চোখ। ম্যাটম্যাটে আলো সামনের টিনের ঝাঁপে আটকে রাস্তার অর্ধেক পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। ঝাঁপ ঠেকনা দেবার সরু বাঁশ কেটে দু-খণ্ড করেছে আলোটাকে। জ্যোৎস্না তেজি হচ্ছে। রাস্তার ওধারে নোনাধরা দেয়ালে ব্রাশ বুলিয়ে জাফরানি রঙের পোঁচ চড়াচ্ছে। পূর্ণিমার খবর দিয়ে দেয়াললিপি লেখা হবে রা ত-গভীরে। চাঁদ মাথার ওপর এলে।

রতন দেখল, গাবতলার বৃন্দাবন কুঁজো হয়ে পা-ঘষটে দোকানের আলো পার হচ্ছে। চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় রাস্তার ধারে গৃহস্থের লাউমাচা থেকে ডাগর-ডোগর লাউটি ছিঁড়ে কোঁচার তলায় লুকিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। রতন একবার বলেছিল, 'খাইয়ে-দাইয়ে জলভর্তি চামড়ার থলিটাকে আর কেন ভারি করছ বৃন্দাবনদা? হাসপাতালে গিয়ে কাটিয়ে এলেই হয়। শুধু শুধু পুষে রেখেছ—।' কোমরে দুহাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন চিন্তিতভাবে বলেছিল, 'আমাবোস্যে-পুন্নিমে৺ টাটানি উঠলে তাই তো ভাবি ছোটবাবু—। আবার চেন্তা হয় এতোখানি বয়েস পোজ্জেন্ত জিনিসটা শরীলের সঙ্গে বাড়ন্ত হয়েচেন। ওব্যেস বলেও তো এট্টা কতা আছে। হপ করে বাদ দিয়ে দিলি যদি চলার ব্যালেন্স হাইরে ফেলি।'

শেয়ালদার কাছাকাছি একটা দপ্তরিব দোকানে বই-খাতা বাঁাাইয়ের কাজ করে বৃন্দাবন। ট্রেনের প্রত্যহের যাত্রী। ট্রেনে ওঠে একেবারে ল্যাজের দিকে ভেণ্ডার-কামরায়। ঝুড়িটুড়ির ফাঁকে কামবার দেয়ালে ঠেসান দেবার মতো জায়গা বার করে নেয়। তারপর একঘুমে শেয়ালদা। ফিরতি পথেও তাই। বৃন্দাবনের যাওয়া দেখে ট্রেনের শেষ যাত্রীটিও যে চলে গেল বুঝল রতন। সামনের রাস্তা মৃগী রুগীর ঘোরের মতো তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল। নেতিয়ে পড়ল আবার। রতন বুঝল, এ ট্রেনেও গিরিজার বৌ নামল না।

দিবাকরেরও দেখা নেই। অথচ সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে উড-ক্রাফ্‌ট-এ দিবাকরের হাজিরা পাঁজিতে চন্দ্র-সূর্য ওঠার নির্ঘণ্টের মতো নির্দিষ্ট।

লুঙ্গি, আদুড় গায়ে গামছা জড়িয়ে আঁতুড়ের শিশুকে শ্মশানে নিয়ে যাবার মতো বুকের কাছে ক্যাসেট্ রেকর্ডার জড়িয়ে একটা ছেলে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। উষা উত্থুপ বাজছে। ···রাম্বা···হো···, শাম্বা ···হো হো ··।

রতনের মাথার মধ্যে একটা ধারণা দানা বেঁধে উঠেছে এতক্ষণে। ওরা কি কোথাও গেল? গিরিজার বউ, দিবাকর?—সিনেমায়? ছবি শেষ হতেই ট্রেন ধরলে এতক্ষণে ওদের এসে পড়া উচিত। যদি কোনো রেস্টুরেন্টে বসে

থাকে— তাহলে অবশ্য অন্য কথা। দিবাকরের অনুপস্থিতি ধারণাটাকে যেন আরও জমাট করে তুলছে। আজই দিবাকরের সঙ্গে একটা চর-গ্রামে বাগান দেখতে যাওয়ার কথা। সাত-সকালেই দিবাকর এসেছিল। তখনই ঠিক হয়ে গেছে ব্যাপারটা। · বেশ বড়ো বাগান আম-কাঁঠাল-জাম মিলিয়ে তিরিশটা গাছ। গাছগুলোও প্রাচীন। যিনি বর্তমানে বাগানের মালিক তাঁর পূর্বপুরুষ শখ করে বাগান পত্তন করেছিলেন। ফারাক্কার বাঁধ হবার পর গঙ্গার জল বেড়েছে। গভীরতা হারিয়ে নদী পাড় খাবলাচ্ছে এখন। ভাঙতে-ভাঙতে বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ কিছু চাষের জমি ইতিমধ্যে গঙ্গার গর্ভে মিলিয়ে গেছে ভদ্রলোকের। ফলের আশা ছেড়ে গাছ কটা বিক্রি করে এখন ঘরের টাকা ঘরে তুলতে চান। দিন-পনেরো আগে বাগানের খবর নিয়ে এসেছিল দিবাকরই। বেশ উত্তেজিত। বড়ো সওদা। নিজে বাগান ঘুরে আন্দাজ কত টন কাঠ, কত টন জ্বালানী-কাঠ, রতনের উড্-ক্রাফ্ট-এ ট্রাকে করে কাঠ নিয়ে আসার রাস্তার হাল-হদিশ দেখেশুনে এসেছে। এখন রতন নিজে গিযে দরদাম ঠিক করে এলে কাজটা হয়ে যায়। আজ যাব, কাল যাব করে কথা রাখতে পারে নি রতন। আসলে তার হাতে যে এখন গাছ কেনার মতো নগদ টাকা নেই— দিবাকরের কাছে কবুল করতে পারে নি। দিবাকর ফিরে-ফিরে গেছে। মুখ দেখে মনে হযেছে খুবই অখুশি। রতনের কারখানার কাঁচামাল কেনার হিসাবপত্র মোটামুটি দিবাকরের সবই জানা। একটা হিসাব খাড়া করে শতকরা তিনটাকা হিসাবে দালালি বাবদ নিজের পাওনা একটা অঙ্ক ঠিক করে নিয়েছে মনে মনে। অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। কথা ছিল, আজ রতন যাবেই। বেলা তিনটে নাগাদ দিবাকরকে মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে বেরিয়ে পড়বে। মাইল-আষ্টেক যেতে আর কতক্ষণই বা।

অথচ দিবাকরের দেখা নেই। দুপুর তিনটে থেকে অপেক্ষা করে আছে রতন।

গিরিজার বউকে রতন দেখেছিল দিবাকরের জন্য অপেক্ষা করতে দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ। বাইরে কোথাও যাওয়ার না-থাকলে সাধারণত দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটো একটা ঝিমুনি সেরে আড়াইটে নাগাদ উড-ক্রাফটে-এ আসে রতন। ঘুরে-ঘুরে কাজকর্ম দেখে। কিছু টেবিলের কাজ সারে। আজ সকাল থেকে পাওয়ার রয়েছে। একবারও লোডশেডিং হয় নি। করাত-কলে লগ চেরাই হচ্ছে। পাশে টিনের শেডে মিস্ত্রিরা কেব্‌ল্ জড়ানোর কাঠের রিল তৈরি করছে। কেব্‌ল কোম্পানির আড়াই হাজার দশ ফুট ডায়মেটারের রিলের অর্ডারের চল্লিশ

ভাগ সরবরাহ এখনও বাকি! দু-জন বাড়তি মিস্ত্রি লাগিয়ে কাজটার গতি বাড়াবার চেষ্টা করছে রতন। নিজে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘুরে যাচ্ছে কাজের তদারকিতে। ডাউন ট্রেন ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে হর্ন বাজাল। অন্যমনস্ক চোখ তুলে স্টেশানের প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ছিল রতন। কারখানার সীমানার মধ্যে দুটো ঠাস বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের পর পুকুর। আসলে রেলের কাটিং। মাটি তুলে স্টেশানের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হয়েছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে চোখ পড়তে দেখল, গিরিজার বউ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। গাড়িতে ওঠার জন্য তৎপর হচ্ছে গিরিজার বউ। গিরিজার বউয়ের পরনে হালকা নীল রঙের শাড়ি, ম্যাচকরা ব্লাউজ, হাতে বটুয়া, চোখে সানগ্লাস। দেখে খুশি হয়েছিল রতন। কলকাতার দোকানে নিজের জন্যে একটা সানগ্লাস কিনতে গিযে কিনে ফেলেছিল। বেশ দাম নিল। গিরিজার বউ অবাক, 'ওমা হঠাৎ চশমা কেন?' বলল বটে কিন্তু উপহার পেয়ে দারুণ খুশিভাবটা মুখের ভাবান্তরে, গলার স্বরে অপ্রকাশ রাখার চেষ্টা করে নি। রতন বলেছিল, 'এমনি—। জিনিসটা চোখে লেগে গেল— কিনে ফেললাম। একজনকে দিতে হয়। —তোমার কথা মনে হল।' গিরিজার বউ বলল, 'এক মিনিট— আসছি।' দিবাকরও সেদিন ছিল। গিরিজার বাড়ির টালি ছাওয়া বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসেছিল দু জনে। রতন সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে ধরেছিল 'নে—।' দিবাকরকে বলতে হয় না। যদি দেখত রতন নিজে সিগারেট ধরিয়ে পকেটে প্যাকেট ভরে ফেলছে হাত বাড়াত, 'একটা সিগারেট খাওয়া—।' গিরিজার বউ ঘরে। রতন জানে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সানগ্লাস চোখে দিয়ে দেখছে চোখে ঠিক ফিট্ করেছে কিনা! বাইরে আসতে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঠিক আছে?' ধরা পড়ে যাওয়ার মতো করে গিরিজার বউ বলেছিল, 'খুব সুন্দর।' রতন বলেছিল, 'শুধু আয়নাকে জিজ্ঞেস করলেই সব কি জানা যায়? পরে এস। —আমরাও দেখি।' গিরিজার বউয়ের মুখে লালাভা, '—যাঃ।' রতন নাছোড়, একবার চোখে দিতেই হবে। দিবাকরের কিছু বলার নেই। দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাড়ি দেখিয়ে বোকার মতো হাসছে। গিরিজার বউকে সানগ্লাস চোখে দিতেই হল শেষ পর্যন্ত। খুঁটিয়ে দেখে রতন বলেছিল, 'খাসা—।' গিরিজার বউ লাল হায় সানগ্লাস্ চোখ থেকে খুলে বেঁচেছিল, 'আপনি না—।' …আজও সেদিনকার আনুপূর্বিক ঘটনা মনে পড়লে রতনের এক ধরনের সিরসিরে লজ্জা লাগে। সেদিন কি সে তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের মোড়কের বাইরে বেরিয়ে

এসেছিল ? প্রগলভ, তরল, নিজেকে বড়ো বেশি প্রকাশ করে ফেলেছিল সেদিন ? দিবাকরকে দেখাবার জন্যে ? দেখ শালা, বাজার করে দিয়ে—,বিল্টুকে সাইকেল শিখিয়ে, রান্না ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলে হয় না এসব। এসব করতে হলে কোমরের জোর দরকার। চা করতে গিরিজার বউ রান্নাঘরে। দিবাকর জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কতো নিল রে ?' যেন বুঝতে পারে নি রতন এইভাবে দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, 'কোনটা—?' দিবাকর জিজ্ঞেস করেছিল, 'চশমাটা'। খুব একটা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে দাম বলেছিল রতন। গিরিজার বউয়ের দৃষ্টির ওম্ তখনও শরীর থেকে যায় নি। যা দাম তার থেকে কিছু বাড়িয়েই বলেছিল। —অক্ষমতার জলুনিতে জলুক শালা। রতন জানে, অক্ষমতাকে ক্ষমতায় রূপান্তরিত করার জেদ থাকে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। দিবাকর অন্তত সে ধরনের মানুষ নয়। বরং ক্ষমতার ওই জায়গায় পৌঁছানো যে তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়, যেন জেনে বসে আছে। হয়ত সেই মুহূর্তে হতাশায় ভোগে। ভুলে যেতেও সময় লাগে না। ...ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। ভিড়ের ট্রেনে চাপাচাপি করে গিরিজার বউয়ের কামরার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া —পুরোটা দেখেছিল রতন। ঘড়ি দেখেছিল, তিনটে পাঁচ। মনে হয়েছিল, এই দুপুরে কোথায় যাচ্ছে গিরিজার বউ ? ডাউনে পরের স্টেশনের গায়ে সিনেমা হল— তারকেশ্বর টকিজ। ট্রেন যেতে-আসতে দেখেছে, কালই একটা নতুন ছবি রিলিজ করেছে। তারপরের স্টেশান, ...পাড়া। সেখানে দুটো সিনেমা হল। একটা হলে পুরানো হিন্দি হিট্ ছবি চলছে। রতনের কারখানার টিনের দরজায় তার পোস্টার সাঁটা। সব সিনেমা হলেই বিকেলের শো চারটে-সাতটা। মনে হয়েছিল, তাহলে কি সিনেমা দেখতে যাচ্ছে ? ...ইদানীং সিনেমার পোকা হয়ে উঠেছে গিরিজার বউ। বিশেষ করে হিন্দি ছবির। গিরিজা বেঁচে থাকতে এতো সুযোগ ছিল না। আসলে গিরিজা ছিল মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ধরনের। রেলের ওয়ার্কশপের লেদ্-ম্যান। কতই বা মাইনে। পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে পেয়েছিল কাঠা-পনেরো বাস্তুজমি। প্লাস্টার-ট্লাষ্টার করে একদম শেষ করতে না পারলেও টুকটুক করে মাথা-গোঁজার মতো দু-কামরার পাকাপোক্ত নিজস্ব আশ্রয় তৈরি করে যেতে পেরেছিল। হাজার কুড়ি টাকার জীবনবীমা। শুধুমাত্র মাইনের টাকায় এতসব হয় না। প্রকাশ না করলেও গিরিজা হাতে কিছু নগদ টাকা রাখত। চড়া সুদে পরিচিত চাষীদের ধার দিত। আদায়ের ব্যাপারে গিরিজা যে বেশ নির্মম ছিল গিরিজার মৃত্যুর পর তার কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে বুঝেছিল রতন। গিরিজা বেঁচে থাকতে তার অনেক আচরণ

বিসদৃশ লাগত রতনের চোখে। বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে বলতেও ছাড়ে নি। গিরিজা না-বোঝার ভান করত। গিরিজার মৃত্যুর পর যখন তার সংসারের শুভাশুভর দায়িত্ব প্রায় রতনের ঘাড়ে এসে পড়ল তখন গিরিজার কাগজপত্র ঘেঁটে রতনের কেন যেন মনে হয়েছিল, গিরিজা যেন জানত এই পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ তার বেশি দিনের নয়। তার অবর্তমানে বউ-ছেলে যাতে একেবারে আতান্তরে না-পড়ে সে-ব্যবস্থা করে গেছে যতখানি পারে। রতনের অবশ্য একথা মনে হয় না, গিরিজা মরে যেতে স্বাধীনতা, হাতে কিছু নগদ টাকা পেয়ে পাখা গজিয়েছে গিরিজার বউয়ের। বরং মনে হয়, বছর দুয়েকও হয় নি বিধবা হয়েছে মেয়েটা। থাকার মধ্যে বছর দশেকের একটা ছেলে। একটু সাজগোজ কি একটা দুটো সিনেমা— এসব নিয়ে ভুলে থাকতে চায় তো থাক না! কিই বা বয়েস! আস্তে আস্তে সবই একটা মাত্রার মধ্যে এসে যাবে।

নীলকণ্ঠের চায়ের দোকানে কোণের দিকে অন্ধকার নিয়ে বসে আছে রতন। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায় পরিষ্কার। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ নজর করে না দেখলে তাকে দেখতে পাওয়া শক্ত।

গিরিজার বউ এসময় তাকে খোঁজ করবে না নিশ্চয়ই। খোঁজার কোনো কারণও নেই। গিরিজার ছেলে বিল্টুর প্রাইভেট পড়ার মাস্টারের মাইনে বাবদ মাসান্তে পঞ্চাশটা টাকা রতনের দেয়—। গত মাসের মাইনে দেওয়া আছে। বেশির ভাগ সময় মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে রতন নিজে বাড়ি বয়ে টাকাটা দিয়ে আসে গিরিজার বউয়ের হাতে। খানিকক্ষণ বসে। চা খায়। খবরা-খবর নেয়। নিজে কাজে আটকা পড়লে দিবাকরের হাতে দিয়ে পাঠায়। একই পাড়ায় গোটা কয়েক বাড়ির আগে দিবাকরের বাড়ি। মাঝে মাঝে যেন ভূত চাপে রতনের মাথায়। মনে হয়, তার কি এমন দায় যে সময় মতো মনে করে টাকাটা দিয়ে আসবে, পাঠাবে? গিরিজার বউ আসতে পারে না! এমন কি দেমাক তার? ভাবে কি—? রতনকে জড়িয়ে ফেলেছে। না এসে উপায় নেই রতনের! ইচ্ছে করেই যেন রতন ভুলে যায়। মাসের দশ তারিখ পেরিয়ে গেলে ভেতরে-ভেতরে একটা অপরাধবোধ, অস্থিরতা টের পায়। নিজের সাজ-পোশাক, উড-ক্রাফট-এর ছোট্ট অফিস ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে হঠাৎ যেন একটু বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। কাজের একঘেয়েমি, দুর্ভাবনায় আর ততটা আতুর মনে হয় না নিজেকে। বারবার মনে হয় উড-ক্রাফট-এর গেটের সামনে বুঝিবা একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল। মাসের দশ তারিখ পেরিয়ে গেলে গিরিজার বউ একদিন আসে উড-ক্রাফটে যেন অনেকদিন খবরাখবর নেই।

উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিতে এসেছে রতন কেমন আছে-না-আছে। মুখেচোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

'কাজের যা চাপ—। যাওয়া হয়ে ওঠে নি আর কি!—বোসো।'

করাত কলে কাঠ চেরাইয়ের তীক্ষ্ণ শব্দ। বাতাসে কাঠের গুঁড়ো। শুঁকে বলে দেওয়া যায় কোন গাছের লগ চেরাই হচ্ছে। পাশের কারখানা থেকে হাতুড়ি-বাটালি, কাঠের ওপর র‍্যাঁদা চালানোর দীর্ঘ শব্দ আসছে। রতনের পেছনে দেয়াল। সামনে টেবিলের ওধারে টিনের ফোল্ডিং চেয়ারে গিরিজার বউ। পেছনের দুটো পায়ার ওপর ভর দিয়ে চেয়ার হেলিয়ে গিরিজার বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রতন হালকা করে বলে, 'তারপর খবর-টবর বলো। কোথায় এসেছিলে এদিকে?'

গিরিজার বউ মাথা নিচু করে হাতের একমাত্র চুড়িটা নাড়াচাড়া করে। মুখ থমথমে করে স্পষ্ট অভিমান দেখায়। আস্তে আস্তে বলে, 'কতোদিন যান নি। খবর নেই।—ভাবনা হয় না?' কথা শেষ হতে খুব চেপে দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস নেয়।

গিরিজার বউয়ের ফোলানো বুক, অভিমানী মুখের দিকে তাকিয়ে রতন ভাবে, জানে। জানে। অনেক কিছু জানে গিরিজার বউ। অথচ কি ভদ্র! স্কুলের শিক্ষিকাদের মতো শালীন পোশাক। সাদা খোলে কমলা রঙের বুটি দেওয়া শাড়ি পরেছে আজ। কমলা রঙের ব্লাউজ। আঁচল পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর দিয়ে মেলা। বাহু, গলা, মুখ ছাড়া শরীরের সমস্ত অংশ শাড়িতে ঢাকা। মুখে পাউডারের ছোঁয়া। রতনের আবারও মনে হয়, ফিগারটা রেখেছে বটে গিরিজার বউ। এই ক'মাসে স্বাস্থ্য আরো ভাল হয়েছে। মুখ-ত্বকে মসৃনতা, লালিত্য ফুটেছে। গিরিজা বেঁচে থাকতে কেমন খয়ে যাচ্ছিল এসব। বরং শরীর-মুখে দিনযাপনের ক্লান্তি, অভ্যাস, উৎসাহহীনতার রুক্ষতা ফুটে উঠছিল।

কার কাছে, কার জন্যে আর যাবেন। সেইই যখন নেই।'

এমন করে বলে গিরিজার বউ যেন গলার স্বর এখুনি ভেঙে যাবে। টেবিলের ওপর এমন কায়দায় রবারের ফ্লেকসিবল পাইপের মতো হাত দুটো ফেলে রেখেছে যেন রতন শশব্যস্তে চেয়ারে হেলান ছেড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাতের ওপর হাত রাখবে এখুনি, 'এই—। আবার ওসব কথা? কেন— যাই না?'

গিরিজার বউ যেন আঁচলে চোখটাই মুছল না শুধু। গলা ভারি করে বলে, 'তা তো বলি নি। কর্তব্য করতে মানুষকে অনিচ্ছায়তো অনেক কিছু করতেহয়।'

রতনের একবার মনে হয়, তাকে কি ইঙ্গিতে কর্তব্যে অবহেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে গিরিজার বউ? বলছে, এ-মাসের টাকাটা এখনও পাই নি। আবার মনে হয়, গলার স্বর গাঢ় করে বলে, শুধু কর্তব্য করতে যাই—? তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? আমি কি দিবাকর? কাজকর্মের বালাই নেই। হুটহাট করে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়ে পেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে আসব। তুমিই বলো, গিরিজা চলে গেছে সতেরো মাস হল। আমি কোনোদিন তোমার বাড়ির টালির বারান্দা ছাড়া তোমার ঘরের চৌকাট ডিঙিয়েছি? বলার সময় রতন বলে 'আচ্ছা যাব? —কাল হয়তো হবে না। কোলকাতায় কাজ আছে। পরশু ঠিক যাব।'

নিমেষের জন্যে চোখের ওপর চোখ রাখে গিরিজার বউ।

লিপ্‌গ্লস বুলিয়েছে ঠোঁটে। বৃষ্টিধোয়া পাকা জামরুলের মতো টসটস করছে ঠোঁটদুটো। বাঁদিকের গজদাঁত দিয়ে তলার ঠোঁট আলতো করে টেপা। সাদা দাঁতের কোণাটুকু দেখা যায়। সব মিলিয়ে রক্তে ওম্ ছড়িয়ে যায়। রতনের হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেছে এমনি করে বলে, 'এ-হে! কি ভুল দেখো দিকি। বিল্টুর মাস্টারের এ-মাসের মাইনেটা তো দেওয়া হয় নি। ছি-ছি। মেমারি এতো খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনদিন!'

ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জিন্‌সের প্যান্টের হিপ্‌পকেট থেকে পার্স বার করে। বেছে বেছে পরিষ্কার দেখে নোটে মিলিয়ে পঞ্চাশটা টাকা বার করে। লরির ইঞ্জিনের কটা বাতিল ভাল্ব রাখা আছে টেবিলের ওপর। পেপারওয়েটের কাজ করে। দরোয়ান ভগেলু রোজ সকালে অফিস পরিষ্কার করার সময় বালি দিয়ে ঘষে ঝকঝকে করে রাখে। তার একটা তুলে টেবিলের ওপর নোটগুলো চাপা দেয়। গিরিজার বউ তাকিয়েও দেখে না। অন্যমনস্ক, নিস্পৃহভাবে নাড়াচাড়া করে টেবিলের ওপর একটা কিছু। তখন ভেতরে-ভেতরে গুলগুল করে হাসি পায় রতনের। গিরিজার বউ কথা বলে। নিজের সমস্যার কথা বলে। রতনের পরামর্শ চায়। এক সময় বলে, 'চলি—। অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম।' ঠিক তখনই ওঠে না। পিনকুশনটা দু-আঙুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলে, 'পরশুর কথা মনে থাকবে তো?'

'প্রমিস।'

গিরিজার বউ পাশ ফিরে সাইড প্রোফাইল দেয়। দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখে চোখ রাখে সরাসরি, '—দেখবো।'

'দেখো—' রতনকেই ব্যস্ততা দেখাতে হয়, 'আরে টাকাটা পড়ে রইলো যে?'

'ও—' গিরিজার বউ ব্লাউজের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ বার করে। নোটগুলো ছোটো করে ভাঁজ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে আঁচল বিন্যস্ত করে টান দিয়ে বুকের খাঁজ আরো স্পষ্ট করে তোলে, 'চলি আজ।' অন্য স্বরে বলে 'কেমন ?'

রতনের ভাবতে ইচ্ছে করে, একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে উড-ক্রাফটের অফিস ঘরে এসেছে গিরিজার বউ। কারখানায় ছুটি হয়ে গেছে। ভগেনু তার ঘরে রান্না সারছে। লোডশেডিং থাকলে ভাল হয়। টেবিলে জ্বলছে রুগ্না মোম। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে গিরিজার বউ। পঞ্চাশটা টাকা টেবিলের ওপর। টাকার কথা যেন মনেই নেই। ঠোঁটে ছোট্ট একটুকরো কৌতুকের হাসি ঝুলিয়ে রতন গিয়ে দাঁড়াবে গিরিজার বউয়ের সামনে নিঃশ্বাসের দূরত্বে। টাকাগুলো টেবিলের ওপর থেকে তুলে সময় নিয়ে ভাঁজ করবে নিখুঁত ভাঁজে। তার সটান, মেদহীন শরীরকে দেখার— শরীরের সান্নিধ্য অনুভব করার সময় দেবে গিরিজার বউকে। একটা হাত তুলে দেবে কাঁধে। মোমের আলোয় চোখের ওপর চোখ রেখে অন্য হাতে আলতো আঙুলে নোটগুলো ঢুকিয়ে দেবে ব্লাউজের ফাঁকে, 'তোমারও বাপু মেমারি ভাল নয়। —ভুলে যাচ্ছিলে।'

চোখের দৃষ্টি নিয়ে রতনও অনেক কথা বলতে পারে। বলতে পারে, গিরিজা মারা গেছে সতেরো মাস হল। হাসপাতাল থেকে আনা, ঘাট-খরচ ইত্যাদি আপৎকালীন খরচ বাদ দিলেও ছোট বাজেটের আদ্যশ্রাদ্ধ, প্রথম দিকে মাস-তিনেকের সংসার খরচ থেকে এখনো মাসে-মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা।—যোগ করলে টাকা যে অনেকগুলো! টাকা যে ফেরত পাব এ-ভেবে খরচ করি নি। ধরে নিয়েছি এ আমার বন্ধুকৃত্য। —কখনো মনে হয় না এসব ? ভারি ভুলো মন তো তোমার।

রতন জানে, প্রতি মাসের এই টাকাটা না পেলেও বর্তমানে চালিয়ে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয় গিরিজার বউয়ের। কারখানা থেকে গিরিজার উচিত-পাওনা সবই পাওয়া গেছে। জীবনবীমার টাকাও। রতন মদৎ দিয়ে যেমন গিরিজার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে দিয়েছে তেমনি ব্যাঙ্কে, ডাকঘরের সর্বোচ্চ সুদ পেয়ে যাতে গিরিজার বউ ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারে, করে দিয়েছে সে-সব ব্যবস্থাও। বলতে গেলে গিরিজার বউয়ের স্থায়ী আমানত তার থেকে অনেক বেশি এখন। এ-বছরই তো ইয়ার-এনডিং-এ এমন একটা আর্থিক সংকটে পড়েছিল সে সারারাত ভেবে ঠিক করেছিল গিরিজার বউয়ের কাছে কয়েক হাজার টাকার জন্যে হাত পাতবে। রতনের হিসাব মতো টাকাটা অনায়াসেই দিতে পারে গিরিজার বউ। শেষ পর্যন্ত হাত পাততে হয়নি অবশ্য।

চড়া সুদে অন্য জয়গা থেকে ঋণ পেয়ে হাত পাতার লজ্জা থেকে বেঁচেছিল। রতন নিজে বিল্টুর টিউশান ফি বাবদ টাকাটা বন্ধ করে নি। ভেবেছে, গিরিজার বউ একদিন নিজেই বলবে, যা আপনি করেছেন নিজের মুখে আর কি বলব রতনদা। এখন তো যা-হয় এক রকমভাবে চলে যাচ্ছে। টাকাটা এখন থাক। দরকার হলে আপনি ছাড়া আমার কে আছে বলুন ?···কথাটা ওঠেনি। সুতরাং ব্যবস্থাটাও চলছে। যতদুর রতনের মনে হয়, চলবেও। রতন এও জানে, ক্লাস ফাইভের ছাত্রের মাইনে পঞ্চাশ টাকা— এখানে অন্তত এখনো এমন দর ওঠে নি। তাও বিল্টুকে পড়তে যেতে হয় মাস্টারের বাড়ি গিয়ে। আরও দশটা ছাত্রের সঙ্গে পড়ে সপ্তাহে তিনদিন। সব বুঝেও টাকাটা দিয়ে যাচ্ছে রতন।

মাসান্তে এই সামান্য টাকার জন্যে এদিক-ওদিক খাবলাতে হচ্ছে রতনকে এখন। বছর-দেড়েক হল তার সময় ভালো যাচ্ছে না। বলা যায় খুবই খারাপ। কারবার শুরু করেছিল একটা টেবিল-শ মেশিন দিয়ে। তখন শুধুই কাঠ-চেরাই করে দরজা, জানলা, আসবাবপত্রের উপযোগী সাইজ-কাঠ বিক্রি। বরাবরই রতন উদ্যমী, উচ্চাশী। দু বছর ঘুরে-ঘুরে, দেখে-জেনে ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ করে ট্রলি-শ বসিয়েছে। কারখানা বাড়িয়েছে। গোটা তিনেক কেবল্ কোম্পানির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে পুরোপুরি কেবল্ জড়ানোর বিভিন্ন কাঠের রিল তৈরির উপযোগী করে তৈরি করেছে কারখানাটাকে। তিনটে কোম্পানিতে তখন তার কাঠের রিল সরবরাহ হচ্ছে নিয়মিত। রোজ লরি-বোঝাই মাল বেরুচ্ছে কারখানার গেট দিয়ে। কিস্তিতে একটা লরি কিনে ফেলল। রমরম করে চলছে ব্যবসা। ঠিক সেই সময়েই একটা কারখানায় লক-আউট। দেড় বছরের ওপর বন্ধ হয়ে রয়েছে। কবে খুলবে বা আদৌ খুলবে কিনা ঠিক নেই। অনেক টাকা আটকে পড়েছে। বাকি দুটো কোম্পানির পাওনা টাকা বেশ অনিয়মিত। অথচ রতন কারবার বাড়ানোর পর আর পিছতে পারছে না। একটা সেটআপ ভেঙে অন্য কিছু করতে যে মূলধনের দরকার তা এখন তার কাছে স্বপ্ন। রতন বিভ্রান্ত। ব্যাংক পাওনা টাকার তাগাদায় চিঠির পর চিঠি দিচ্ছে। শেষ চিঠিতে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক। ঘুষ দিয়ে কেসের দিন ঠেকাচ্ছে। এসট্যাবলিশমেণ্টের খরচ চালানোর চিন্তায় এখন তার রাতের ঘুম গেছে। অনেক রাতে এমন হয়েছে শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে গেছে আতঙ্কে। বাকি রাতটা কেটেছে সিগারেটের পর সিগারেট জ্বালিয়ে।

যতদিন যাচ্ছে ততই যেন নিজেকে বড্ডো বেশি নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে রতনের।

মনে হয় মানসিকতায় সে অন্য মানুষ। আশপাশের আর কারো সঙ্গে তার মনের সামান্য মিলও নেই। এ কি রক্তের জীবাণু। তার শরীরে বইছে ভূতপূর্ব সামন্ত শ্রেণীর রক্ত। তাদের পরিবারের সবচেয়ে সফল পুরুষ পিতামহকে দেখেনি সে। তার দোর্দণ্ড প্রতাপের গল্প এখনো বয়স্ক লোকদের মুখে-মুখে। এই গ্রামে সর্বত্র তাদের পরিবারের স্মৃতি ছড়িয়ে। প্রপিতামহের নামে স্কুল। পিতামহীর নামে শ্যাম রায়ের নাটমঞ্চ। পিতামহের নামে পাঠাগার। পিতামহের পর বাহুবলের জায়গা দখল করেছিল বুদ্ধিবল। রতন তার বাবাকে দেখেছে, আমৃত্যু ইউনিয়ন বোর্ডের সর্বসম্মত প্রেসিডেন্ট, স্কুল-লাইব্রেরির সেক্রেটারি। কলকাতার নেতারা মেঠো রাস্তায় ধুলোর ঘূর্ণি তুলে নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে তাদের বাড়িতে আলোচনা, আহার-নিদ্রা সারতেন। দু-বছর আগেও কারবার যখন রমরম করে চলছে, দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা মোটর সাইকেল দাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রতন। তখন পাঁচশো, হাজার কোনো ব্যাপারই নয় তার কাছে। স্বজন-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের বিপদ-আপদে সাহায্য বা ঋণ দিতে কখনো কার্পণ্য করেনি। কি-ভাবে টাকাটা আসবে চিন্তার চেয়ে কিভাবে ক্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে সাহায্য করতে পারা যায় সেই চিন্তাই প্রধান ছিল। হয়ত এর মধ্যে আত্মশ্লাঘার ভূমিকা ছিল অনেকখানিই। ঋণ যাদের দিয়েছিল বেশির ভাগের সঙ্গে সম্পর্কের বদল ঘটেছিল। কাউকে তাগাদা দেয় নি রতন। বরং মনে-মনে খুব হেসেছে। —লোকটাকে কিনে রাখল। কোনোদিন চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না।

সেই রতন এখন গাড্ডায় পড়েছে। হিসাবের খাতা উল্টে মালপত্র বাবদ বিশ-পঞ্চাশ টাকা পাওনা আছে দেখে লোক পাঠিয়ে তাগাদা দিতে হচ্ছে। একটা টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে গেলে মনে হয়, কি পাচ্ছি? কি পাব বিনিময়ে?

সব কিছু কেমন ছোটো হয়ে এসেছে।

নীলকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'আর চা নিবেন নাকি ছোটোবাবু? আঁচ ফেলাইয়া থুমু ইবার।'

উত্তর দেবার আগেই স্টেশানের অ্যামপ্লিফায়ারে পরবর্তী আপ ট্রেন আসার খবর হল। লেভেল-ক্রসিংয়ের গেট পড়ার ঘণ্টা বাজল। রতন উঠবে মনে করেছিল। ভাবল, ট্রেন যখন কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ছে— এ-ট্রেনটা দেখেই যায়। তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? যাওয়া বলতে তো ওভারব্রিজের একঘেয়ে আড্ডা। বলল, 'ছোটো করে দিও।'

দিবাকর যদি এ-ট্রেনে নামে ওভারব্রিজের আড্ডায় খোঁজ করবে তাকে। কোথাও কাজকর্মে আটকে না-পড়লে রাত আটটার পর রতনকে ওখানে পাওয়ার কথা। অফিস-কারখানা ফেরত কয়েকজন। দু জন ছোটোখাট ব্যবসা করে। একজন তো বহুদিন বেকার ছিল— পঞ্চায়েত মেম্বার হয়ে রাতারাতি হাল ফিরিয়েছে। একটা মোপেডও কিনে ফেলেছে ;অতিসম্প্রতি। শুধু হল না কিছু দিবাকরের। সমবয়সী রতনের। বয়েসও প্রায় ত্রিশ ছুঁলো। নেহাৎ দিবাকরের বাবা বিঘে-পনেরো চাষের জাম, ক্ষেত বাড়ি, দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন— তাই চলে যচ্ছে মা-ছেলের সংসার টিকুস-টিকুস লোকো ইঞ্জিন টানা মালগাড়ির মতো। শিক্ষার ব্যাপারে স্কুলের গণ্ডিটাও ছাড়াতে পারে নি। রতন যখন কারবার শুরু করে তখন :থেকেই দিবাকর ছায়ার মতো। কাজকর্ম নেই। সকাল হতেই সাইকেল চালিয়ে এসে হাজির। ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা খায়। রতনের প্যাকেট থেকে একটার পর একটা সিগারেট। রতনের মোটর সাইকেলের পেছনের সিটে সব সময়। খাওয়া-দাওয়া সারতে একবার বাড়ি যায়। দুপুরে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে চোখ ফুলিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আবার উদয়। সঙ্গ দেবার বিনিময়ে রতন সিনেমা-টিনেমা দেখায়, রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়। দিবাকর মাঝে-মাঝে দশ-বিশটা টাকা ধার হিসাবে চেয়ে নেয়। সে-ধার কখনোই শোধ হয় না। ধারের ওপর ধার চাপে। কে হিসাব রাখে? রতনের মনেও থাকে না। দিবাকরের থাকে কিনা রতনের জানার কথা নয়। এইভাবে চলতে চলতে রতনের দুঃসময় শুরু হল। মাথার মধ্যে সব সময় চাপ। যেন চব্বিশ ঘণ্টা গুনগুন করে মাথায় একটা ট্রান্সফরমার চলছে। হঠাৎ-হঠাৎ মেজাজ চড়ে যায়। তার ওপর গিরিজার সংসার চেপেছে ঘাড়ে। দিবাকর কটা টাকা চাইতে মাথায় ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল। তবু পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে শান্ত স্বরে বলেছিল, 'এমনি করে কতোদিন চালাবি? নিজের ব্যাপারে একটু ভাবটাব এবার!'

'চেষ্টা তো করছি…' মুখস্থ উত্তর দিয়েছে দিবাকর।

রতন শোনে নি। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে একটু অনুশোচন যে হয়নি তা নয়। কি দরকার তার বলতে যাবার? দিবাকরের নিজেরই যখন গরজ নেই। ভাবনাটা মাথা থেকে যায় নি। ভেবেচিন্তে রতনই চিন্তাটা মাথা থেকে বার করেছিল। —এ-অঞ্চলের সঙ্গে দিবাকরের পরিচয় আজন্মের। সাইকেল করে ঘুরুক—। খোঁজখবর করে জানুক কে তাদের গাছ বিক্রি করতে চায়। —খবর আনুক। রতন গিয়ে গাছের দাম ঠিক করে আসবে। দামের ওপর শতকরা

তিনটাকা কমিশন থাকবে দিবাকরের। এ-ব্যবস্থায় কাজ করে এমন বেশ কয়েকজন লোক আছে রতনের। দিবাকরও পারবে না। কেন? কমিশনের ব্যাপারে রতন না-হয় শতকরা এক টাকা বেশিই দেবে দিবাকরকে। মন দিয়ে কাজ করলে, একটু পরিশ্রম করলে দারুণ কিছু না হোক কথায়-কথায় হাত পাততে হবে না। দিবাকর সেই থেকে কাজ করছে ব্যবস্থা মতো। সচ্ছলতা আসে নি। হাত-পাতা কমেছে। বেঁচেছে রতন। মাঝে মাঝে রতন ভাবে, তার বন্ধুভাগ্য রীতিমতো ঈর্ষণীয়! এক তো গিরিজা ফাঁসিয়ে গেছে, তার ওপর দিবাকর। যে দেয় তার দেবার একটা সীমা আছে। যে নেয় তার কোনো সীমা নেই।— কথাটা যেন রতন কোথায় শুনেছে। নিজের ক্ষেত্রে কথাটা যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে ভাবে নি। দিবাকরের সঙ্গে সম্পর্ক এখন মাঝেমাঝেই একটা স্নায়ুচাপের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছে বেশ টের পায় রতন। আগে তো ঠিক এ-রকমটি ছিল না! —কেন? গিরিজার বউ কি মাঝখানে এসে একটা চোরা ফাটল ধরিয়েছে? রতন জানে, দিবাকরের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে গিরিজার বউ অনেক সহজ। ...কাছাকাছি বাড়ি। প্রায় নিষ্কর্মা একটা লোক। এমন একটা মানুষ হাতের কাছে থাকলে উপকারে লাগে। ফাই-ফরমাস খেটে দেওয়া থেকে গল্পগুজব করে সময় কাটানোর সঙ্গী। সে হিসাবে রতনের নিজের মধ্যে বিস্তর গোলমাল। পারিবারিক সম্মান, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথা থেকে যায় না। গিরিজার বউ যে তার কাছে অনুগৃহীত এটা ভুলতে চেষ্টা করেও পারে না। রতন মাঝেমাঝে ভাবে, সে কি কিছু প্রত্যাশা করে গিরিজার বউয়ের কাছ থেকে? এমন হয়েছে··· চারিদিকে অন্ধকার দেখেছে রতন। উড-ক্রাফ্‌ট-এর ছোট অফিস ঘর জতুগৃহের মতো যেন চেপে মারতে এসেছে তাকে। ছিটকে বেরিয়ে এসে মোটরসাইকেলে চেপে বসেছে। চারদিক কাঁপিয়ে ইঞ্জিন চালু করেছে। কোথায় যাবে কিছুর ঠিকানা নেই। এক সময় দেখেছে গিরিজার বাড়ির রাস্তায় চলেছে সে। কোথা থেকে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এসে মোটরসাইকেলের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। একটা চোরা লোভ সরিয়ে দিয়েছে হাতদুটো। মনে হয়েছে, কিছুই তো নয়! গিরিজার বউয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করে খানিক্ষণের জন্যে অন্তত দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া। এই তো। দূর থেকে মোটর সাইকেলের শব্দ পেয়ে গেট খুলে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিল্টু, 'রতনকাকু কোথায় যাচ্ছ?' গিরিজার বউ এসে দাঁড়িয়েছে গেটের ওধারে, 'রতনদা কোথায় চললেন এদিকে?' রতন যা হয় একটা বলে দেয়। বিল্টুকে বলে, 'বিল্টুবাবু, যাবি নাকি?' বলতে যা দেরি। পেছনে বসে দু-হাতে

রতনের কাঁধ আঁকড়ে ধরে। গিরিজার বউ বলে, 'ওকে নিয়ে যাচ্ছেন তো রতনদা— হয়ে গেল আপনার কাজকর্ম!' গঙ্গার দিকে উদ্দেশ্যহীন খানিক ঘুরে ফিরে গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিল্টু নামে। মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন চালু রয়েছে। গিরিজার বউ বলে, 'ওকি, নামুন! কি ঘেমেছেন! এক গেলাস সরবৎ করে দিই।' রতন মনে মনে যেন মরে যায়। কি স্বাভাবিক! অজানা ভয়ে কেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। নিজেকে নিয়ে আজকাল তার বড়ো ভয়। কে-জানে এক গেলাস সরবতের মধ্যে কোন বাড়বাগ্নির স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে।

দিনে দিনে গিরিজার বউ যেন তার জীবনে এক তীব্র আচ্ছন্নতার স্তরে এসে পৌঁছেছে টের পায় রতন। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতার দিনে গিরিজার বউ যেন ঘরের একমাত্র দক্ষিণের জানালা। যেন জানালা খুলে দাঁড়ালেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার সব শ্রান্তি-ক্লান্তি-হতাশা হরণ করে নেবে। বড়ো সুধা-বিষে মেশা এ আচ্ছন্নতা। মানসিকতার দিক থেকে দু জনের মধ্যে যে যোজন তফাত এ-কথা রতনের চেয়ে আর কে বেশি করে জানে! তবু সারাদিনের ঠাস-বুনোট কাজের ফাঁক দিয়ে বাইরের আলোর মতো গিরিজার বউয়ের মুখ কেন চোখে এসে পড়ে! একাকী মেদুর সন্ধ্যায় গিরিজার বাড়ির টালির বারান্দা কেন হাতছানি দিয়ে ডাকে? গিরিজার বউ অতল থেকে উত্তপ্ত বুদবুদের মতো বিছানায় উঠে আসে কেন এককে স্বপ্নের রাতে! প্রাণপণে এ আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে আসতে চায় রতন। কিন্তু এ যেন রাখাল-টিকে। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে ঘষে ঘষে কপালের মাঝখানে এঁকেছিল। তার চিহ্ন মেলাতে চায় না।

আলো নিবে গেল। লোডশেডিং! আলো নিবতে জ্যোৎস্না যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল নীলকণ্ঠের খুপরি চায়ের দোকানে। নীলকণ্ঠ গজগজ করতে করতে হাতের কাজ সারছে, 'হ্যাও— হালাইদ্যার আর পনেরোডা মিনিট তয় সইল না।'

বেঞ্চির ওপর পয়সা রেখে রতন উঠল।

নীলকণ্ঠ বলল, 'ছোটোবাবু একটু নজর কইরা যাইব্যান্। দোরগোড়ায় এটা গর্ত হইসে। কাল ছাই ফেলাইয়া পিটাইয়া দিমু।'

স্টেশানের এলাকার মধ্যে এসে রতন বুঝল বিদ্যুতের লাইনে কোথাও বড়ো রকমের গোলমাল হয়েছে। স্টেশান অন্ধকার। রেলের অফিসে হ্যারিকেন

জ্বলছে। দরজা দিয়ে নিস্তেজ আলো এসে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। বুকিং কাউণ্টারের খুপরি জানালায় লালচে আলো পুরানো পোস্টারের মতো সাঁটা।

লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর এসে দাঁড়াল রতন। আপ-ডাউন দু দিকেই সিগ্‌নালের আলো লাল। দু'দিকের কোনো দিক থেকেই ট্রেন আসার খবর নেই। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি লাইনের ওপর দিয়ে ওভারব্রিজ। আইন মেনে দুই প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত করতে সিঁড়ি ভেঙে ওভারব্রিজে ওঠার কষ্ট স্বীকার করে না বড় একটা কেউ। লাইন টপকে, লেভেল ক্রসিং দিয়ে যাতায়াত সারে। সিঁড়িগুলো ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের বসার জায়গা হয়। ওভারব্রিজটা রেলের পোর্টার, হাটের দিনে রাতের শেষ ট্রেনে সবজি কিনতে আসা শহরের ফোড়ে, ভবঘুরেদের শোবার জায়গা। একদিকে লাইটপোস্ট। তলায় রাত নটা পর্যন্ত রতনদের আড্ডার ঠেক্। নীচে পচার চায়ের দোকান। একটা পলিথিনের চাদর রাখা থাকে সেখানে। বিছিয়ে বসা। আলো থাকলে তাস খেলা হয়। না-থাকলে বসে গল্পগুজব, আলোচনা, তর্কবিতর্ক। রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত সময় কাটিয়ে স্থটসাট যে যার বাড়িমুখো। একটা দিনের পরিসমাপ্তি।

লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন যে ইতিমধ্যে এসে জমায়েত হয়েছে দেখতে পেল রতন। পেছন ফিরে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে বসে কুবের। মোটসোটা মানুষ। গায়ে জামা রাখতে পারে না। আদুর গায়ে রয়েছে। হাওয়াই শার্ট রেলিং-এ মেলা। মুখোমুখি বসে নিশা। সন্তুকেও চিনতে পারল। নিশার আড়ালে আর একজন কেউ বসে। এতদূর থেকে বুঝতে পারছে না রতন। চকিতে মনে হল, দিবাকর? ও হয়ত সত্যিই যায় নি। অভ্যাসমতো দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে দেখে বেলা গড়িয়ে গেছে। মনে ভয় ঢুকেছে। রতনের মেজাজ জানে। বারুদের গোলা হয়ে আছে। ঠিক তখনই তোপের মুখে পড়তে চায় নি। অপেক্ষা করে আছে মুখোমুখি সাক্ষাৎটা যাতে আড্ডার মধ্যে হয়। যদিও জানে বন্ধুবান্ধবদের সামনেও ছেড়ে কথা কইবার অভ্যাস অন্তত রতনের নেই। পরিমাণ যদি কম হয়। মেজাজের তাপ অন্তত এক ডিগ্রিও নামে। সন্তু দেখতে পেয়েছিল। দাঁড়িয়ে স্বর তুলে ডাকল, 'প্রিন্স— এই যে।'

রতন বোঝে বন্ধুবান্ধবদের তাকে সম্বোধনের এই বিশেষ শব্দটিতে রসের মধ্যে ফেলা মিষ্টির মতো খানিকটা তোষামোদের রস লাগানো থাকে। খারাপ লাগে না। সকলের থেকে নিজেকে আলাদা, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত মনে হয়। এও জানে শব্দটার সঙ্গে যেমন তার বংশগরিমার দিকটা যেমন রয়েছে তেমনি তার পোষাক-

আশাক, আচার-আচরণ অস্বীকার করার মতো নয়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আর কে পারে আড্ডার মাঝখানে হেলায় গ্যাস লাইটার, সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দিতে? হঠাৎ ফিস্ট-এর মতো কিছু ঠিক হলে বাজেটের ভারি দিকটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে স্বেচ্ছায়?

সিঁড়ি ভেঙে ওভারব্রিজে উঠে আশপাশে তাকাতে রতনের নতুন বন্দরে প্রথম নামা নাবিকের মতো বিহ্বল মনে হল নিজেকে। জ্যোৎস্না অতিপরিচিত দৃশ্যগুলোর চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। আস্তে আস্তে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল আকলু মিয়াঁর পরিত্যক্ত ইট ভাটা। খাড়া চিমনিটা মাঝখান থেকে ভেঙে ঝুলছে। লতা ঝোপে ঢেকেছে ইটকাটাদের টানা, লম্বা, নীচু ঘরগুলো। খালের ওপারে খৃস্টান বসতি। টালি ছাওয়া গির্জার ক্রুসের ওপর একটা রাতচরা পাখি এসে বসল। ডানাদুটো দু পাশে যত দূর পারে বিস্তার করে আস্তে আস্তে মুড়ে নিল। যেন অনেকক্ষণ জিরোবে এখন। দূর মাঠে শ্যালো থেকে জল তুলে জমিতে সেচ দিচ্ছে কারা। ডিজেল পাম্প চলার শব্দ ভেসে আসছে। রেললাইনের ধারে স্কুলের ফুটবল মাঠের জায়গায়-জায়গা ঘাস নেই। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে বৃষ্টির জল জমে টলটল করছে।

রতন দেখল দিবাকর নয়, প্রশান্ত বসে আছে।

হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে থামের মতো দুটো পা ছড়িয়ে বসেছিল কুবের। গুটিয়ে নিল। পলিথিনের চাদরে খড়খড় শব্দ হল, 'বোসো প্রিন্স—।'

প্রশান্ত বলল, 'প্রিন্স—, তোমার ছায়াটিকে কোথায় রেখে এলে?'

বুঝতে সামান্য সময় লাগল। রতন বুঝল, দিবাকরের কথা জিজ্ঞেস করছে। ওভারব্রিজে আসতে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে সে আর দিবাকর হেঁটে আসছে। দিবাকর সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে পাশেপাশে। সিঁড়ির নীচে এসে দিবাকর সামান্য সময় নেয়। সাইকেলের চাকায় তালা লাগায়। ততক্ষণে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে যায় রতন। আগে-পিছে এসে পৌঁছায়— এইটাই প্রায় প্রত্যহের ছবি। আজ সে একা।

গ্যাস লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে রতন অনুভব করল, সে ভেতরে-ভেতরে হঠাৎ যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। এখনই যেন কেউ বলবে, এই তো সন্ধ্যার আগে দিবাকরকে দেখলাম। সাইকেলে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। মনে হল খাবারদাবার কিনে নিয়ে যাচ্ছে কিছু। আত্মীয়-স্বজন এসে পড়েছে হয়ত। —এসে যাবে।

সিগারেট ধরিয়ে রতন যেন কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না এইভাবে বলল, 'কি

জানি ! এবেলা তো আসে নি আমার ওখানে।'

নিশা বলল, 'কোথায় গেল শালা ?'

পেছনে পায়ের শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে রতন দেখল পঞ্চায়েত মেম্বার বটা।

বটা বসছে না। বটার শরীরের ছায়া রতনের ওপর দিয়ে সকলের মাঝখানে পড়ছে।

সন্তু বলল, 'কিরে বটা ? —বোস।'

বটাকে দেখলে রতন নিজের মধ্যে সেই অস্বস্তিতা টের পায়। শরীরে স্নায়ু হঠাৎ যেন সজাগ, টানটান হয়ে উঠেছে। বটার উপস্থিতি আজকাল তাকে এই রকম একটা অবস্থায় নিয়ে আসে টের পায় রতন। অথচ ক বছর আগেও তো ছিল না এসব। বটা তখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে। রাজনীতি করছে। বন্‌ধ-এর তদারকি, কোলকাতায় মিছিল নিয়ে যাওয়া, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মাইক ফুঁকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছে। অবসর সময়ে দিবাকরের মতো উড-ক্রাফট-এ এসে আড্ডা। চা-সিগারেট ধ্বংস। পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোল পাল্টে দিয়েছে বটার। এখন তো এ অঞ্চলের রাইজিং বিজনেসম্যান। গম ভাঙা কল, সরষে পেষাই করার একস্‌পেলার বসিয়েছে। শিগগির নাকি একটা হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স পাবে। তড়িৎ উন্নতি। বটা উঠছে। রতন জানে না কোথায় যাচ্ছে।

বটা বলল, 'প্যাকেটটা দে রতন।'

না-তাকিয়ে প্যাকেটটা বটার দিকে বাড়িয়ে ধরে রতন। বলল, 'দেশলাই আছে, না পকেটে বাজে জিনিস রেখে ভার বাড়াস না আজকাল ?'

'আছে' বিদ্রুপ গায়ে মাখল না বটা। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা রতনের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিল। যেন রতনের বিদ্রুপের জবাব দিল অন্যভাবে।

রতন অনুভব করল তার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে ঘাড় ফিরিয়ে বটার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'হাত থেকে কিছু নিলে হাতেই ফেরত দিতে হয়। এটাই ভদ্রতা।'

দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রেখে মুঠো পাকিয়ে গাঁজার টানের মতো সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বটা বলল, 'সরি', টেনেটেনে বলল, 'প্রিন্স।'

রতনের মনে হল, চারিদিক থেকে যেন এক পরাজয়ের আবর্তে পড়েছে সে। রক্তের সেই উত্তাপ তো টের পাচ্ছে না নিজের মধ্যে ! যে উত্তাপ সটান দাঁড় করিয়ে দেবে বটার মুখোমুখি। চোখে চোখ রেখে বটার থুতনিতে আঙুল ছুঁয়ে

শান্ত স্বরে বলতে পারবে, 'এসব জানতে হলে কিছু শিক্ষাদীক্ষার দরকার। খানিকটা রক্তের ব্যাপারও বোধ হয় আছে। তুই আর এসব কোথা থেকে জানবি বল?'

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন প্ল্যাটফর্মে রেলের পোর্টার সবুজ আলো দুলিয়ে তিনবার হাঁকল, 'লাটফরমের কিনারে সে হটিয়ে যাবে। মেল পাস হোবে।'

দূরে আপ লাইনের ওপর আলোর ফোঁটা দ্রুত জোরালো হচ্ছে, আকারে বড় হচ্ছে। ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসছে সুপার ফাস্ট। ওরা রতনের আসার আগের আলোচনায় ফিরে গেছে।

রতন উঠে দাঁড়াল।

অবাক স্বরে কুবের জিজ্ঞেস করল, 'কি রে? কোথায় যাচ্ছিস?'

খুলে রাখা চটি পায়ে গলাতে গলাতে রতন বলল, 'বাড়ি। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

নীলকণ্ঠের চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। খাবারের দোকান বাদ দিলে সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। জুট প্রেসের সামনের মাঠে হ্যাজাক জ্বালিয়ে পাট বাঁধাইয়ের কাজ করছে বাঁধনদাররা। একটা লরিতে পাটের গাঁট বোঝাই হচ্ছে।

নিজের বাড়ির কাছে এসে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল রতন। গিরিজার বাড়ি যাবার রাস্তাটা চুম্বকের মতো টানছে। ভেতরে ভেতরে সে-টানের তীব্রতা টের পাচ্ছে। আবার মনে হচ্ছে, কি হবে গিয়ে? দেখবে, বাড়ির কাজ করে যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি, বারান্দায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে। গিরিজার বউ বাড়ি ফিরলে তার ছুটি। আলো নেই। বিল্টু হয়ত হ্যারিকেনের আলোয় পড়ছে কি ঘুমিয়েই পড়েছে। গিরিজার বউ বাড়ি ফিরে ওকে জাগিয়ে খাওয়াবে, শোয়াবে।

পেছনে দিকবিদিক কাঁপিয়ে ছুটে গেল সুপার ফাস্ট।

রতনের ভেতরে অন্য একটা প্রত্যাশাও জেগে উঠছে। গিরিজার বউ বাড়ি ফিরে নিশ্চয়ই জানতে পারবে, সে এসেছিল। কাল সকালেই হয়ত একটা রিকশা এসে থামবে উড-ক্রাফট এর গেটের সামনে। গিরিজার বউ অনুযোগ জানাবে, কাল যে বড়ো দেখা না করে চলে এলেন?

তুমি তো বাড়ি ছিলে না। রাতও হয়ে গেছিল।

গিরিজার বউ বলবে, ইস্। আপনি কাল আসবেন জানলে আমি মোটেও বাড়ি থেকে বেরুতাম না। —বিচ্ছিরি লাগছে।

রতন অভ্যাসমতো চেয়ারের পেছনের পায়ায় ভর দিয়ে হেলে বসবে, কোথায় গেছিলে কাল ?

মুখের ওপর দিয়ে সামান্য লজ্জার ছায়া ভেসে যাবে গিরিজার বউয়ের, সিনেমায়।

রতন যেন বেশ রাগ করবে শুনে। অভিভাবকের মতো। গলা গভীর করে বলবে, অত রাত করে সিনেমায় যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। যেতে হলে দুপুর বা বিকেলের শোয়ে যাও। আটটা, সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরতে পারবে। একলা স্টেশান থেকে এতখানি রাস্তা— দিনকাল দেখছ তো !

বিকেলের শোয়েই তো গিছিলাম, গিরিজার বউ আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো করে বলবে, একা তো যাই নি। দিবাকরদা সঙ্গে ছিল।

কালভার্টের ওপাশে দিবাকরদের পাড়া। একটু এগিয়ে দিবাকরের বাড়ি। পাড়ার একেবারে শেষের দিকে গিরিজার। কালভার্টের সিমেন্টের পাঁচিলের ওপর বসে কয়েকজন উঠতি বয়সের ছেলে। দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন। চার-পাঁচটা সাইকেল গায়ে গায়ে লাগিয়ে দাঁড় করানো রাস্তার প্রায় মাঝখানে। খেলা নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছিল। রতনকে আসতে দেখে গলার স্বর নামতে নামতে থমকে গেল। সকলে লক্ষ করছে রতনকে। সাইকেলগুলো পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রতন। একজন জিজ্ঞেস করল, 'রতনদা, কোথায় যাচ্ছেন ?'

গিরিজার বাড়ি শব্দ দুটো প্রায় জিভের ডগায় এসে গেছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের দিকে ফিরে রতন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'দিবাকে দেখেছিস ?'

'না তো।'

দু-তিনটে গলা একসঙ্গে উত্তর দিল। একজন বলল, 'সকালে, দেখেছিলাম।'

রতন চিন্তিত ভাবে বলল, 'দেখি, পাই কি না বাড়িতে।'

সামনে আরও কটা বাড়ি। একটা বাঁশ-বাগান। ছোটো খেলার মাঠ তারপরই গিরিজার বাড়ি। ধরতে গেলে পাড়ার শেষ দিকের বাড়িগুলোর একটা। ধানের মাঠ তারপর গঙ্গার ধার পর্যন্ত। গিরিজার বাড়ির একটু আগে রাস্তার ধারে বড়ো ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। গাছের নিচের অন্ধকারে এসে গিরিজার বাড়ির দিকে তাকাতে হঠাৎ চলার গতি থমকে গেল রতনের। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল, সে কি ভুল দেখছে ?

জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসছে চতুর্দিক। টালির ছাউনিতে জ্যোৎস্না কেটে এসে পড়েছে বারান্দায়। রাস্তার দিকে পাশ ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিরিজার বউ। অবাক হয়ে রতন ভাবল, তাহলে কি গিরিজার বউ কোথাও যায় নি ?'

কোথাও গেছিল নিশ্চয়ই— নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করে রতন। হয়ত গেছিল কোথাও। ফিরে এসেছে সন্ধ্যার আগেই। রতন রাস্তার দিকে নজর রেখেছে সিনেমা ভাঙায় সময় আন্দাজ করে। তার আগেই গিরিজার বউ বাড়ি ফিরে এসেছে রতনের দৃষ্টি এড়িয়ে। গিরিজার বউ যেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে তাকাল রতন। এমন তন্ময় হয়ে কি দেখছে ? ···সামনে শস্যশূন্য ধানের মাঠ। অনেক দূরে গঙ্গার পাড়ে গাছপালার অস্পষ্ট আভাস। কিছু জোনাকি জ্বলছে। চাঁদের আলোয় জোনাকির আলো নিজের রঙ হারিয়ে ফেলেছে।

বারান্দার দিকে তাকিয়ে সহসা যেন নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল রতন। এ কি সাজে আজ নিজেকে সাজিয়েছে গিরিজার বউ ! রতন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ধবধবে সাদা থান পরেছে আজ। ঘোমটা তুলে দিয়েছে মাথায়। এলোচুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের ওপর।

রতনের মনে হল, জ্যোৎস্নার নদীতে দাঁড়িয়ে কি তর্পণ করছে গিরিজার বউ ?

চারপাশে ঝিঁঝির ডাক। কোথা থেকে একটা ডাহুকের একটানা ডাক ভেসে আসছে, টক · টক···।

শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো গিরিজার বউ দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নায়। নিজেকে নিয়ে রতনের যেন আর কোনো ভয়, সংশয় নেই। এখন গেট খুলে বারান্দায় উঠে গিরিজার বউয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অনায়াসে একটা হাত আলতো করে তুলে দিতে পারে গিরিজার বউয়ের কাঁধে, কি এতো ভাবছো ?

রতন ভাবল, বরং আজ থাক। আর একদিন।— আজই কিছু পৃথিবীতে শেষ চাঁদের রাত নয়।